সূচীপত্র

পঞ্চম খণ্ড

দেশ ও বিদেশ

সূচনা

জ্যোতিষ্কমণ্ডল

রাত্রিকালে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকাইলে অসংখ্য উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাইবে। এই সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্ক। কতকগুলি জ্যোতিষ্কের নিজস্ব জ্যোতি বা আলো আছে। তাহাদিগকে নক্ষত্র বলা হয়। কোন কোন জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নাই। অন্য নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় উহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায়। ইহাদিগকে
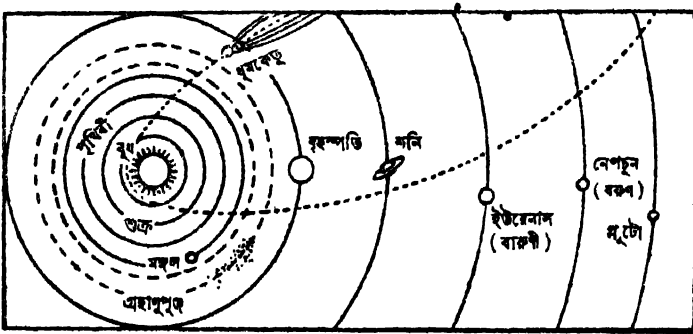
১নং চিত্র—সৌরজগৎ

আমরা গ্রহ বলি। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র, কিন্তু অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় ইহাকে এত বড় দেখায় কেন? সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র, তাই উহাকে এত বিশাল মনে হয়। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। গ্রহগুলি কোন না কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া নির্দিষ্ট গতিপথে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সূর্যকেও কতকগুলি গ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে বুধ, তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো এই নয়টি গ্রহ উপবৃত্ত পথে নিজ নিজ নির্দিষ্ট গতিতে সূর্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। ক্ষুদ্রায়তন কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আবার গ্রহের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইগুলিকে উপগ্রহ বলে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ।
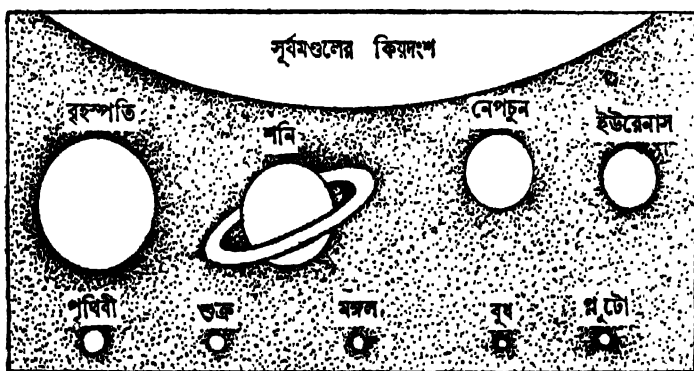
২নং চিত্র—সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন

সূর্য হইতে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সূর্য হইতে প্লুটোর দূরত্ব তোমাদের পক্ষে ধারণা করাও কঠিন। একটি দ্রুতগতি বিমান অবিরাম চলিতে থাকিলে সূর্য হইতে প্লুটোয় পৌঁছিতে উহার পাঁচ হাজার বৎসর লাগিবে। সূর্য এবং এই সকল গ্রহ-উপগ্রহ লইয়াই আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। এখন ভাবিয়া দেখ কী বিশাল এই সৌরজগৎ। আমাদের পৃথিবী এই সৌরজগতের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। এই পৃথিবীর কথাই এখন তোমাদিগকে বলিব।

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর আকার ও আয়তন

কোন বৃহৎ জিনিসের সামান্য অংশ দেখিয়া উহার আকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন। আমরা চোখে পৃথিবীর অতি সামান্য অংশই দেখিতে পাই, তাই আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীকে সমতল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা গোলাকার। তবে ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্ত কতকটা চাপা। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ব্যাস প্রায় ৭৯২৬ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণ ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল দীর্ঘ। অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ বা মেরুব্যাসের দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিম বা বিষুব-ব্যাসের চেয়ে ২৭ মাইল কম। এইরূপ আকৃতির গোলককে **অভিগত গোলক** (Oblate spheroid) বলা হয়।

১নং চিত্র—পৃথিবীর ব্যাস
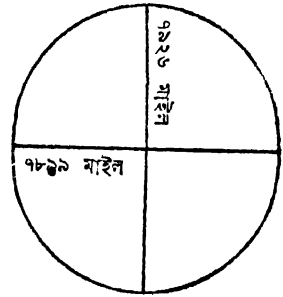
পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ বৃহত্তম পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল এবং ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল।

পৃথিবীর পরিধিনির্ণয়—প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইরাতোস্থিনিস (Eratosthenes) নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন।

অতি সহজেই জ্যামিতির সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করা যায়।

মনে কর, **ক** ও **হ** বিন্দুদ্বয় পৃথিবীপৃষ্ঠে কলিকাতা ও হায়দরাবাদ (সিন্ধু) শহর দুইটির অবস্থান বুঝাইতেছে। কলিকাতায় সূর্য মাথার উপরে **স** বিন্দুতে

আছে এই সময়েই হায়দরাবাদে সূর্যকে মাথার উপর হইতে ১৮° (ডিগ্রী) হেলানো অবস্থায় **স´** বিন্দুতে দেখা যাইতেছে। হায়দরাবাদের লোকটির মাথার উপরে **ম** বিন্দু আছে। অতএব **স´হম** কোণ = ১৮°। সূর্য অনেক দূরবর্তী বলিয়া **সক** ও **স´হ** রেখাদ্বয় সমান্তরাল ধরা হইল। **সক** ও **মহ** রেখা দুইটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু **ব** অবধি বর্ধিত করা হইল। অতএব একান্তর কোণ **সবম** = **স´হম** = ১৮°। আমরা জানি, কলিকাতা ও হায়দরাবাদের দূরত্ব ১২৫০ মাইল। **ব** বিন্দুর চতুষ্পার্শ্বস্থিত কোণের অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ ৩৬০°। ১৮° = ১২৫০ মাইল, অতএব ৩৬০° = $\frac{১২৫০ \times ৩৬০}{১৮}$ মাইল = ২৫০০০ মাইল। অতএব পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ ২৫০০০ মাইল।
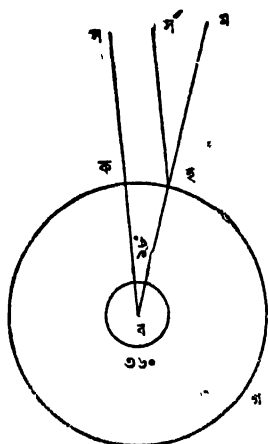
৪নং চিত্র—পৃথিবীর পরিধি-নির্ণয়

পৃথিবী যে গোল তাহার কতকগুলি প্রমাণ

আমরা একদৃষ্টিতে পৃথিবীর অতি সামান্য অংশই দেখিতে পাই একথা
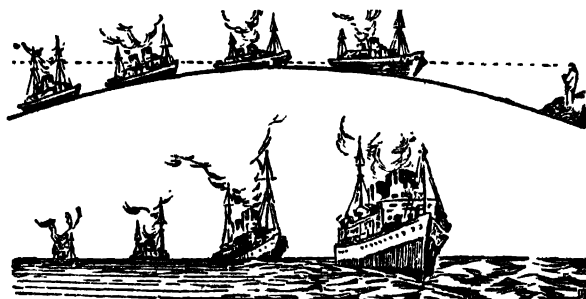
৫নং চিত্র—জাহাজ দেখা

তোমাদিগকে আগেই য়েছি, কিন্তু বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ হইতেই

আমরা পৃথিবীর প্রকৃত আকার জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবী যে গোল নিম্নে তাহার কতকগুলি প্রমাণ দেওয়া হইল :

(১) সমুদ্র-উপকূলে দাঁড়াইয়া তীরের দিকে কোন জাহাজ আসিতে দেখিয়াছ কি? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রথমে জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে। তারপর জাহাজ যত নিকটে আসিতে থাকিবে ক্রমশ তাহার নিম্নভাগ নজরে পড়িবে, অবশেষে সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখা যাইবে। পৃথিবী গোল বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সমতল হইলে জাহাজের সমস্ত অংশই একসঙ্গে দেখা যাইত।

(২) ধরাপৃষ্ঠের কোন উচ্চ স্থান হইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় আকাশ যেন একটি বৃত্তাকার রেখায় পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।
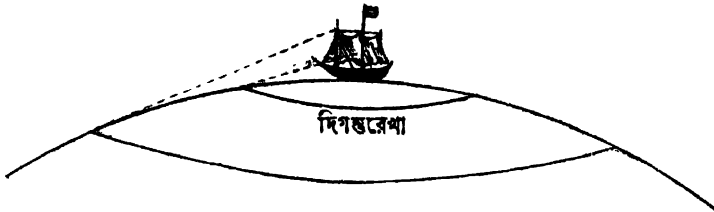
৬নং চিত্র

এই বৃত্তরেখাকে দিগন্তরেখা বলা হয়। যত উচ্চস্থানে উঠা যায় ঐ বৃত্তের পরিধি তত বাড়িয়া যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠ গোল বলিয়াই এরূপ মনে হয়।

(৩) চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এই ছায়া সকল অবস্থাতেই গোলাকার দেখায়। গোলকের ছায়া সকল অবস্থাতেই গোল দেখায়। তাই পৃথিবী যে গোল একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।

(৪) ড্রেক, কুক, ম্যাগেলান প্রভৃতি নাবিকগণ ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে গিয়া ক্রমাগত একই দিকে জাহাজ চালাইয়াছেন; বিশেষ দিক পরিবর্তন করেন নাই। একই দিকে চলিতে চলিতে কিছুদিন পর ইঁহারা নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমাগত একই দিকে বিমান চালাইয়াও বর্তমান যুগে এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবী গোলাকার না হইলে ইহা সম্ভব হইত না।

(৫) বিস্তীর্ণ হ্রদ বা বিলের শান্ত জলের উপর সমদীর্ঘ তিনটি দণ্ড এক বা দুই মাইল অন্তর ভেলার সাহায্যে এমনভাবে ভাসাও যেন উহারা জলের উপরে সম্পূর্ণ লম্বভাবে এবং সরলরেখা-ক্রমে থাকে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে লম্ব
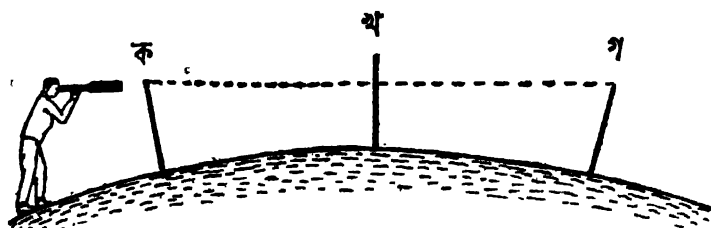
৭নং চিত্র—বেডফোর্ডের পরীক্ষা

তিনটির মাথা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝখানের দণ্ডটির মাথা দৃষ্টি-রেখার কিছু উপরে আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল হইলে এরূপ হইতে পারিত না; তিনটি মাথাই একই রেখায় থাকিত।

(৬) পৃথিবী সমতল হইলে সকল স্থানে একই সময়ে সূর্যাস্ত হইত। সূর্যোদয়ও সর্বত্র একই সময়ে হইত। গোলাকার বলিয়াই তাহা সম্ভব হয় না।

(৭) দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে গোল দেখায়। পৃথিবীও একটি জ্যোতিষ্ক, অতএব পৃথিবীও যে গোলাকার সহজেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছ যে, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্ত যে কতকটা চাপা তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। পরে সে সম্বন্ধে তোমরা জানিতে পারিবে।

প্রশ্নাবলী

১। পৃথিবীর আকার ও আয়তন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। পৃথিবী যে গোলাকার তাহার কতকগুলি প্রমাণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ এবং তাহার ফলাফল

পৃথিবীর গতি—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পৃথিবী স্থির আছে। সূর্য উহাকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্য নিশ্চল এবং পৃথিবী গতিশীল।

পৃথিবীর দুইটি গতি—**আবর্তন** ও **পরিক্রমণ**।

পরীক্ষা—কি করিয়া একই সঙ্গে পৃথিবীর দুই প্রকার গতি হইল নিম্নের পরীক্ষা হইতে তাহা কতকটা ধারণা করিতে পারিবে।

একটি অন্ধকার ঘরে টেবিলের উপরে একটি বাতি রাখ। বাতির চারিদিকে খড়ি দিয়া ডিম্বাকৃতি এক ছক কাটিয়া লও। মনে কর, আলোটা
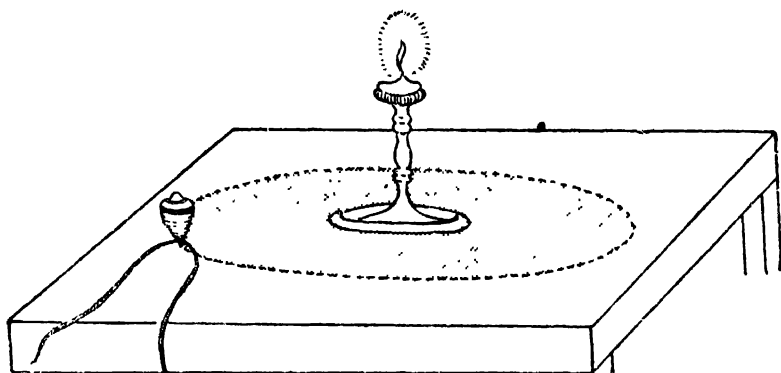
৮নং চিত্র

সূর্য এবং ডিম্বাকৃতি ছক পৃথিবীর ভ্রমণপথ। এইবার টেবিলের উপর একটা লাটিম ঘুরাইয়া দাও। এক টুকরা সূতা লাটিমটির আলোর অন্য ধার দিয়া আন এবং লাটিমটিকে অতি সাবধানে টানিয়া ছকের উপর লও। অতঃপর ঐ সূতার সাহায্যে লাটিমটাকে উহার উপর দিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতে থাক। লাটিমের একই সঙ্গে দুই প্রকার গতি—লাটিম একবার নিজের আলোর উপর ঘুরিতেছে আর একবার ডিম্বাকার পথ বাহিয়া বাতিটির চারিদিকে ঘুরিতেছে। মনে কর, লাটিমটা পৃথিবী। পৃথিবীর গতি এই লাটিমের মতই দুই প্রকার।

পৃথিবীর আবর্তন—পৃথিবী উহার অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে অবিরত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর অক্ষ (axis) বলিতে আমরা পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ ব্যাসকেই কল্পনা করিয়া থাকি। এই অক্ষের চারিদিকে একবার ঘুরিতে সূর্যের হিসাবে (এক মধ্যাহ্ন হইতে পরের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত) পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহাকে **সৌর দিন** (Solar day) বলা হয়। নক্ষত্রের হিসাবে পৃথিবীর একপাক ঘুরিতে সময় লাগে ২৩ ঘ. ৫৬ মি. ৪ সে.। ইহাকেই **নাক্ষত্র দিন** (Sidereal day) বলা হয়।

আবর্তনের ফলে দিনরাত্রি হয়, সেইজন্য ইহাকে পৃথিবীর **আহ্নিক গতি** বলা হয়।

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে বৃহত্তম পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। সেখানে গতিবেগ ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও অধিক। ঐ স্থান হইতে যতই উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে অগ্রসর হইবে আহ্নিক গতির বেগ ততই কমিবে। মেরুবিন্দুতে গতিবেগ একেবারেই নাই।

আবর্তনের কয়েকটি প্রমাণ

(১) দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। সুতরাং উহাও নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

(২) নরম জিনিস পাক খাইলে ক্রমশ দুই প্রান্ত চাপা এবং মধ্যভাগ স্ফীত হইয়া যায়। পৃথিবীর আদি অবস্থায় নরম ছিল। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, আবর্তনের ফলেই উহার মেরুপ্রদেশ কিঞ্চিৎ চাপা ও বিষুব-রেখার দিকটা অপেক্ষাকৃত স্ফীত হইয়াছে।

(৩) সূর্য ও নক্ষত্রাদি প্রত্যহ পূর্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, হয় পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে, না-হয় সূর্য ও নক্ষত্রাদি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি মাইলেরও বেশী এবং অন্যান্য নক্ষত্র ইহার চেয়েও

দূরবর্তী। ইহাদের ঘুরিতে হইলে গতির যেরূপ দ্রুততা আবশ্যক গণিতশাস্ত্রমতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি লক্ষ লক্ষ গুণ বড় জিনিসকে তাহার চতুর্দিকে ঘুরাইতে কখনই সমর্থ হইতে পারে না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে পৃথিবীই আপন অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে।
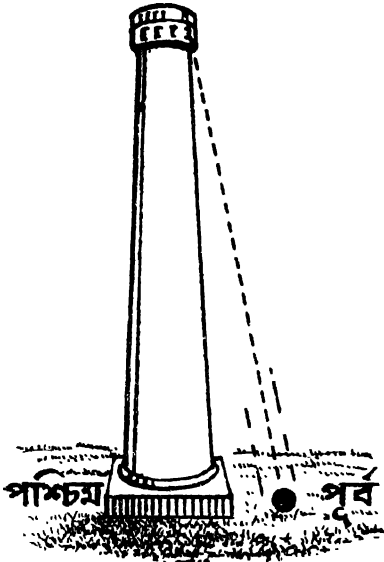
৯নং চিত্র

(৪) নিশ্চল বাতাসে কোন ভারী জিনিস অনেক উঁচু হইতে ছাড়িয়া দিলে উহা ঠিক লম্ব-রেখাক্রমে মাটিতে পড়ে না, কিছু পূর্বদিকে সরিয়া পড়ে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তিত হইতেছে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

(৫) ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফুকো (Foucault) খুব উঁচু মন্দিরের চূড়া হইতে সরু তারের মাথায় একটি দোলক ঝুলাইয়া দেন। দোলকের নীচে মাটির উপর বালি ছড়ানো ছিল। দোলক দোলাইয়া দিলে সংলগ্ন আলপিনটি বালির উপর দাগ কাটিতে লাগিল। ফুকো লক্ষ্য করিলেন, দাগগুলি একটু একটু করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে সরিতেছে। অবশেষে ঐ সমস্ত দাগ দিয়া একটি উপবৃত্তের সৃষ্টি হইল। ফুকোর পরীক্ষায় পৃথিবীর আহ্নিক গতি নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।
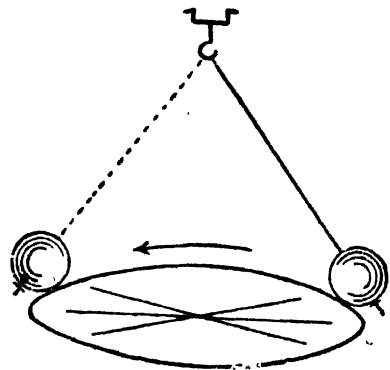
১০নং চিত্র—ফুকোর পরীক্ষা

(৬) বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া যায়। পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করিতেছে বলিয়াই এরূপ হয়।

আবর্তনের ফলাফল—পৃথিবীপৃষ্ঠের যে দিকে সূর্য আবর্তন করে সেই অংশ আলোকিত হয়, সেখানে তখন দিন। বিপরীত অর্ধাংশ সূর্যকিরণের অভাবে আঁধার হইয়া থাকে। সেখানে তখন রাত্রি। আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মিলনস্থানকে ছায়াবৃত্ত বলে। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তিত হইতেছে, একথা তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি। এইভাবে আবর্তিত হওয়ার ফলেই প্রতিদিন সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত হইতে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখা যায়। এই আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের সম্মুখে থাকে সেখানে দিন এবং অপর অংশ যাহা সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে তথায় রাত্রি হয়। যে স্থান ছায়াবৃত্ত অতিক্রম করিয়া আলোতে
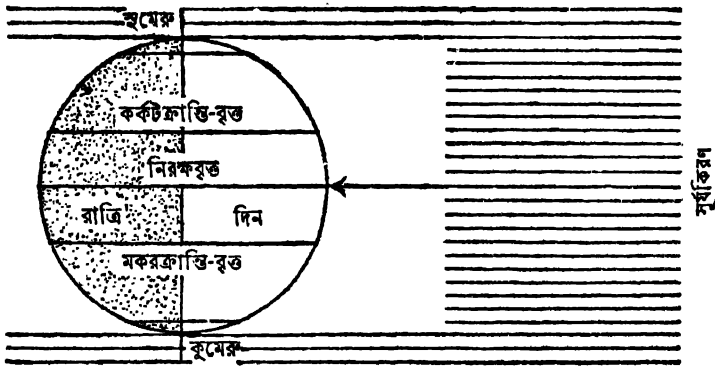
১১নং চিত্র

আসিতেছে তথায় উষা এবং যে স্থান অন্ধকারে যাইতেছে তথায় সন্ধ্যা হয়। এইভাবে আবর্তনের ফলে পৃথিবীতে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন হইতেছে। যদি পৃথিবী আবর্তিত না হইত তবে এক অংশে চিরকাল আলোক থাকিত এবং অপর অংশে চিররাত্রি বিরাজ করিত।

পৃথিবীর পরিক্রমণ—পৃথিবী অক্ষের চারিদিকে আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে। এই ভ্রমণ-পথকে কক্ষ (Orbit) বলে। ইহা সম্পূর্ণ গোল নহে, উপবৃত্তাকার (Elliptical)। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড (মোটামুটি হিসাবে ৩৬৫¼ দিন) সময় লাগে। ইহাই সৌর বৎসর। সূর্য-পরিক্রমণে এক বৎসর সময় লাগে, তাই পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বলা হয়।

পরিক্রমণের কয়েকটি প্রমাণ

(১) দূরবীক্ষণ যন্ত্র-যোগে দেখা যায় সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে। পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ। তাহার পক্ষে ভিন্ন রীতি হইবে কেন? ইহাও সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক।

(২) কোন নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রত্যহই একটু একটু করিয়া পশ্চিমদিকে সরিয়া ইহারা উদিত হইতেছে, অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। ঠিক এক বৎসর পরে নির্দিষ্ট সময়ে অবিকল পূর্বদৃষ্ট স্থানে উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্রগুলি স্থির, মহাকর্ষ তত্ত্ব (Law of Gravitation) অনুযায়ী উহাদের পক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ অসম্ভব। অতএব পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে।

(৩) কেবলমাত্র ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঠিক পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয়। ২১শে মার্চের পর ক্রমে উত্তরে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর ক্রমে দক্ষিণে সরিয়া সূর্য উঠে। সূর্যের এই উত্তর-দক্ষিণ আপাত-গতি পৃথিবীর পরিক্রমণের জন্যই ঘটিয়া থাকে।

(৪) পৃথিবী একই স্থানে থাকিয়া আবর্তিত হইলে ঋতুপরিবর্তন ঘটিত না এবং কোন স্থানে চিররাত্রি বা চিরদিবা হইত।

পরিক্রমণের ফলাফল—সূর্য-পরিক্রমণ-কালে পৃথিবীর অক্ষ উহার কক্ষ-সমতলের সহিত সর্বদাই ৬৬½° কোণে হেলানো অবস্থায় আছে। এইভাবে

হেলানো থাকিয়া আবর্তন ও পরিক্রমণ করার ফলে পৃথিবীতে **দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি** ও **ঋতু পরিবর্তন** ঘটিয়া থাকে।

পৃথিবীর কক্ষ অক্ষতলের উপর হেলানো ভাবে না থাকিলে কি পরিবর্তন ঘটিত তাহাই তোমাদিগকে এখন বলিতেছি।

পরিক্রমণের সময় অক্ষ কক্ষতলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করিলে ছায়াবৃত্ত সমস্ত অক্ষরেখাকে তুইটি সমঅংশে ভাগ করিত। তাহা হইলে পৃথিবীর সর্বত্র ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি হইত। আকাশের সুনির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটিত।

লম্বভাবে না থাকিয়া যদি অক্ষ কক্ষতলের সমান্তরাল অবস্থায় থাকিত তবে পৃথিবীর অর্ধেক অংশে চিরদিবা এবং অপর অর্ধেক ভাগে চিররাত্রি বিরাজ করিত ; কিন্তু এরূপ কিছুই ঘটে না।

পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের উপর ৬৬½° কোণে সর্বদা একই দিকে হেলিয়া আছে এবং এই অক্ষ সর্বদাই 'ধ্রুব' নক্ষত্রের অভিমুখী থাকে। এইরূপ হেলানো অবস্থায় একটি উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে।

দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি—পৃথিবীর অক্ষ কক্ষতলের সহিত হেলানো অবস্থায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দিবারাত্রির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

২১শে মার্চ ঠিক পূর্বদিকে সূর্য উঠে। ঐদিন সূর্য নিরক্ষবৃত্তের উপর ঠিক লম্বভাবে কিরণ দেয়। ছায়াবৃত্ত ঐদিন সমস্ত অক্ষরেখাকে তুই সমান অংশে ভাগ করে ; অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি ১২ ঘণ্টা করিয়া হয়। এই দিনটি মহাবিষুব * (Vernal Equinox) বলিয়া কথিত হয়।

ইহার পর দেখা যায়, সূর্য প্রতিদিন একটু একটু উত্তরে সরিয়া উদিত হইতেছে। তখন হইতেই সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। এইভাবে উত্তরে একটু একটু সরিয়া ২১শে জুন সূর্য এই উত্তরমুখী গতির শেষ সীমায় পৌছায়। ঐদিন সূর্য কর্কটক্রান্তির (২৩½° উ. অক্ষরেখা) উপরে লম্বভাবে কিরণ দেয়।

* দিনরাত্রির সম অবস্থাকে বিষুব (Equinox) বলে।

নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, ছায়াবৃত্ত উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখাগুলিকে দুইটি অসমান অংশে ভাগ করিয়াছে। উত্তর গোলার্ধে অক্ষ-রেখাগুলির অধিকাংশই আলোর দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে অধিকাংশ
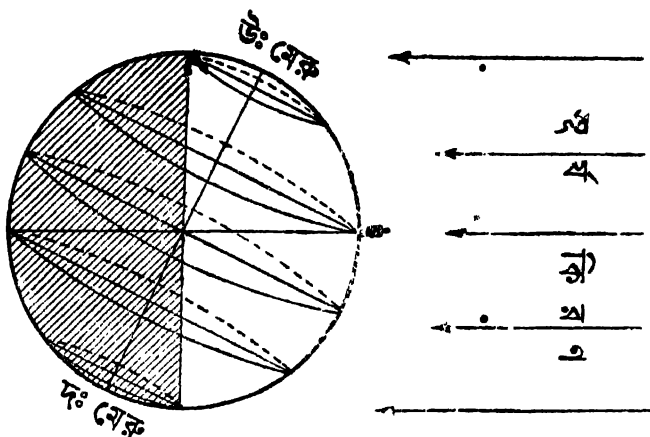
১২নং চিত্র—২১শে জুন সূর্যরশ্মির অবস্থা

অন্ধকারে আছে। তখন উত্তর গোলার্ধে দিন বড় ও রাত্রি ছোট এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট ও রাত্রি বড়। ২১শে জুন সূর্যের অবস্থানকে **উত্তরায়নান্ত** (Summer solastice) বলে।

সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের পরিমাণ কমিতে থাকে। ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র দিন দীর্ঘতম এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম। এইদিন সুমেরু বৃত্তের উত্তর অংশ সব সময় সূর্যকিরণ পায়, তাই এই অংশে আদৌ রাত্রি হয় না।

দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত অবস্থা। সেখানে দিন খুব ছোট, রাত্রি খুব বড়। কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণে তখন ২৪ ঘণ্টাই রাত্রি।

২১শে জুনের পর হইতে দেখা যায় সূর্য প্রত্যহ একটু একটু দক্ষিণে সরিয়া উদিত হইতেছে। এমনি ভাবে দক্ষিণে সরিতে সরিতে ২৩শে সেপ্টেম্বর

তারিখে সূর্য ঠিক নিরক্ষরেখার উপরে লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে। এইদিনও পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রির পরিমাণ সমান থাকে। এই দিনটি **জলবিষুব** (Autumnal Equinox) নামে পরিচিত।

কোন স্থানে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়িলে বেশী বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়। অতএব লম্ব রশ্মির চেয়ে তির্যক রশ্মির উত্তাপ কম।
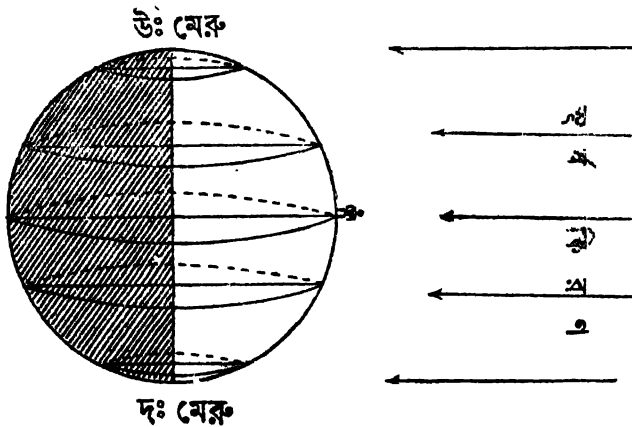
১৩ নং চিত্র—২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মির অবস্থা

মহাবিষুব হইতে জলবিষুব পর্যন্ত উত্তর মেরু সর্বদা আলোকিত থাকে। দক্ষিণ মেরু এই সময়ে আদৌ আলোক পায় না। এইজন্য এই ছয়মাস উত্তর মেরুতে দিন ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি।

২৩শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে সূর্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে সরিতে থাকে অর্থাৎ তখন হইতে সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। উত্তর গোলার্ধে তখন হইতে দিনের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং রাত্রির পরিমাণ বাড়িতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন হইতে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং রাত্রির পরিমাণ কমিতে থাকে।

২২শে ডিসেম্বর সূর্যের দক্ষিণমুখী গতির শেষ হয়। সেদিন সূর্য মকরক্রান্তির (২৩½° দ. অক্ষরেখা) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই তারিখের সূর্যের অবস্থানকে **দক্ষিণায়নান্ত** (Winter solastice) বলে।

এইদিন দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বত্র দিন দীর্ঘতম এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম। দক্ষিণ মেরুবিন্দু হইতে কুমেরু বৃত্ত অবধি আদৌ রাত্রি হয় না। উত্তর গোলার্ধে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা।

২২শে ডিসেম্বরের পর হইতে, সূর্য আবার উত্তর দিকে সরিতে থাকে। উত্তর গোলার্ধে তখন ক্রমশ দিন বাড়ে এবং রাত্রি কমে। এমনি ভাবে মহাবিষুবে (২১শে মার্চ) আসিয়া পৌছে। জলবিষুব হইতে মহাবিষুব পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু সর্বদা আলোকিত থাকে। উত্তর মেরু এই সময়ে আদৌ আলোক পায় না। এই ছয়মাস উত্তর মেরুতে রাত্রি এবং দক্ষিণ মেরুতে দিন।
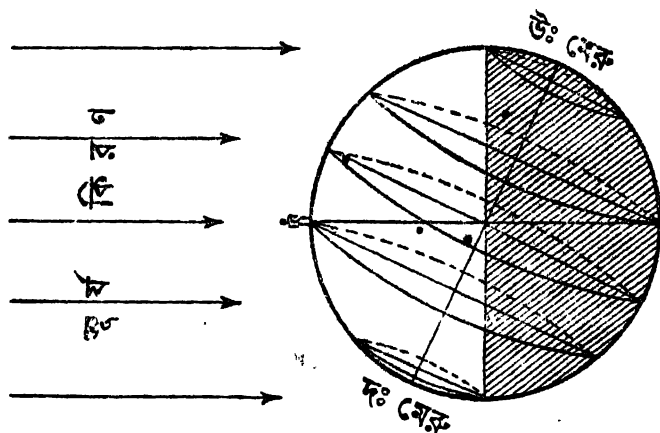
১৪নং চিত্র—২১শে ডিসেম্বর সূর্যরশ্মির অবস্থা

কক্ষ-সমতলের সহিত ৬৬$\frac{1}{2}°$ কোণে হেলানো থাকিয়া আবর্তনরত পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলিয়াই এমনি ভাবে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

ঋতু-পরিবর্তন—সূর্য পরিক্রমণের সময় পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষতলের উপর একই দিকে হেলিয়া থাকে বলিয়া পৃথিবীতে দিবারাত্রির এবং সূর্যতাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সেইজন্য পৃথিবীতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়। **সাধারণত তিনটি কারণে ভূপৃষ্ঠে সূর্যতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।**

(১) সূর্যকিরণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার সময় বাতাসে উহার কতকটা তাপ শোষণ করিয়া লয়। সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়িলে যে পরিমাণ বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়, তির্যকভাবে পড়িলে তাহার চেয়ে অধিক পরিমাণ বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়। তাই তির্যকরশ্মির উত্তাপন-ক্ষমতা কম।

(২) সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়িলে যতটা জায়গায় ছড়ায়, তির্যকভাবে পড়িলে তাহার চেয়ে বেশী জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে। একই পরিমাণ সূর্যকিরণ বেশী জায়গায় ছড়াইয়া পড়িলে স্বভাবতই কম উত্তাপ অনুভূত হইবে। অতএব সূর্যকিরণ যেখানে তির্যকভাবে পড়ে সেখানকার চেয়ে যেখানে লম্বভাবে পড়ে সেখানে উত্তাপ বেশী হয়।
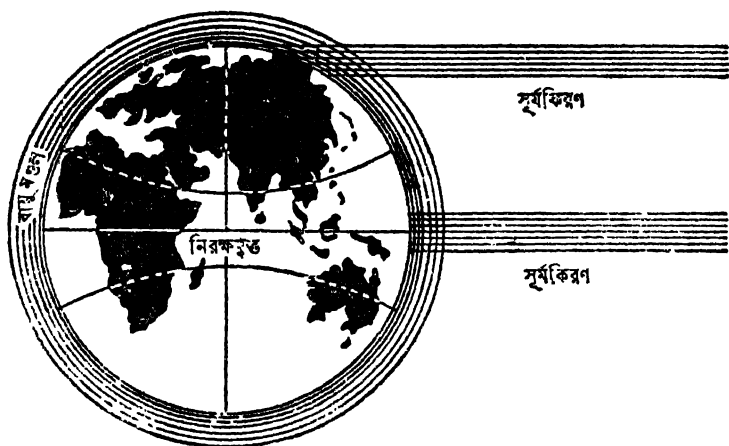
১৫ নং চিত্র

(৩) ভূ-পৃষ্ঠ দিনের বেলা সূর্য হইতে তাপ গ্রহণ করে, রাত্রিতে উহা বিকিরণ করিয়া যথাসম্ভব শীতল হয়। দিন বড় এবং রাত্রি ছোট হইলে সমস্ত তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না, কিছু সঞ্চিত রহিয়া যায়। কিছুকাল এইরূপ চলিলে উষ্ণতা তীব্র হইয়া উঠে। অপরপক্ষে রাত্রি বড় হইলে দিনের বেলা সঞ্চিত তাপের চেয়ে রাত্রিতে বেশী তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায়। কাজেই অল্প অল্প করিয়া নিজস্ব তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হইতে থাকে।

পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষতলের উপর একই দিকে হেলিয়া থাকে বলিয়া সূর্য পরিক্রমণের সময় কখন উত্তর গোলার্ধ কখন বা দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয়। সূর্যের নিকটে গেলে সেই গোলার্ধে তখন লম্বভাবে সূর্যকিরণ পড়ে এবং দিনের পরিমাণ বেশী ও রাত্রির পরিমাণ কম হয়। অতএব তখন উত্তাপ বাড়ে। বিপরীত গোলার্ধে তখন সূর্যকিরণ অপেক্ষাকৃত তির্যকভাবে পড়ে, সেখানে রাত্রির পরিমাণ বেশী এবং দিনের পরিমাণ কম, তাই সেখানে উত্তাপ কম অনুভূত হয়।

২১শে মার্চের পর হইতে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, উত্তর গোলার্ধে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়িতে আরম্ভ করে। ২১শে জুন সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয়। সেইজন্য ২১শে জুনের পূর্ব হইতে উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বাড়িতে থাকে। ২১শে জুন মধ্য গ্রীষ্মকাল। ইহার পর আরও দেড়-মাস কাল উত্তর গোলার্ধে প্রখর উত্তাপ অনুভূত হয়। কাজেই ৩১শে জুনের পূর্বের দেড়-মাস এবং পরের দেড়-মাস এই তিন মাস **উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল**। দক্ষিণ গোলার্ধে তখন তির্যকভাবে সূর্যকিরণ পড়ে, দিন ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। কাজেই উত্তাপ কম অনুভূত হয়। অতএব এই তিন মাস **দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল**।

২১শে জুনের পর হইতে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর উভয় গোলার্ধে দিনরাত্রির পরিমাণ সমান হয়। সেই দিন সূর্য নিরক্ষবৃত্তের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ২৩শে সেপ্টেম্বরে দেড়-মাস পূর্ব হইতে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের প্রখরতা এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের তীব্রতা হ্রাস পাইতে থাকে। ক্রমশ একটা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা ২৩শে সেপ্টেম্বরের দেড়-মাস পর পর্যন্ত থাকে। কাজেই এই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে একটা নাতিশীতোষ্ণ ঋতুর আবির্ভাব হয়। **উত্তর গোলার্ধে** যখন **শরৎকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে** তখন **বসন্তকাল**।

২৩শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে উত্তর গোলার্ধে রাত্রির চেয়ে দিনের পরিমাণ কম হইতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা

কম হয়। তখন উত্তর গোলার্ধে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে লম্বভাবে পতিত হয়। কাজেই ২২শে ডিসেম্বরের দেড়-মাস পূর্ব হইতেই উত্তর গোলার্ধে শীত অনুভূত হইতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বরের পরেও দেড়-মাস কাল শীত থাকে। তাই এই তিন মাস **উত্তর গোলার্ধে শীতকাল**, এবং **দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল**।

আবার ২২শে ডিসেম্বরের পর হইতে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং ২১শে মার্চ উভয় গোলার্ধে সম দিন-রাত্রি হয়। ২১শে
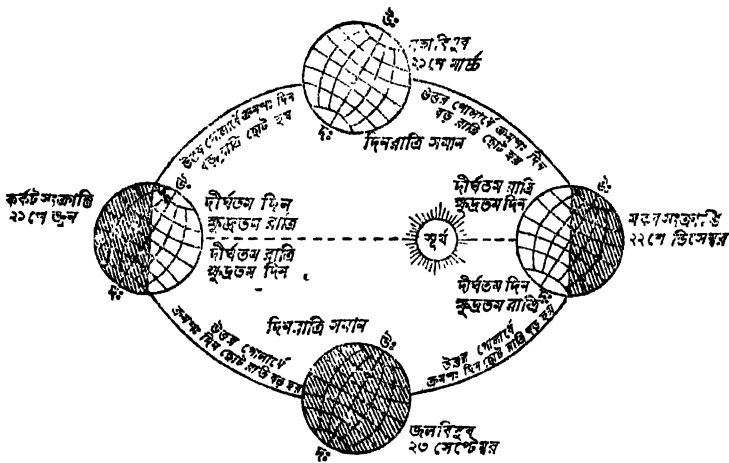
১৬নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থান ও দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি

মার্চের দেড়-মাস পূর্ব হইতেই উত্তর গোলার্ধে শীতের তীব্রতা হ্রাস পাইতে থাকে; শীত এবং গ্রীষ্মের একটা সমভাব আরম্ভ হয়। এই অবস্থা ২১শে মার্চের দেড়-মাস পর পর্যন্ত থাকে। এই তিন মাস কাল উভয় গোলার্ধেই নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা। তখন **উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল** ও **দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল**।

এইভাবে পৃথিবীতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতু দেখা যায়।

গ্রহণ—পৃথিবী সূর্য পরিক্রমণ করে; চন্দ্র পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। উভয়ের কক্ষতল পরস্পর ৫° কৌণিকভাবে অবস্থিত এবং কক্ষপথ দুইটি পরস্পরকে দুই বিন্দুতে ছেদ

করিয়াছে। পরিক্রমণ করিবার সময় যখন চন্দ্র ঐ ছেদবিন্দুর নিকটে আসিয়া পড়ে তখন যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় থাকে তবে কখনও পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করে, কখনও বা চন্দ্রের ছায়া পড়িয়া পৃথিবীর সূর্যালোক গ্রহণে বাধা জন্মায়। উভয় অবস্থাকে 'গ্রহণ' বলে।

পূর্ণিমা-তিথিতে চন্দ্র যদি ছেদবিন্দুতে আসে বা উহার সমীপবর্তী হয় তবে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থান একটি সরলরেখায় (অথবা প্রায় এক সরলরেখায়) হইয়া থাকে। পৃথিবী পূর্ণিমা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী থাকে। অতএব সরল রেখায় অবস্থিতির ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। ঐ ছায়া যখন চন্দ্রকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে, তখন **পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** হয়। চন্দ্রের অংশবিশেষ ঢাকা থাকিলে সেই অবস্থাকে **খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ** বলে।
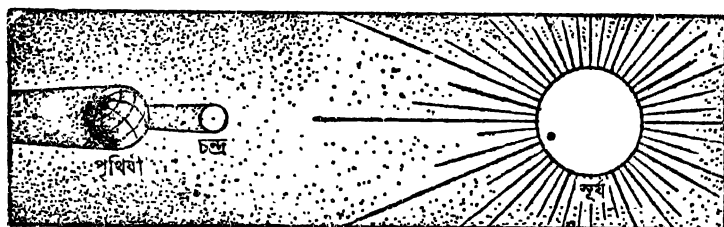
১৭নং চিত্র—সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চন্দ্র

অমাবস্যা-তিথিতে যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় থাকে তবে ঐ সময় (অমাবস্যায় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকে বলিয়া) সূর্যকিরণে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে। এই অবস্থায় সূর্যমণ্ডল যদি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়া যায় তবে **পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ** এবং যদি আংশিক ঢাকা পড়ে তবে **খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ** হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

১। পৃথিবীর গতি কয়টি? ইহাদের ফলাফল কি তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

২। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির প্রমাণ কি কি তাহা বল।

৩। কক্ষসমতলের সহিত পৃথিবীর মেরুদণ্ড কিভাবে অবস্থিত, যদি পৃথিবীর মেরুদণ্ড কক্ষতলের সহিত লম্বভাবে অথবা সমান্তরালভাবে থাকিত তবে আমরা পৃথিবীতে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতাম তাহা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, কেন এবং কিভাবে ঘটে, তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

৫। ঋতু পরিবর্তন কি ভাবে হয় তাহা চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও সময়

অক্ষরেখা ও অক্ষাংশ—পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থিতি নির্ণয় ও অন্যান্য নানা প্রকার গণনার সুবিধার জন্য পৃথ্বীলগ্ন কতকগুলি রেখার কল্পনা করা হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে পৃথিবী উহার অক্ষের (axis) চারিদিকে আবর্তন করিতেছে। এই কাল্পনিক রেখা পৃথিবীপৃষ্ঠকে যে দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে তাহাদিগকে **মেরুবিন্দু** (Poles) বলা হয়। ইহাদের মধ্যে যে
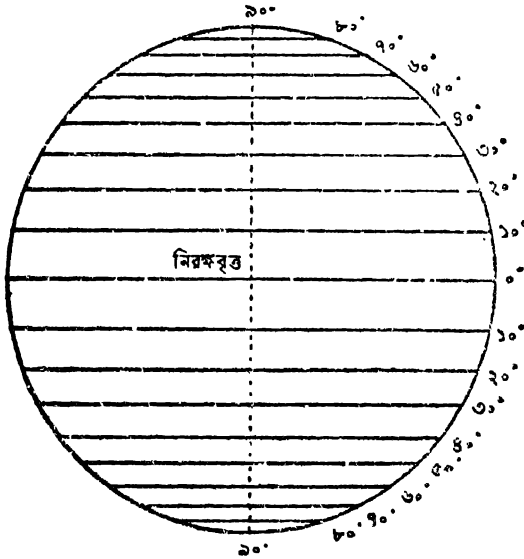
১৮নং চিত্র—নিরক্ষবৃত্ত ও সমাক্ষরেখা

বিন্দুটি ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে তাহাকে **উত্তর মেরু** বা **সুমেরু** (North Pole) এবং অপরটিকে **দক্ষিণ মেরু** বা **কুমেরু** (South Pole) বলা হয়। মেরুদ্বয়কে যে কল্পিত সরলরেখা সংযুক্ত করিয়াছে তাহাকে **মেরুরেখা** (Polar axis) বলে। ইহাই পৃথিবীর আবর্তন-অক্ষ (Rotational axis)।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমান দূরে ভূ-পৃষ্ঠে পূর্ব-পশ্চিমে একটা রেখা কল্পনা করা হয়; ইহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহাকে নিরক্ষবৃত্ত বা বিষুবরেখা বলা হয়। নিরক্ষবৃত্ত পৃথিবীকে দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর ভাগকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।

নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণে ইহার সমান্তর আরও অনেক বৃত্ত কল্পিত হইয়াছে। তাহাদিগকে **সমাক্ষরেখা** (Parallels of latitude) সংক্ষেপে **অক্ষরেখা** বলে।
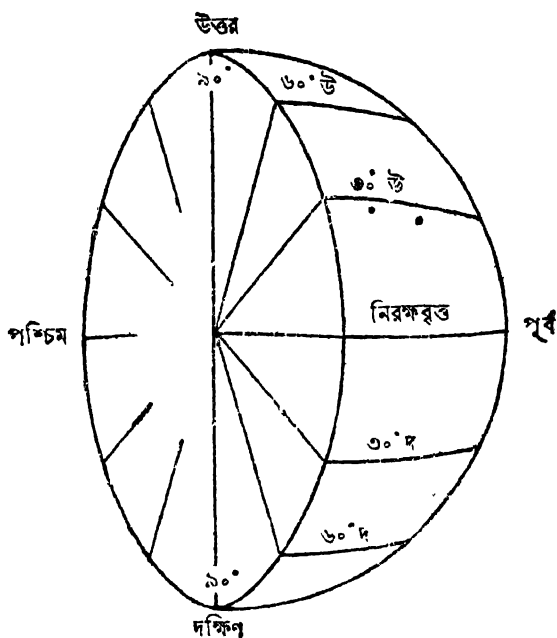
১৯নং চিত্র—অক্ষাংশ

ভূ-পৃষ্ঠে কোন দুই স্থানকে কেন্দ্রের সহিত যোগ করিলে যে কোণ উৎপন্ন হয় উহাকে ঐ দুই স্থানের **কৌণিক দূরত্ব** বলে। বিষুবরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের **অক্ষাংশ**

বলে। বিষুবরেখার উত্তরের অক্ষাংশ উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণের অক্ষাংশ দক্ষিণ অক্ষাংশ নামে পরিচিত। বিষুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কৌণিক দূরত্ব ৯০°। প্রত্যেক ডিগ্রিকে ৬০′ (মিনিটে) এবং প্রত্যেক মিনিটকে আবার ৬০″ (সেকেণ্ডে) ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগের উপর দিয়া এক্-একটি সমাক্ষরেখা কল্পনা করা হয়। সমাক্ষরেখা বিষুবরেখার সমান্তরাল, তাই একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ সমান।
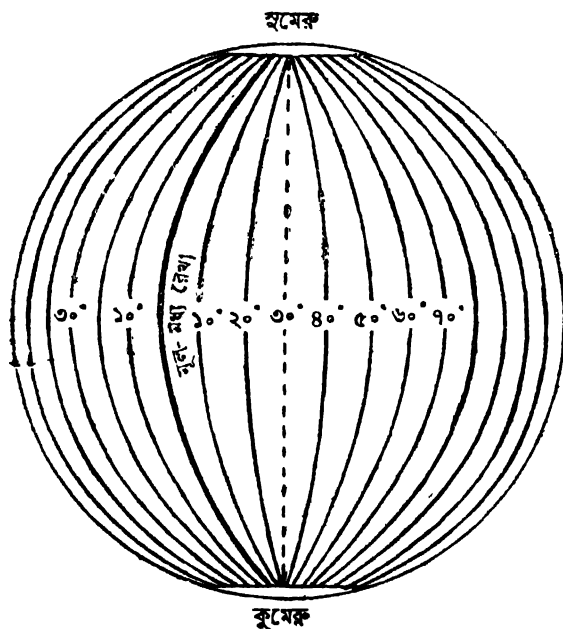
২০নং চিত্র—মধ্যরেখা ও মূল-মধ্যরেখা

নিরক্ষবৃত্তকে ০° ধরা হয়। ইহার উত্তরে ও দক্ষিণে যদি ১° পর পর অক্ষরেখা কল্পনা করা হয় তবে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ৯০টি ও দক্ষিণে ৯০টি অক্ষরেখা হইবে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের অক্ষরেখাগুলিকে উত্তর অক্ষরেখা এবং দক্ষিণের অক্ষরেখাগুলিকে দক্ষিণ অক্ষরেখা বলে।

কলিকাতার অক্ষাংশ ২২° ৩৪′ উ.। উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে কলিকাতা

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং কলিকাতা হইতে ভূ-কেন্দ্র অবধি একটি ব্যাসার্ধ টানিলে তাহা নিরক্ষবৃত্তের সমতলের সহিত ২২°৩৪′ কোণ উৎপন্ন করিবে।

নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২৩½° ব্যবধানে উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুইটি অক্ষরেখা কল্পনা করা হয় তাহাদের নাম যথাক্রমে **কর্কটক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of
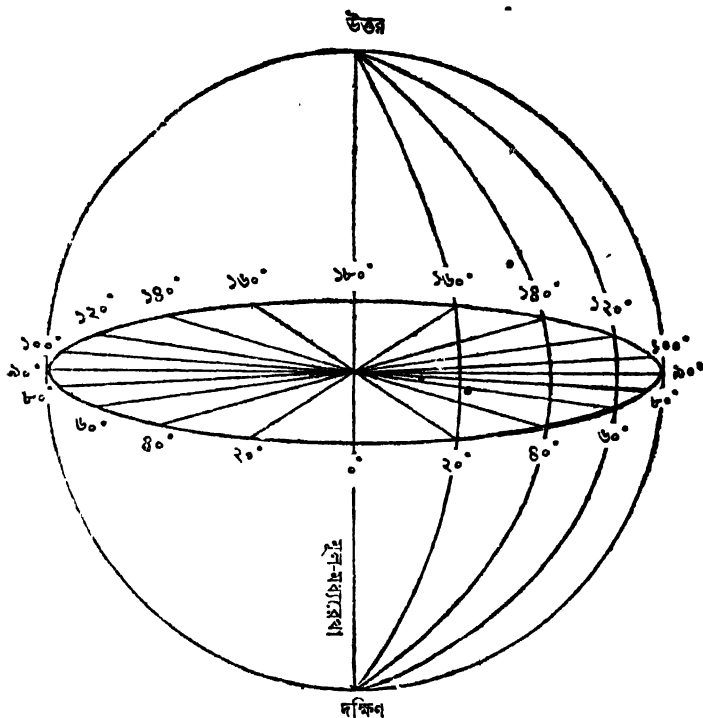
২১নং চিত্র—দেশান্তর বা দ্রাঘিমা

cancer) ও **মকরক্রান্তি বৃত্ত** (Tropic of capricorn)। ৬৬½° ব্যবধানে উত্তর ও দক্ষিণে আরও দুইটি অক্ষরেখা কল্পনা করা হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে **সুমেরু বৃত্ত** (Arctic circle) ও **কুমেরু বৃত্ত** (Antarctic circle)।

দ্রাঘিমারেখা ও দ্রাঘিমা—নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত কতকগুলি অর্ধ-বৃত্ত রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাদের নাম **মধ্যরেখা**

বা **দ্রাঘিমারেখা** (Lines of longitude)। ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থানেই এরূপ মধ্যরেখা আছে। হিসাবের সুবিধার জন্য ইহাদের কোন একটি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। লণ্ডনের নিকটবর্তী গ্রীনিচের (Greenwich) উপর দিয়া যে মধ্যরেখা গিয়াছে ইহাকে **মূল মধ্যরেখা** (Prime meridian) বলিয়া ধরা হয়।

ভূ-পরিধি ৩৬০°। কাজেই ১° ব্যবধানে দ্রাঘিমারেখা কল্পনা করা হইলে ভূ-পৃষ্ঠে ৩৬০টি দ্রাঘিমারেখা হইবে। মূল মধ্যরেখাকে ০° ধরিয়া উহার পূর্বদিকে ১৮০° পর্যন্ত পূর্ব দ্রাঘিমা এবং অনুরূপ ভাবে পশ্চিম দিকেও ১৮০° পর্যন্ত পশ্চিম দ্রাঘিমা কল্পনা করা হয়। অক্ষাংশের মত এখানেও ডিগ্রীকে ৬০′ মিনিট এবং মিনিটকে ৬০″ সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়।

মূল মধ্যরেখা হইতে পূর্বে বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের **দেশান্তর** বা **দ্রাঘিমা** (longitude) বলে। পূর্বদিকের কৌণিক দূরত্বকে পূর্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিম দিকের কৌণিক দূরত্বকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে।

কলিকাতার দ্রাঘিমা ৮৮°২৪′ পূ.। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কলিকাতা মূল মধ্যরেখার পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার দ্রাঘিমারেখা ও মূল মধ্যরেখা দুইটি বিন্দুতে নিরক্ষবৃত্তকে ছেদ করিয়াছে; উভয় বিন্দু হইতে ভূ-কেন্দ্র অবধি ব্যাসার্ধ টানিলে অন্তর্বর্তী কোণের পরিমাণ ৮৮°২৪′ হইবে।

অক্ষাংশ ও দেশান্তরের ব্যবহার

(১) অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা থাকিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।

(২) অক্ষাংশের সাহায্যে কোন স্থানের উত্তাপের আভাস পাওয়া যায়; এক সমাক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে তাপ মোটামুটি এক প্রকার।

(৩) দেশান্তরের সাহায্যে স্থানীয় সময় ঠিক করা যায়। একই মধ্যরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থান একই স্থানীয় সময় নির্দেশ করে।

অক্ষাংশ নির্ণয়—উত্তর গোলার্ধে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ ধ্রুবনক্ষত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

পৃথিবীর কল্পিত মেরুরেখাকে উত্তরদিকে বাড়াইলে উহা ধ্রুব নক্ষত্রের অতি নিকট দিয়া যাইবে। নিরক্ষবৃত্ত (অর্থাৎ ০° অক্ষাংশ) হইতে ধ্রুব নক্ষত্রকে দিগন্তরেখায় দেখা যায়; অতএব নিরক্ষবৃত্তে উহার উন্নতি ০°*। নিরক্ষবৃত্ত হইতে সুমেরুর দিকে ধ্রুবতারার উন্নতি প্রতি ডিগ্রি অক্ষরেখা ব্যবধানে ১° করিয়া বাড়িতে থাকে। সুমেরু বিন্দুতে ধ্রুবতারাকে ঠিক মাথার উপরে দেখা যায়; অর্থাৎ ঐ স্থানে ইহার ৯০°।

উত্তর গোলার্ধে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ সেই স্থানের ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতির সমান।

প্রমাণ—

মনে কর **খজউগদ** বৃত্তটি পৃথিবী এবং **ক** উহার কেন্দ্র। **জ** পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন স্থান। **খগ** নিরক্ষ-রেখা। অতএব **জ** স্থানের অক্ষাংশ = ∠**জকখ**। **উদ** পৃথিবীর মেরুরেখা। **ধ** ধ্রুব নক্ষত্র। **ঘঙ** **জ** স্থানের দিগন্তরেখা। উহা বৃত্তের স্পর্শক বলিয়া **কজ** রেখার উপর লম্ব। ধ্রুব নক্ষত্র পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সেইজন্য **জ** হইতে উহাকে **উধ** রেখার সমান্তরাল **জধ'** রেখায় দেখা যাইবে। অতএব ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতি = ∠**ঘজধ'**।

∠**চজঘ** = ৯০° = ∠**খকধ**।

২২নং চিত্র

∴ ∠**চজধ'** + ∠**ঘজধ'** = ∠**জকখ** + ∠**জকধ**।

* দিগন্তরেখা ও জ্যোতিষ্কের অবস্থানের মধ্যে যে কৌণিক দূরত্ব উহাই ঐ জ্যোতিষ্কের উন্নতি (Altitude)।
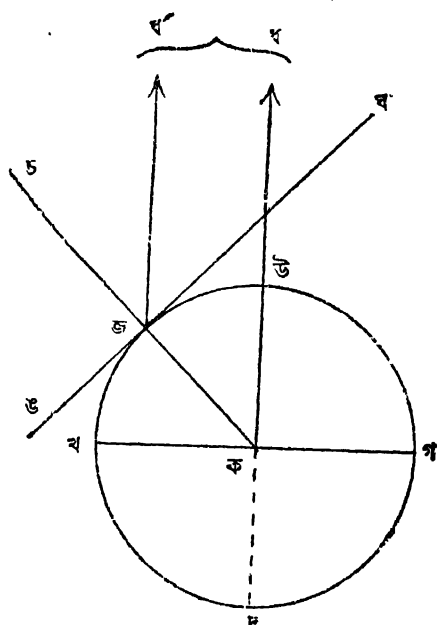
আবার **জধ'** ও **কধ** রেখাদ্বয় সমান্তরাল, সুতরাং ∠**চজধ'** = ∠**জকধ**।

অতএব ∠**ঘজধ'** = ∠**জকখ** ; অর্থাৎ **জ** স্থানের ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি = **জ** অক্ষাংশ।

সুতরাং ধ্রুবতারার সাহায্যে উত্তর গোলার্ধে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। দক্ষিণ গোলার্ধ হইতে ধ্রুবতারা দেখা যায় না। তাই উহার সাহায্যে দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায় না। তবে দক্ষিণ মেরু-নির্দেশক অন্য নক্ষত্রের সাহায্যে অনুরূপভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

ধ্রুবনক্ষত্রের (বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের) উন্নতি নির্ণয়ের উপায়—

(১) একটা ছোট কাঠি **ক'খ** এবং তাহার উত্তরে একটি **কখ'** সোজা করিয়া মাটিতে পোঁত। দুইটি কাঠির মাথা এবং ধ্রুব নক্ষত্র যেন এক রেখায় দেখা যায়। কাঠি দুইটির দৈর্ঘ্য ও পরস্পর ব্যবধানের অনুপাতে দুইটি সরলরেখা **কখ** ও **ক'খ'** লম্বভাবে কাগজের উপর আঁক। রেখা দুইটির মাথা ও গোড়া **গক** ও **গখ'** সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করে। ইহার অন্তর্বর্তী ∠**কগখ** ধ্রুবতারার উন্নতি।
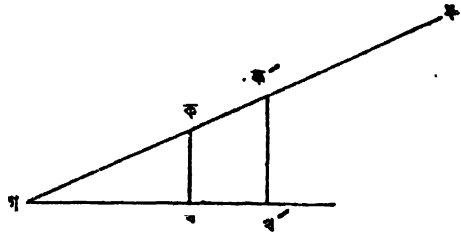
২৩নং চিত্র

(২) থিওডোলাইট (Theodolite), সেক্সট্যাণ্ট (Sextant) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেও ধ্রুবনক্ষত্রের উন্নতি নির্ণয় করা যায়।

সূর্যের সাহায্যেও যে কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়।

কোন স্থানের অক্ষাংশ = ৯০° − সূর্যের স্থানিক উন্নতি + বিষুব লম্ব*

[বিষুব লম্ব উত্তর গোলার্ধে যোগ ও দক্ষিণ গোলার্ধে বিয়োগ করিতে হয়।]

---

* সূর্য প্রতিদিন কোন না কোন স্থানের মাথার উপর অর্থাৎ খ-মধ্যে (Zenith) আসে। ঐ স্থানের অক্ষাংশকে সেই দিনের বিষুব লম্ব (Declination of the Sun) বলে।

দৃষ্টান্ত—পার্শ্বের চিত্রে বৃত্তটি পৃথিবী, **ক** উহার কেন্দ্র। **জ** উত্তর গোলার্ধের কোন স্থান। উহার অক্ষাংশ নির্ণয় করিতে হইবে। এই দিন **খ** স্থানে দ্বিপ্রহরে সূর্য **খ**-মধ্যে আছে। অর্থাৎ **কগস** একই সরলরেখায় অবস্থিত।
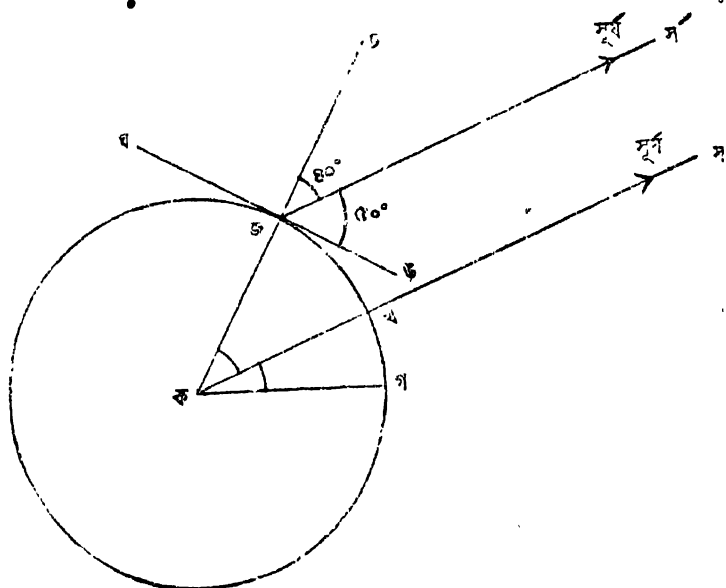
২৪নং চিত্র

কগ কেন্দ্র হইতে বিষুবরেখা পর্যন্ত অঙ্কিত ব্যাসার্ধ। অতএব কোণ∠**খকগ** ঐ দিনের বিষুবলম্ব। নৌসারণী হইতে দেখা গেল উহার পরিমাণ ২০°। **কখস** সরলরেখার সমান্তরাল করিয়া **জস'** সরলরেখা টান। সূর্য বহু দূরবর্তী বলিয়া **জ** হইতে উহাকে **জস'** সরলরেখায় দেখা যাইবে। **জ** স্থানের দিগন্তরেখা **ঘঙ**। অতএব **জ** স্থানে সূর্যের উন্নতি ∠**ঙজস**। সেক্সট্যাণ্ট-যন্ত্রযোগে দেখা গেল উহার পরিমাণ ৫০°। **কজ**কে **চ** অবধি বর্ধিত কর। অতএব **জ** স্থানে **খ**-মধ্য হইল **চ**। ∠**ঙজচ**=৯০°।

সুতরাং **চজস'**=৯০°−∠**স'জঙ** জ স্থানের অক্ষাংশ=∠**জকগ**

=∠**জকখ**+∠**খকগ**=∠**চজস'**+∠**খকগ**=৯০°−∠**সজঙ**+∠**খকগ**

=৯০°−৫০°+২০°=৬০°।

দ্রাঘিমা নির্ণয়—পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় মেরুরেখার চারিদিকে একপাক ঘোরে। কৌণিক হিসাবে একপাক ভাবিলে ৩৬০° ঘোরা হয়। অতএব প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবী ৩৬০°÷২৪=১৫° ঘোরে এবং ১° ঘুরিতে পৃথিবীর ৬০ মি.÷১৫°=৪ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং

১° দেশান্তর ব্যবধানের জন্য সময়ের পার্থক্য হইবে ৪ মিনিট
৩০′ " " " " " " ২ "
১৫′ " " " " " " ১ "
১′ " " " " " " ৪ সেকেণ্ড

পৃথিবীর যে স্থানে যখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকিয়া কিরণ দেয় তখন সেই স্থানে দিবা দ্বিপ্রহর বা মধ্যাহ্ন অর্থাৎ বেলা ১২টা হয়। সুতরাং এই স্থানের উপর দিয়া যে দ্রাঘিমা রেখা গিয়াছে উহার উপরিস্থিত প্রত্যেক স্থানেও তখন বেলা ১২টা হইবে। এই ভাবে যে সময় পাওয়া যায় উহা সেই স্থানের স্থানীয় সময়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে ঘোরে। অতএব ভূ-পৃষ্ঠে যে স্থান যত পূর্বে অবস্থিত সেখানে তত আগে সূর্যোদয় হয়। অতএব যখন যে স্থানে বেলা ১২টা তাহার ১° পশ্চিমের স্থানে ৪ মিনিট পরে ও ১৫° পশ্চিমের স্থানে ১ ঘণ্টা পরে বেলা ১২টা হইবে। আবার ১° পূর্বের স্থানে ৪ মিনিট আগে ও ১৫° পূর্বের স্থানে ১ ঘণ্টা আগে বেলা ১২টা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন এখানে বেলা ১২টা, ১° পশ্চিমের স্থানে তখন ১১টা ৫৬ মিনিট এবং ১৫° পশ্চিমের স্থানে বেলা ১১টা. আবার ১° পূর্বের স্থানে বেলা ১২টা ৪ মিনিট এবং ১৫° পূর্বের স্থানে বেলা ১টা।

গ্রীনিচের দেশান্তর ০°। কোন স্থানের সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা বেশী হইলে উহা গ্রীনিচের পূর্বদিকে অর্থাৎ পূর্ব দেশান্তরে এবং কম হইলে ঐ স্থান গ্রীনিচের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দেশান্তরে অবস্থিত এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহার পর সময়ের পার্থক্য হইতে সহজেই দেশান্তরের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। সেক্সট্যাণ্ট-যন্ত্রযোগে অথবা সূর্যের ক্ষুদ্রতম ছায়া দেখিয়া যে কোন স্থানে কখন ঠিক মধ্যাহ্ন (বেলা ১২টা) হইতেছে বুঝিতে পারা যায়। তখন গ্রীনিচের সময়ের সহিত (ক্রনোমিটার একপ্রকার ঘড়ি, ইহা সব সময় গ্রীনিচের

সময় নির্দেশ করে) পার্থক্য হিসাব করিলে সহজেই দেশান্তর নির্ণয় করা যায়।

সমুদ্রে জাহাজ অথবা আকাশে উড়োজাহাজ চলিবার সময়ে উহার নির্ভুল অবস্থিতি জানিবার দরকার হয়। তখন পূর্বোক্ত উপায়ে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা নির্ণীত হইয়া থাকে।

দ্রাঘিমা ও মসয়

(ক) সময়-পার্থক্য হইতে দ্রাঘিমা নির্ণয়

(1) It is 6-6 A. M.* at Greenwich when it is noon at Calcutta. Find out the longitude of Calcutta.

কলিকাতার সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রগামী, অতএব কলিকাতা গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত, অর্থাৎ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য (১২ ঘঃ—৬ ঘ. ৬ মি.)=৫ ঘঃ ৪৫ মি:=৩৫৪ মিনিট। তোমরা জান, প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যের জন্য ১° দ্রাঘিমার পার্থক্য হয়। সুতরাং দ্রাঘিমার পার্থক্য=(৩৫৪ ÷ ৪) ডিগ্রি=৮৮$\frac{১}{২}$° ডিগ্রি=৮৮° ৩০′। সুতরাং কলিকাতার দ্রাঘিমা ৮৮°৩০′ পূ.।

(2) It is 8 A. M. at a given place when it is midnight at Greenwich. What is the longitude of the place? (C. U. 1912)

উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৮ ঘ.। সুতরাং দ্রাঘিমার পার্থক্য ১৫×৮ ডিগ্রি=১২০°। স্থানটির সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রগামী, অতএব উহা গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত। অতএব স্থানটির দ্রাঘিমা ১২০° পূঃ।

(3) The difference between the local time of two places is 54 m. 20 sec. The longitude of one of them is 83° 27′ E. What is the longitude of the other? (C. U. 1916)

সময়ের পার্থক্য ৫৪ মি. ২০ সে.=$\frac{১৬৩}{৩}$ মি. সুতরাং দ্রাঘিমার পার্থক্য =($\frac{১৬৩}{৩}$ ÷ ৪) ডিগ্রি=$\frac{১৬৩}{১২}$ ডিগ্রি=১৩$\frac{৭}{১২}$ ডিগ্রি=১৩° ৩৫′। প্রশ্নে শুধু

* রাত্রি ১২টার পর হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত বুঝাইতে A. M. (Ante Meridiem) এবং বেলা ১২টার পর হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বুঝাইতে P. M. (Post Meridiem) ব্যবহৃত হয়।

সময়ের পার্থক্য দেওয়া হইয়াছে, সময় অগ্রগামী কি পশ্চাদ্‌গামী তাহা দেওয়া নাই। যদি সময় অগ্রগামী হয়, তবে স্থানটির দ্রাঘিমা (৮৮° ২৭′ + ১৩° ৩৫′) পূ. = ১০২° ২′ পূ. ; যদি সময় পশ্চাদ্‌গামী হয় তবে স্থানটির দ্রাঘিমা (৮৮° ২৭′ − ১৩° ৩৫′) পূ. = ৭৪° ৫২′ পূ.। অতএব নির্ণেয় দ্রাঘিমা ৭৪° ৫২′ পূ. অথবা ১০২° ২′ পূ.।

(4) It is 6 P. M. at a given place when it is midnight at Greenwich. What is the longitude of the place ?

সময়ের পার্থক্য ৬ ঘণ্টা, অতএব দ্রাঘিমার ব্যবধান = (৬ × ১৫) = ৯০°। স্থানটির সময় গ্রীনিচের সময়ের পশ্চাদ্বর্তী, অতএব ইহা গ্রীনিচের পশ্চিমে অবস্থিত। অতএব স্থানটির দ্রাঘিমা ৯০° প.।

(5) It is 10-34 A. M. at Karachi when it is noon at Calcutta. Longitude of Calcutta is 88°30′ E. What is that of Karachi ?

সময়ের পার্থক্য = (১২ ঘ. − ১০ ঘ. ৩৪ মি.) = ১ ঘ. ২৬ মি. = ৮৬ মি.। সুতরাং দ্রাঘিমার পার্থক্য $\frac{৮৬}{৪}$ ডিগ্রি = ২১$\frac{১}{২}$ = ২১° ৩০′। করাচীর সময় পশ্চাদ্বর্তী, অতএব ইহা কলিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং করাচীর দ্রাঘিমা (৮৮° ৩০′ − ২১° ৩০′) পূ. = ৬৭° পূ.।

(6) When it is 6 P. M. at Madras (80° 15′ E) it is 8-15 P. M. (of the previous day) at New York. What is the longitude of New York ?

সময়ের পার্থক্য = ১০ ঘ. ১৫ মি. [রাত্রি ৮টা ১৫ মি. হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ৩ ঘ. ৪৫ মি. এবং রাত্রি ১২টা হইতে সকাল ৬$\frac{১}{২}$টা পর্যন্ত ৬ ঘ. ৩০ মি., অতএব সময়ের পার্থক্য = (৩ ঘ. ৪৫ মি. + ৬ ঘ. ৩০ মি.) = ১০ ঘ. ১৫ মি.] সুতরাং দ্রাঘিমার ব্যবধান (১০ × ১৫) ডিগ্রি + $\frac{১৫}{৪}$ ডিগ্রি = ১৫০° + ৩° ৪৫′ = ১৫৩° ৪৫′। নিউ ইয়র্কের সময় মাদ্রাজের সময় অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্তী, অতএব নিউইয়র্ক মাদ্রাজের পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং নিউ ইয়র্কের দ্রাঘিমা (১৫৩° ৪৫′ − ৮০° ১৫′) পঃ = ৭৩° ৩০′ পঃ।

(খ) দ্রাঘিমার ব্যবধান হইতে সময়ের পার্থক্য নির্ণয়

দুইটি স্থান যদি গ্রীনিচের একই দিকে হয় তবে উভয় স্থানের দ্রাঘিমার বিয়োগফল উহাদের দ্রাঘিমার ব্যবধান হইবে। স্থানদ্বয় গ্রীনিচের বিপরীত দিকে অবস্থিত হইলে উভয় স্থানের দ্রাঘিমা যোগ করিয়া উহাদের দ্রাঘিমার ব্যবধান বাহির করিতে হইবে।

(7) The longitude of two places are 70° E. and 50° E. What is the difference between their local times ?

স্থান দুইটি গ্রীনিচের একই দিকে অবস্থিত, অতএব উহাদের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (৭০°—৫০°)—২০°; সুতরাং সময়ের পার্থক্য = (২০ × ৪) মি. = ৮০ মি. = ১ ঘ. ২০ মি.।

(8) The longitude of two places are 40° W. and 50° E. What is the difference between their local times ?

স্থান দুইটি গ্রীনিচের বিপরীত দিকে অবস্থিত, অতএব উহাদের দ্রাঘিমার ব্যবধান (৩০° + ৫০°) = ৮০°, সুতরাং সময়ের পার্থক্য = (৮০ × ৪) মিঃ = ৩২০ মি. = ৫ ঘ. ২০ মি.।

(গ) সময় ও দ্রাঘিমা-বিষয়ক বিবিধ প্রশ্নাবলী

(9) The longitndes of Calcutta and Madras are 83° 27′ E. and 80° 15′ E. respectively. What is the time at Madras when it is noon at Calcutta ?

কলিকাতা ও মাদ্রাজের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (৮৮° ২৭′ – ৮০° ১৫′) = ৮° ১২′, অতএব সময়-পার্থক্য ৮ × ৪ মিঃ + ১২ × ৪ সেকেণ্ড = ৩২ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড। মাদ্রাজ কলিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত, সুতরাং মাদ্রাজের সময় কলিকাতার সময়ের পশ্চাদ্বর্তী, অতএব কলিকাতায় যখন মধ্যাহ্ন ১২টা মাদ্রাজে তখন (১২ ঘঃ – ৩২ মিঃ ৪৮ সেঃ) = ১১ টা ২৭ মিঃ ১২ সেঃ পূর্বাহ্ন।

(10) Find out the time at Greenwich when it is 1 P. M. and 4-30 P. M. at Calcutta (88° 30′ E.).

উভয় স্থানের সময়ের পার্থক্য ৮৮½ × ৪ মিঃ = ৫ ঘঃ ৫৪ মিঃ। গ্রীনিচের

সময় কলিকাতার সময়ের পশ্চাদ্বর্তী, সুতরাং কলিকাতায় যখন বেলা ১টা তখন গ্রীনিচের সময় ১টা (১৩ ঘ.)—৫ ঘ. ৫৪ মি.=সকাল ৭টা ৬ মি.।

কলিকাতায় যখন বিকাল ৪টা ৩০ মি. তখন গ্রীনিচের সময় ৪টা ৩০ মি. (অর্থাৎ ১৬ ঘ. ৩০ মি.)—৫ ঘ. ৫৪ মি.=সকাল ১০টা ৩৬ মি.।

(11) When it is 6 P.M. at Dacca (90° 25′ E.) what will be the time at Karachi (67° E.) ? [D. B. 1949]

ঢাকা ও করাচীর দেশান্তরের ব্যবধান=(৯০° ২৫′—৬৭°)=২৩° ২৫′, সুতরাং সময়ের পার্থক্য ২৩×৪ মি.+২৫×৪ সে.=৯২. মি.×১ মি. ৪০ সে. =৯৩ মি. ৪০ সে.=১ ঘঃ ৩৩ মি. ৪০ সে.। করাচী ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত, অতএব করাচীর সময় পশ্চাদ্বর্তী, সুতরাং করাচীর সময়=৬ ঘ.—১ ঘ. ৩৩ মি. ৪০ সে.=অপরাহ্ণ ৪ টা ২৬ মি. ৩০ সে.।

(12) Greenwich is 88° 30′ west of Calcutta. Find out the local time at Greenwich when it is noon at Calcutta.

কলিকাতা ও গ্রীনিচের দেশান্তর ব্যবধান ৮৮½° সুতরাং সময়ের পার্থক্য ৮৮½×৪ মি.=৩৫৪ মি.=৫ ঘ. ৫৪ মি.। গ্রীনিচ কলিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত, সুতরাং গ্রীনিচের সময় কম হইবে। কলিকাতায় ১২টা বাজিলে গ্রীনিচের সময় হইবে ১২ ঘ.—৫ ঘ. ৫৪ মি.=৬ ঘ. ৬ মি., অর্থাৎ সকাল ৬টা ৬ মিঃ।

(13) A telegram is despatched at Greenwich at 1 P. M.. What will be the time when it is received at Madras (80° 15′ E.) supposing it took 15 minutes in transmission ?

গ্রীনিচ ও মাদ্রাজের দেশান্তর ব্যবধান ৮০° ১৫′, সুতরাং সময়ের পার্থক্য= ৮০×৪ মি.+১৫×৪ সে.=৩২০ মি.+১ মি.=৩২১ মি.=৫ ঘ. ২১ মি.। মাদ্রাজ গ্রীনিচের পূর্বে, সুতরাং মাদ্রাজের সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী। সুতরাং গ্রীনিচে যখন ১টা তখন মাদ্রাজের সময় ১+৫ ঘ. ২১ মি.=অপরাহ্ণ ৬টা ২১ মি.। টেলিগ্রাম যাইতে ১৫ মি. সময় লাগে। সুতরাং টেলিগ্রাম মাদ্রাজে ৬টা ২১ মি.+১৫ মি. অর্থাৎ অপরাহ্ণ ৬টা ৩৬ মি. এর সময় পৌছিবে।

(14) If the time in Calcutta is 3 P. M. in the afternoon, what will be the time at a place 20° east of Calcutta? Also what will be the time at a place 20° north of Calcutta?

১ম ক্ষেত্র : দেশান্তর ব্যবধান ২০°, সুতরাং সময়ের পার্থক্য ২০ × ৪ মি. = ৮০ মি. = ১ ঘ. ২০ মি.। স্থানটি কলিকাতার পূর্বে অবস্থিত, সুতরাং উহার সময় কলিকাতার সময়ের অগ্রবর্তী। অতএব কলিকাতার সময় যখন বিকাল ৩টা তখন ঐ স্থানে বিকাল (৩ + ১ ঘ. ২০ মি.) = ৪টা ২০ মি.।

২য় ক্ষেত্র : স্থানটি কলিকাতার ২০° উত্তরে (পূর্বে বা পশ্চিমে নহে) বলিয়া ঐ স্থান ও কলিকাতা একই মধ্যরেখায় অবস্থিত। অতএব কলিকাতার সময়ের সহিত ঐ স্থানের সময়ের কোনই পার্থক্য হইবে না। সুতরাং কলিকাতায় যখন বিকাল ৩টা ঐ স্থানেও তখন বিকাল ৩টা।

(15) What would be the local time and day in Karachi (67° E.) and Shillong (92° E.) corresponding to Greenwich meantime 6 P. M. Monday?

করাচী ও গ্রীনিচের দেশান্তর ব্যবধান ৬৭°, সুতরাং সময়ের পার্থক্য ৬৭ × ৪ মি. = ৪ ঘ. ২৮ মি.। করাচী গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত, সুতরাং উহার সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী। অতএব করাচীর সময় ৬টা + ৪ ঘ. ২৮ মি. = ১০টা ২৮ মি., অর্থাৎ সোমবার রাত্রি ১০টা ২৮ মি.।

শিলং ও করাচীর দেশান্তর ব্যবধান ৯২°, সুতরাং সময়ের পার্থক্য ৯২ × ৪ মি. = ৬ ঘ. ৮ মি.। শিলং গ্রীনিচের পূর্বে সুতরাং শিলং-এর সময় অগ্রবর্তী, সুতরাং শিলং-এর সময় ৬টা + ৬ঘ. ৮ মি. = রাত্রি ১২টা ৮ মি.। রাত্রি ১২টায় তারিখ বদলাইয়া যায়, অতএব (ইংরাজী হিসাবে) বলিতে হইবে মঙ্গলবার রাত্রি ১২টা ৮ মি.।

(16) Cricket test matches are played in England and Australia. The play begins at about 10 A. M. and is over in the afternoon at 5 or 6 P. M. in both the countries. In Calcutta it is always possible to get the news of the day's play

in the evening on the same day when the matches are played in Australia but not so when they are played in the England. Explain why? (*C. U. 1938*)

• ক্যানবেরার (অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী) দেশান্তর ১৪৯°, ১৮′ পূ., এবং লণ্ডনের (ইংলণ্ডের রাজধানী) দেশান্তর ৫′ প., কলিকাতার দেশান্তর ৮৮° ৩০′ পূ.। সুতরাং ক্যানবেরা ও কলিকাতার দেশান্তর ব্যবধান (১৪৯° ১৮′ −৮৮° ৩০′)=৬০° ৪৮′; সুতরাং সময়ের পার্থক্য=৬০×৪ মি.+৪৮×৪ সে. =৪ ঘ. ৩ মি. ১২ সে.। ক্যানবেরা কলিকাতার পূর্বে, সুতরাং ক্যানবেরার সময় কলিকাতার সময়ের অগ্রগামী। সুতরাং ক্যানবেরায় বৈকাল ৫টায় যখন খেলা শেষ হইল তখন কলিকাতার সময় বেলা ১২টা ৫৬ মি. ৪৮ সে., সুতরাং ঐ দিনই বৈকালের কাগজে এই খবর প্রকাশিত হইয়া যায়।

অপরপক্ষে, লণ্ডন ও কলিকাতার সময়ের পার্থক্য ৮৮×৪ মি.+৩৫×৪ সে.=৫ ঘ. ৫৪ মি. ২০ সে.। আবার কলিকাতা লণ্ডনের পূর্বে, তাই কলিকাতার সময় অগ্রগামী। সুতরাং লণ্ডনে যখন বিকাল ৫টায় খেলা শেষ হয় তখন কলিকাতার সময় রাত্রি ১০টা ৫৪ মি. ২০ সে.। সুতরাং সেই খেলার খবর সেই দিনই বাহির করা সম্ভব নয়।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

আকাশে সূর্যের অবস্থান অনুসারে যে সময় ঠিক করা যায় তাহাকে স্থানীয় সময় (Local time) বলে। সূর্য যখন কোন স্থানের মধ্যরেখায় (অর্থাৎ আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে) আসে তখন সেখানে (স্থানীয় সময়ের) মধ্যাহ্ন হয়, অর্থাৎ ঘড়িতে ১২টা বাজে। এইভাবে যে সময় পাওয়া যায় ইহাই স্থানীয় সময়।

বিভিন্ন মধ্যরেখায় অবস্থিত স্থানের স্থানীয় সময় সম্পূর্ণ পৃথক। কলিকাতায় যখন মধ্যাহ্ন পুনায় তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সাধারণের পক্ষে ইহাতে সময় নির্দেশের গোলযোগ ঘটে এবং কাজের অসুবিধা হয়। এই জন্য কোন একটা স্থানের স্থানীয় সময়কে সমগ্র দেশের নির্দিষ্ট সময় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইহাকে ঐ দেশের প্রমাণ সময় (standard time)

বলে। বর্তমানে এলাহাবাদের স্থানীয় সময় ভারতের প্রমাণ সময় রূপে গণ্য হইতেছে।

আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা

পূর্ব দেশান্তরের সময় গ্রীনিচের সময়ের অগ্রবর্তী এবং পশ্চিম দেশান্তরের সময় গ্রীনিচের সময়ের পশ্চাদ্বর্তী। অতএব গ্রীনিচে যখন বুধবার বেলা ৯টা
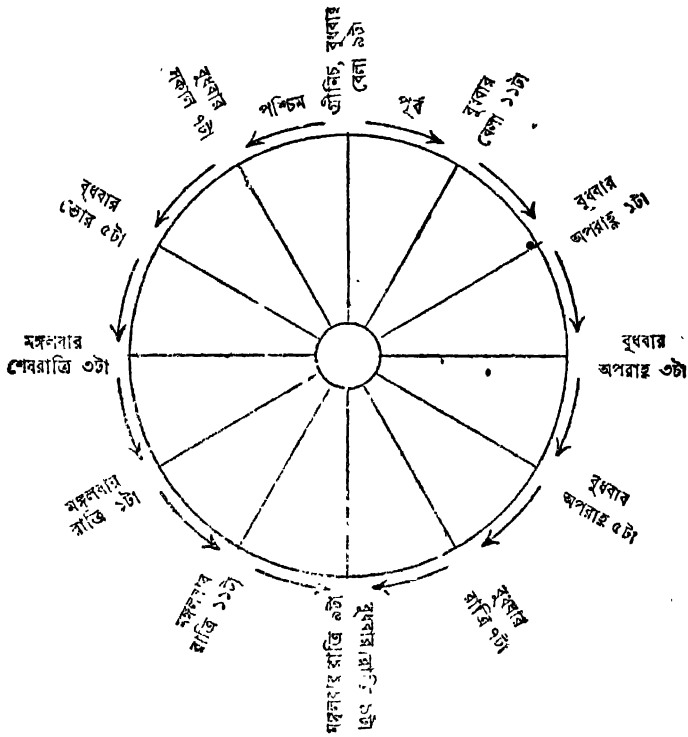
২৫নং চিত্র

তখন ৩০° পূ. দেশান্তরে বুধবার বেলা ১১টা। এই ক্রমানুসারে ১৮০° পূ. দেশান্তরে স্থানীয় সময় দেখা যাইবে বুধবার রাত্রি ৯টা। আবার ৩০° প. দেশান্তরে তখন বুধবার বেলা ৭টা এবং এই ক্রমানুসারে ১৮০° প. দেশান্তরে তখন মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা।

মনে কর, মূল মধ্যরেখায় অবস্থিত কোন স্থান হইতে দুইখানা জাহাজ একই সময়ে রওনা হইল। একটি পূর্বদিকে এবং আর-একটি পশ্চিমদিকে সমগতিতে চলিতেছে। ১৮০° পূ. ও ১৮০° প. দেশান্তরে মধ্যরেখা একই; কিন্তু পূর্বমুখী জাহাজ এখানে আসিয়া তারিখের হিসাব করিবে বুধবার আর পশ্চিমমুখী
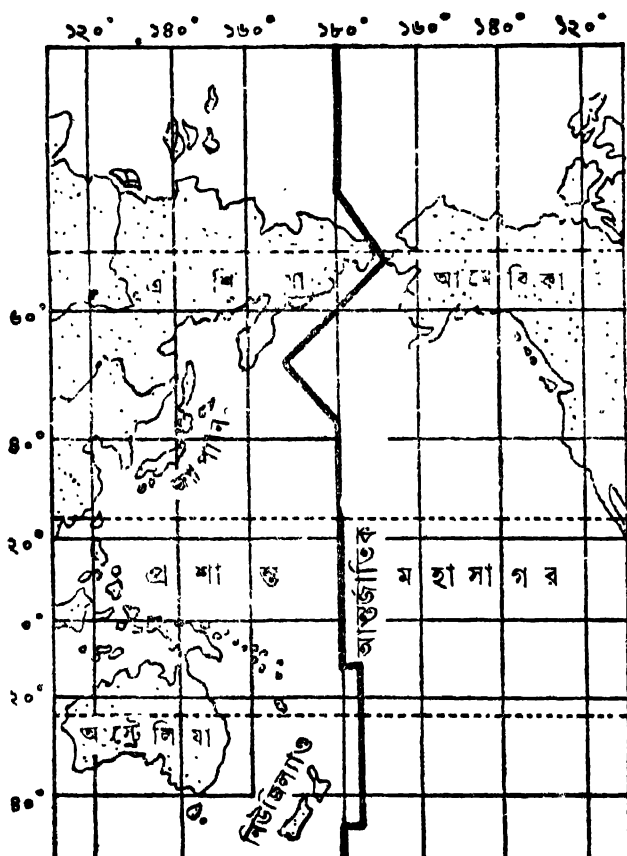
২৬নং চিত্র—আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা

জাহাজ আসিয়া তারিখ পাইবে মঙ্গলবার। পূর্বমুখী জাহাজ ঐ বুধবার ১৮০° অতিক্রম করিয়াই দেখিতে পাইবে বুধবার হইতে সে মঙ্গলবারে আসিয়া

গিয়াছে। পশ্চিমমুখী জাহাজ ঐ মঙ্গলবার ১৮০° অতিক্রম করিয়াই দেখিতে পাইবে মুহূর্তমধ্যে সে বুধবারে আসিয়া গিয়াছে।

এই গোলযোগ দূর করিবার জন্য সর্বসম্মতিতে স্থির হইয়াছে যে, ১৮০° মধ্যরেখা অতিক্রম করিয়াই পূর্বমুখী জাহাজ একদিন কমাইয়া এবং পশ্চিমমুখী জাহাজ একদিন বাড়াইয়া হিসাব করিবে।

১৮০° মধ্যরেখা এশিয়ার উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণে কোথাও কোথাও স্থলভাগের উপর দিয়া গিয়াছে। স্থলভাগে ১৮০° মধ্যরেখার দুই পাশে যদি দুইটা বার হয়, তবে অসুবিধার অন্ত থাকে না। সেজন্য তারিখ পরিবর্তনের রেখা সর্বত্র ১৮০° মধ্যরেখার সঙ্গে মিলিত নয়। কোন কোন স্থানে পূর্বে বা পশ্চিমে সামান্য সরিয়া গিয়াছে। ১৮০° মধ্যরেখার উপরিস্থিত এবং কোন কোন স্থলে নিকটবর্তী যে রেখা অতিক্রম করিবার সময় তারিখ বদলাইবার বিধি আছে তাহাকে **আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা** (International Date Line) বলে।

প্রশ্নাবলী

১। অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমা ও দেশান্তর-রেখার পার্থক্য কি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দাও।

২। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার প্রয়োজনীয়তা কি? দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে কি ভাবে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায় লিখ।

৩। উত্তর গোলার্ধে যে-কোন স্থানের অক্ষাংশ সেই স্থানের ধ্রুবতারার উন্নতির সমান তাহা জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ কর।

৪। সূর্যের উন্নতি হইতে কিভাবে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায় তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৫। সংজ্ঞা লিখ:—অক্ষাংশ, আদি দ্রাঘিমা, আন্তর্জাতিক তারিখ-রেখা, বিষুবরেখা বিষুবলম্ব।

৬। স্থানীয় সময় কাহাকে বলে? প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কি বুঝাইয়া বল।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূ-ত্বক ও শিলা

পৃথিবীর গঠন—আদি অবস্থায় পৃথিবী একটি উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল। ক্রমশ উহা শীতল হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। লোহা, নিকেল, প্রভৃতি ভারী পদার্থগুলি ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে এবং লঘু পদার্থগুলি উপরের দিকে ভাসিয়া আছে। তারপর উপরের তরল পদার্থ জমিয়া কঠিন আবরণের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই **ভূ-ত্বক** (earth's crust)।
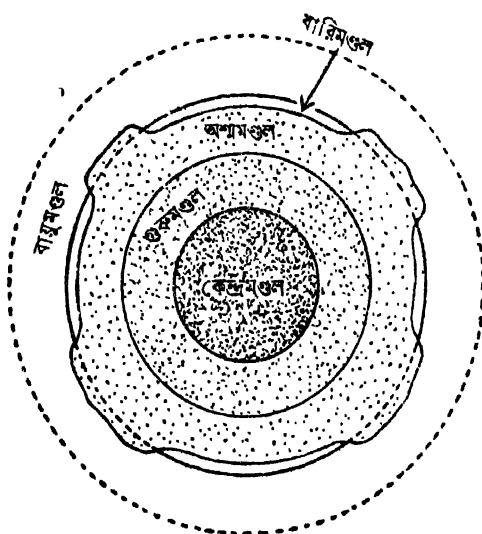
২৭নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর

লৌহ, নিকেল প্রভৃতি ভারী ধাতু ভূ-কেন্দ্রের নিকটতম অঞ্চলে জমিয়া **কেন্দ্রমণ্ডল** (centrosphere) গঠন করিয়াছে। এই মণ্ডল ভূ-কেন্দ্র হইতে প্রায় ২,০০০ মাইল অবধি বিস্তৃত। সিলিকা-ম্যাগনেসিয়াম (Sima)-মিশ্রিত গুরুভার শিলা কেন্দ্রমণ্ডলের চারিদিকে জমিয়া **গুরুমণ্ডলের** (Barysphere) সৃষ্টি করিয়াছে। এই স্তরের গভীরতা প্রায় ১,৭৬০ মাইল। ভূ-ত্বক ও তাহার

নিম্নভাগ সিলিকা-এলুমিনিয়ম (sial) মিশানো লঘুশিলা-দ্বারা গঠিত। ইহা **অশ্মমণ্ডল** (lithosphere) নামে অভিহিত। ইহার গভীরতা প্রায় ৪০ মাইল। ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত জলরাশিকে **বারিমণ্ডল** (hydrosphere) এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে গ্যাসীয় আবরণকে **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere) বলে। বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, ইহা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বারিমণ্ডলের গভীরতা স্থানবিশেষে বিভিন্ন এবং বায়ুমণ্ডলের মত উহা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র ব্যাপ্তও নহে।

ভূ-পৃষ্ঠের শতকরা ৭০·৮ ভাগ জল এবং শতকরা ২৯·২ ভাগ স্থল।

শিলা (Rock)—শিলা দিয়া ভূ-ত্বক গঠিত। এই শিলা বলিতে আমরা বালি, কাঁকর, পাথর ইত্যাদি সব কিছুকেই বুঝি। শিলা প্রধানত **তিন** রকমের :—

(১) **প্রাথমিক বা আগ্নেয় শিলা**—উত্তপ্ত পৃথিবী শীতল হইবার সময়ে সর্বপ্রথম এই শিলা গঠিত হয়। তাই ইহার নাম **প্রাথমিক শিলা** (primary rock)। উত্তপ্ত পদার্থ হইতে জন্ম বলিয়া ইহাকে **আগ্নেয় শিলাও** (igneous rock) বলা হয়। গ্র্যানাইট (granite), ব্যাসল্ট (basalt), ডলেরাইট (dolerite) প্রভৃতি এই জাতীয় শিলা।

(২) **পাললিক বা স্তরীভূত শিলা**—রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস ইত্যাদিতে আগ্নেয় শিলার ক্ষয় হয়। ক্ষয়জাত কণাগুলি জলস্রোতে বা বাতাসে বাহিত হইয়া সাগর বা হ্রদের তলায় স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। কালক্রমে ভূ-গর্ভের উত্তাপে, জলের ও উপরিস্থিত স্তরের চাপে এবং অন্যান্য কারণে উহা জমাট বাঁধিয়া কঠিন পাথরে পরিণত হয়। পলিসঞ্চয়ে সৃষ্ট হয় বলিয়া ইহার নাম **পাললিক শিলা** (sedimentary rock)। স্তরে স্তরে গঠিত বলিয়া ইহাকে **স্তরীভূত শিলাও** (stratified rock) বলা হয়। চুনা পাথর, বেলে পাথর, কাদা পাথর (shale) প্রভৃতি পাললিক শিলা। জলের নীচে এই প্রকার শিলার সৃষ্টি হয়, তাই ইহার স্তরের মধ্যে জীবাশ্ম (প্রস্তরীভূত জীবদেহ—fossil) দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) **রূপান্তরিত শিলা**—উত্তাপ, চাপ, অথবা নানা রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে পাললিক ও আগ্নেয় শিলা কখন কখন কঠিনতর ও কেলাসিত (crystallised) হয়। এইভাবে পূর্বরূপ পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহাকে **রূপান্তরিত শিলা** (metamorphic rock) বলে। চুনা পাথর হইতে উৎপন্ন মার্বেল পাথর, কাদা পাথর হইতে শ্লেট, বেলে পাথর হইতে কোয়ার্জাইট ইহার দৃষ্টান্ত।

মাটি (Soil)—শিলা হইতে মাটির উৎপত্তি। সূর্যতাপ, বায়ু, জলপ্রবাহ প্রভৃতির প্রভাবে শিলা বিচূর্ণিত ও ক্ষয়িত হয়। বাতাসের অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস এই ক্ষয়কার্যে সাহায্য করে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতির গলিত দেহের সহিত বিচূর্ণিত শিলাকণার রাসায়নিক সংমিশ্রণে একপ্রকার সূক্ষ্ম, শিথিল পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাই মাটি।

প্রশ্নাবলী

১। পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। শিলা কয় প্রকার এবং কি কি? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার শিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। সংজ্ঞা লিখ—ভূ-ত্বক, বারিমণ্ডল, কেন্দ্রমণ্ডল, স্তরীভূত শিলা, মাটি।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূ-ত্বকের পরিবর্তন

আবহবিকার, ক্ষয় ও অবক্ষেপণ

বায়ু, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। এই পরিবর্তন এতই ধীর যে উহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না। এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় শিলা যে শুধু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, শিলার ক্ষয়িত অংশগুলি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় অন্যত্র অপসারিত হয় এবং ইহার ফলে নীচের শিলা নগ্ন ও উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক শক্তি তখন সহজেই উহার ক্ষয়সাধন করিতে পারে। এইভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তনকে **নগ্নীভবন** (denudation) বলে। এই পরিবর্তন তিন প্রকারে হইয়া থাকে। যথা :—

(১) **আবহবিকার** (Weathering)—আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাকে **আবহবিকার** বলে। কোন কোন স্থান দিনের বেলা অধিক উত্তপ্ত হয় এবং রাত্রিকালে শীতল হইয়া যায়। এই সকল স্থানে অনবরত প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে শিলাখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে শিলার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। এই ভাবের ক্ষয়কে **সাধারণ আবহবিকার** (mechanical weathering) বলে। উষ্ণমণ্ডলের মরুভূমি অঞ্চলে এই কারণেই শিলা চূর্ণিত হইয়া বালির সৃষ্টি করিয়াছে। বায়ুতে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প আছে। ইহারা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া শিলার ক্ষয়সাধন করে। ইহাকে **রাসায়নিক আবহবিকার** (chemical weathering) বলা হয়।

(২) **ক্ষয়** (Erosion)—বায়ু, বৃষ্টি, জলস্রোত, নদী প্রভৃতি অবিরত ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন করিতেছে। নদী এবং বৃষ্টির জলে অনেক সময় শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া বায়ু, নদী, হিমবাহ ইত্যাদি দ্বারা

বাহিত বালুকণা, পাথরকুচি ও শিলাখণ্ডের ক্রমাগত আঘাত ও ঘর্ষণে শিলার ক্ষয় হয়। এইরূপ পরিবর্তনকে **ক্ষয়** বলে। যে প্রকার ক্ষয়কার্যে শিলার কোন রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় না তাহাকে **সাধারণ ক্ষয়** (mechanical erosion) বলে। যে ক্ষয়ক্রিয়ায় শিলার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহাকে রাসায়নিক ক্ষয় (chemical erosion) বলা হয়।

(৩) **অবক্ষেপণ** (Deposition)—ক্ষয়িত পদার্থগুলি বায়ু, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়। ইহাকে অবক্ষেপণ বলে।

এইভাবে আবহবিকার, ক্ষয় ও অবক্ষেপণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই এই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি কি ভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রাকৃতিক শক্তির কার্য

সূর্যতাপের কার্য—দিনে সূর্যতাপে শিলা প্রসারিত হয়, রাত্রিকালে শৈত্যে শিলা সঙ্কুচিত হয়। শিলাস্তরে বিভিন্ন আকরিক উপাদান থাকে। তাহাদের তাপসঞ্চয় ও তাপ বিকিরণের শক্তি একরূপ নহে। এইরূপ দিনের পর দিন অসম সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে শিলা ফাটিয়া ক্রমশ বালুকায় পরিণত হয়। মরুভূমিতে তাপ ও শৈত্যের প্রভেদ অত্যন্ত বেশী; শিলা সেখানে তাড়াতাড়ি এবং অধিক পরিমাণে ফাটে। সেইজন্য মরুভূমিতে বালুকার এত আধিক্য।

বায়ুর কার্য—বায়ুতে অম্লজান (oxygen) ও অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide) গ্যাস আছে। উহার সহিত রাসায়নিক সংযোজনে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বায়ুপ্রবাহে ক্ষয়িত শিলাকণা উড়িয়া ভূ-ত্বক নগ্নীভূত করে। বায়ুস্থিত বালুকণার ঘর্ষণেও শিলা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বায়ুতাড়িত শিলাকণারাশি সঞ্চিত হইয়া বালিয়াড়ি এবং স্থানবিশেষে মরুভূমিরও সৃষ্টি হয়। মরু-বালু উড়িয়া আসিয়া কোথাও বা মাটির অবস্থা পরিবর্তিত করে। গোবি মরুভূমি

হইতে সূক্ষ্ম বালুকণা উড়িয়া আসিয়া চীন দেশে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় ১৫০০ ফুট হইতে ২০০০ ফুট গভীর লোয়েস নামক মাটির সৃষ্টি করিয়াছে।

বৃষ্টির কার্য—বৃষ্টির জলের কতক অংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, কতক অংশ প্রবেশ্য শিলাস্তরের ভিতর দিয়া ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে; অবশিষ্ট অংশ ভূ-ত্বকের উপর দিয়া নদীনালার আকারে হ্রদ বা সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত জলে কোমল মাটি গলিয়া যায়; কঠিন শিলাস্তর শিথিল ও ক্ষয়িত হইতে থাকে। বৃষ্টির জলে বায়ুস্থিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস কিয়ৎ পরিমাণে মিশিয়া থাকে। নানাপ্রকার শিলা, বিশেষত চুনা পাথর, যখন ইহার সংস্পর্শে আসে তখন শিলা দ্রবীভূত হইয়া যায়। ইহাতে কখন কখন ভূ-গর্ভে বৃহৎ গহ্বরের সৃষ্টি হয়। পাহাড়পর্বতে অনেক স্থলে কোমল শিলার উপর কঠিন শিলা হেলানো অবস্থায় থাকে। বৃষ্টির জলে কোমল শিলা দ্রবীভূত বা শিথিল হইয়া গেলে উপরের ভারী শিলা ধ্বসিয়া পড়ে। ইহাকে **ভূ-পাত** বলে।

সমুদ্রের কার্য—সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে উপকূলভাগ অবিরত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রজলে লবণজাতীয় পদার্থ থাকে। উহার দ্রাবক শক্তি এবং রাসায়নিক ক্রিয়াতেও উপকূল ক্ষয়িত হয়। উপকূলে পাহাড় থাকিলে তরঙ্গাঘাতে উহার পাথরও জলে ভাঙিয়া পড়ে এবং ক্রমশ নুড়ি ও বালুকায় পরিণত হয়। উহার কতক অংশ স্রোতের বেগে উপকূলের ধারে ধারে গড়াইয়া চলে। কতক বা সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়। নদীর পলিও সমুদ্রে আসিয়া স্থিতিলাভ করে। কখনও ক্ষয়িত শিলা এবং বালুকণা স্রোত ও তরঙ্গের প্রবাহে উপকূলের নিকটে জমা হইয়া উপকূলভাগের আয়তন বৃদ্ধি করে। সমুদ্রস্রোতে এইভাবে ভূমির ক্ষয় হয় আবার গঠনও হয়।

উপকূলস্থ কঠিন শিলার দুই পাশে যদি নরম শিলা থাকে, নরম শিলা দ্রুত ক্ষয়িত হইয়া কঠিন শিলার দুই দিকে সমুদ্রজল প্রবেশ করে। এইরূপে **অন্তরীপের** (cape) সৃষ্টি হয়। দুই দিকে কঠিন শিলা, মাঝে নরম শিলা থাকিলে নরম শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে **উপসাগরের** (bay) উৎপত্তি হয়। উপকূলের কিয়দংশ প্রধান ভূ-ভাগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে বিচ্ছেদক জলভাগ **প্রণালী**

(strait) এবং বিচ্ছিন্ন স্থলভাগ **মহাদেশীয় দ্বীপ** (continental island) নামে অভিহিত হয়।

তুষারের কার্য—শিলার ফাটলে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হয়। শীতপ্রধান অঞ্চল হইলে ঐ জল জমিয়া বরফ হয় ও আয়তনে বাড়ে। তখন উহার চাপে শিলাস্তর বিচূর্ণিত হইয়া যায়। তুষারের ক্রিয়ায় শীতপ্রধান দেশে এবং উচ্চ পর্বতগাত্রে শিলা শিথিল ও খণ্ড খণ্ড হইয়া আপন ভারে পর্বতগাত্র হইতে খসিয়া পড়ে।

জীবের কার্য—গাছপালা শিকড় চালাইয়া ভূ-পৃষ্ঠে ফাটলের সৃষ্টি করে; বৃষ্টির জল ঐ পথে ভিতরে ঢুকে। গাছ শিকড় দিয়া মাটি হইতে খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে। কেঁচো, পিঁপড়া, প্রেইরি কুকুর প্রভৃতি প্রাণী মাটি খুঁড়িয়া ওলট-পালট করে; ইহার ফলে কিয়ৎ পরিমাণে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হয়।

নদী ও হিমবাহের কার্য—নদী এবং হিমবাহ ভূ-পৃষ্ঠের প্রভূত ক্ষয়সাধন করে। নদী এবং হিমবাহের কার্যের কথা তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে জানিতে পারিবে।

প্রশ্নাবলী

১। আবহবিকার, ক্ষয় ও অবক্ষেপণ বলিতে কি বুঝ সংক্ষেপে লিখ।

২। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি কিভাবে ভূ-ত্বকের ধীর পরিবর্তন সাধন করে তাহা উদাহরণসহ লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নদী ও হিমবাহের কার্য

নদীর কার্য—বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের জল, হ্রদের অতিরিক্ত জল, তুষার-গলিত জল ভূমির ঢাল অনুযায়ী নিম্নদিকে বহিয়া যায়। এই সকল স্রোতোধারা মিলিত হইয়া নদীর সৃষ্টি করে।

নদীর উৎপত্তিস্থানকে **উৎস** (source) এবং সাগর বা হ্রদের সহিত মিলনস্থানকে **মোহনা** (mouth) বলে। প্রশস্ত মোহনা **খাঁড়ি** (estuary) নামে অভিহিত হয়। দুই বা ততোধিক নদীর মিলন-স্থান **সঙ্গম** (confluence) এবং দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান দোয়াব (doab) নামে পরিচিত।

উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভাগে নদীর গভীরতা, বিস্তার ও ক্ষয়কার্য বিভিন্ন :—

(১) **ঊর্ধ্ব বা পার্বত্য প্রবাহ**—(Upper or Mountain course)—উৎস হইতে সমভূমিতে নামিয়া আসা পর্যন্ত নদীর এই ঊর্ধ্বপ্রবাহ। গঙ্গোত্রী
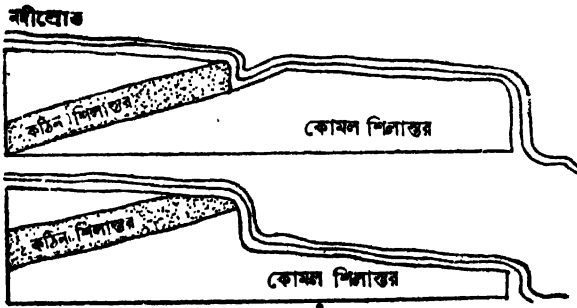
২৮নং চিত্র—জলপ্রপাত

হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা নদীর এই অবস্থা বলা যাইতে পারে। পার্বত্য প্রবাহে নদীর স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল থাকে। তখন নদী প্রচুর শিলা ক্ষয় করে ও শিলাখণ্ড ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। শিলাখণ্ডের ঘর্ষণে ও

নদীস্রোতের প্রবল বেগে নদীর তলদেশ অধিকতর ক্ষয় হইতে থাকে এবং নদী-খাত অত্যন্ত গভীর ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। নদীস্রোত কঠিন শিলাস্তর হইতে কোমল শিলাস্তরের উপর প্রবাহিত হইলে কোমল স্তরটি অধিক ক্ষয়িত হয়। দুই স্তরের সংযোগস্থলে নদীগর্ভ হঠাৎ ঢালু হইয়া যায়। নদীজল তখন প্রবলবেগে উপর হইতে নীচে পড়ে। ইহাকেই **জলপ্রপাত** (Waterfalls) বলে। পার্বত্য গতিতে নদীতে অনেক জলপ্রপাত থাকে। আবার নদী যখন কোন বৃষ্টিবিরল দেশে কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন নদীস্রোতে কেবল তলদেশই ক্ষয় পাইতে থাকে। বৃষ্টির অভাবে পার্শ্বদেশ মোটেই ক্ষয় হয় না। ক্রমশ নদীর দুই তীর খাড়াভাবে নামিয়া যায় এবং নদী **গিরিখাতের** (canyon) সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার কলোরোডো নদীর গিরিখাত গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন সুবিখ্যাত।

পার্বত্য প্রবাহে নদীর ক্ষয়কার্য অধিক। প্রবল নদীস্রোত এবং জলপ্রপাতের জন্য এই অংশ নৌচলাচলের উপযোগী নহে। নদীর এই অংশ মানুষের খুব কম কাজে লাগে। তবে জলপ্রপাতের শক্তি হইতে কখন কখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কলকারখানা চালানো হয়। আসামের শিলং-এ 'বিডন' নামক জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

(২) **মধ্য বা সমভূমি প্রবাহ** (Middle or Plain course)—পার্বত্য পথ শেষ করিয়া নদী এই অবস্থায় সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। হরিদ্বার হইতে রাজমহল পর্যন্ত গঙ্গা নদীর এই অবস্থা। এই সময় নদীবেগ তত প্রবল থাকে না; উহার ক্ষয়ক্রিয়া কমিয়া যায়। দুই কূলে ও খাতে পলি ও কাদা জমিয়া পলিভূমি (alluvial plain) গঠিত হয়। সূক্ষ্ম বালু ও মাটির কণা সমুদ্রাভিমুখে বাহিত হইতে থাকে। এই অংশে নদী সাধারণত নাব্য।

সমভূমি-প্রবাহে নদী তীরভূমি অধিক ক্ষয় করে,ইহার ফলে নদীর বিস্তার বাড়িয়া যায়। জমির ঢাল এবং পার্শ্বক্ষয়ের তারতম্যের জন্য এই অবস্থায় নদীর গতি বাঁকিয়া যায়। বাঁক ঘুরিবার সময় উহার যে কূল বাহিরের দিকে থাকে সেই স্থানে স্রোতের আঘাত বেশী পড়ে। তাই সেই অংশ ভাঙিতে থাকে। বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ কম; সেখানে তলানি জমিয়া

চর পড়ে ; এইরূপে বাঁক বড় হয়, দুই বাঁকের মধ্যবর্তী স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। এই সঙ্কীর্ণ স্থান ভেদ করিয়া অনেক সময় নদী নূতন সোজা পথ সৃষ্টি

২৯নং চিত্র—অশ্বখুরাকৃতি

করিয়া লয়। পুরাতন খাত তখন হ্রদে পরিণত হয়। এই হ্রদ ঘোড়ার খুরের মতো দেখায়, তাই উহাকে **অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ** (Ox-bow lake, Horse-shoe lake) বলা হয়।

(৩) **নিম্ন বাব-দ্বীপ প্রবাহ** (Lower or Deltaic course)—
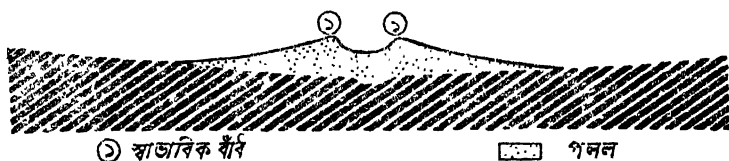
৩০নং চিত্র

মোহনার কাছাকাছি স্রোতোবেগ যখন খুব কমিয়া যায় তখন নদীর এই প্রবাহ। রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত গঙ্গানদীর এইরূপ অবস্থা। নদীবাহিত বালি ও কাদা-মাটি স্রোতোহীনতার জন্য জমিয়া নূতন ভূমি গঠন করে। ঐ ভূমি ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠে ; নদীস্রোত তখন উহার দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হয়। অতঃপর নদী অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এই নূতন ভূমি সাধারণত ত্রিকোণাকার, অর্থাৎ মাত্রাহীন 'ব'-অক্ষরের মতো দেখায় বলিয়া উহা **ব-দ্বীপ** (delta) নামে অভিহিত হয়। নদী যদি
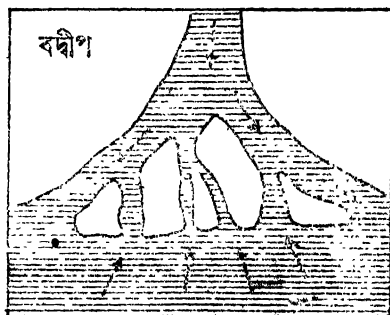
৩১ নং চিত্র

প্রবলবেগে সমুদ্রে পড়ে, অথবা মোহনায় সমুদ্রস্রোত যদি তীব্র হয় কিংবা নদীধারায় যদি পলির অপ্রাচুর্য থাকে, তাহা হইলে ব-দ্বীপ গঠিত হইতে পারে না। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ সুবিখ্যাত। উহার পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল।

এতএব দেখা যাইতেছে, ঊর্ধ্বপ্রবাহে নদী ভূ-পৃষ্ঠের কেবল ক্ষয়সাধন করে। মধ্যপ্রবাহে নদীর ক্ষয়সাধন কম, বহনই অধিক; এই অবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে অবক্ষেপণও সাধিত হয়। নিম্নপ্রবাহে নদীর প্রধানতম কার্য অবক্ষেপণ।

যে ভূ-ভাগের জল কোন নদী, উহার উপনদী ও শাখানদীতে প্রবাহিত হয়, ঐ ভূভাগকে মূল নদীর **অববাহিকা** বলে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ গঙ্গার অববাহিকা। দুই অববাহিকার মধ্যবর্তী উচ্চভূমিকে **জলবিভাজিকা** (water parting) বলে। আরাবল্লী পর্বতমালার উত্তরাংশ একটি জলবিভাজিকা। ইহার অবস্থিতির জন্য গঙ্গা ও সিন্ধুর জলধারা ভিন্নমুখে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে পড়িতেছে।

হিমবাহের কার্য—অতিরিক্ত শৈত্যের জন্য উঁচু পর্বতশিখরে এবং মেরুপ্রদেশে সারা বৎসর বরফ জমিয়া থাকে। উহা কখনও গলে না। যে সীমারেখার ঊর্ধ্বে বরফ গলে না নীচে আসিলেই গলিতে আরম্ভ করে তাহাকে **হিমরেখা** (snowline) বলে।

হিমরেখার অবস্থান অক্ষাংশ, বায়ুর গতি, তাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে তাপ ক্রমশ কমিয়া যায়। হিমরেখার উচ্চতাও তদনুপাতে কমে। হিমরেখার উচ্চতা নিরক্ষরেখার নিকট ১৮,০০০´; হিমালয় (৩০°—৩২° উ.) ১৬,০০০´ এবং আল্পসে ৪৬° উ.) ৯,০০০´। মেরু অঞ্চলে শৈত্যাধিক্যের জন্য উহা প্রায় সাগর-সমতলে থাকে।

হিমরেখার উপরে স্তরে স্তরে ক্রমাগত বরফ জমে। বরফের প্রবল চাপে নীচের বরফ পাথরের মত কঠিন হইয়া যায়। নীচের সেই সব বরফস্তূপ আপন ভারে, উপরের চাপে এবং পৃথিবীর আকর্ষণে ধীরে ধীরে পর্বতের গা বাহিয়া নামিতে থাকে। ইহাই **হিমবাহ** (glacier)। হিমবাহ নামিতে নামিতে হিমরেখা অতিক্রম করিলে বরফ গলিতে আরম্ভ করে। তখন উহা হইতে ঝরণা ও নদীর উৎপত্তি হয়। গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইতে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি।

হিমবাহ অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে। ইহার গতি ঘণ্টায় কয়েক ইঞ্চি মাত্র। তবে সব হিমবাহের গতি সমান নয়। এই গতি আবার শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক হয়। ঘর্ষণের জন্য উভয় পার্শ্ব এবং নিম্নভাগের গতি কম; উপরিভাগ এবং মধ্যভাগের গতি বেশী।

ধীর গতি হইলেও হিমবাহের ঘর্ষণে পর্বতগাত্র ক্ষয়িত হয়; দুই পাশের বড় বড় শিলাখণ্ড ভাঙিয়া হিমবাহের উপর পড়ে। উহার কতকগুলি হিমবাহের ফাটলের ভিতর দিয়া উহার তলায় প্রোথিত হইয়া যায় (ground moraine); কতক হিমবাহের সঙ্গে প্রবাহিত হয়। হিমবাহ-বাহিত এই শিলারাশি দুই পাশে ও সম্মুখে স্তূপাকারে জমিয়া উঠে। এই শিলাস্তূপের নাম **গ্রাবরেখা** (moraine)। হিমবাহের পার্শ্বে জমিলে ইহা-দিগকে **পার্শ্ব গ্রাবরেখা** (lateral moraine) এবং সম্মুখে জমিলে **প্রান্ত গ্রাবরেখা** (terminal moraine) বলে। দুই হিমবাহ দুই দিক দিয়া আসিয়া মিলিলে উহাদের মধ্যবর্তী শিলাস্তূপকে **মধ্য গ্রাবরেখা** (medial moraine) বলে। হিমবাহের ঘর্ষণে পর্বতের উপত্যকা চওড়া হইয়া যায় এবং কখন কখন তথায় হিমবাহ হ্রদের সৃষ্টি হয়। হিমবাহ-উপত্যকা সমুদ্রজলে ডুবিয়া **ফিয়র্ড** (fiord) সৃষ্টি করে।
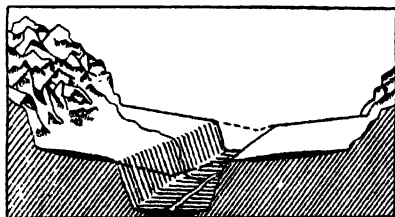
হিমবাহ উপত্যকা

৩২নং চিত্র

হিমবাহ যে শুধু ক্ষয়কার্য করে তাহা নহে। ইহার গঠনকার্যও কোন অংশে কম নহে। হিমবাহ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন হিমবাহবাহিত শিলা হিমরেখার নিম্নে স্তূপাকারে জমিতে থাকে, ক্রমশ এই শিলারাশি একটা ছোট পাহাড়ের সৃষ্টি করে। হিমালয় ও আল্পসের পাদদেশে এইরূপ অনেক হিমবাহ-সৃষ্ট পাহাড় দেখা যায়। কখন কখন বরফের ধাক্কায় অতি-বৃহৎ শিলাখণ্ড বহুদূরে নীত হয়। হিমবাহ অপসারিত হইলে ইহারা এক-একটা

বিশাল শিলারূপে পড়িয়া থাকে। পার্শ্ববর্তী শিলার সহিত ইহার কোন মিল থাকে না। ইহাদিগকে **এরটিক** (Erratic) বলে। অনেক সময় হিমবাহ-আনীত শিলাকণা জলধারায় বহুদূরে নীত হইয়া ছোট ছোট ঢিবির আকারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে **ড্রামলিন** (Drumlin) বলে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে এরূপ অনেক ড্রামলিন দেখা যায়। অনেক
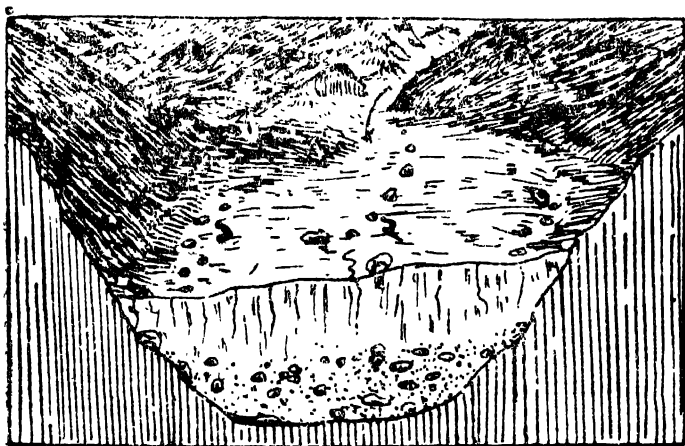
৩৩নং চিত্র—১, ৩—পার্শ্ব গ্রাবরেখা ২—মধ্য গ্রাবরেখা

সময় হিমবাহ-আনীত শিলারাশি জলস্রোত বন্ধ করিয়া হ্রদের সৃষ্টি করে। এইজন্যই ইউরোপ ও ক্যানাডার হিমবাহ-সৃষ্ট অঞ্চলে বহু হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর মত হিমবাহের কার্যকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—ক্ষয়, পরিবহণ ও অবক্ষেপণ।

মাঝে মাঝে হিমবাহ হইতে তুষারস্তূপ ভাঙ্গিয়া পৃথক হইয়া প্রবলবেগে নীচে নামে এবং যাহা সম্মুখে পায় ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাকে **হিমানী-সম্প্রপাত** (avalanche) বলে।

কুমেরু মহাদেশ এবং সুমেরু-সন্নিহিত গ্রীনল্যাণ্ডের হিমরেখা প্রায় সাগর-সমতলে অবস্থিত। সেজন্য ঐ সব অঞ্চলের বিশাল হিমবাহগুলি না গলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে। ইহাদিগকে **মহাদেশীয় হিমবাহ** (continental

glacier) বলে। সমুদ্রস্রোত ও অন্যান্য কারণে হিমবাহের কতক অংশ ভাঙিয়া সমুদ্রে ভাসে। ভাসমান এই সকল তুষারস্তূপের নাম **হিমশৈল** (iceberg)। হিমশৈলের অধিকাংশ জলতলে থাকে। মাত্র ⅑ অংশ জলের উপর দেখা যায়। সমুদ্রের উষ্ণ অংশে আসিয়া হিমশৈল গলিতে আরম্ভ করে ; উহার মধ্যে যে শিলাচূর্ণ থাকে তাহা সাগরগর্ভে সঞ্চিত হইয়া মগ্ন চড়ার (bank) সৃষ্টি করে। (নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক এইভাবে গঠিত হইয়াছে)। উষ্ণ স্রোতের সঙ্গে মিলিত হইলে ভাসমান হিমশৈল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়। এই অবস্থায় হিমশৈলের আঘাতে অনেক জাহাজ নষ্ট হয় (টাইটানিক জাহাজডুবি এইরূপে হইয়াছিল)।

প্রশ্নাবলী

১। নদীপ্রবাহের বিভিন্ন অংশে নদীর কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। হিমবাহের উৎপত্তি কিভাবে হয় ? হিমবাহ কিভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে তাহা বিশদভাবে লিখ।

৩। নদী ও হিমবাহের ক্ষয়, পরিবহন ও অবক্ষেপণ কার্যের তুলনা কর।

৪। নদী কি ভাবে পলি-ভূমি, স্বাভাবিক বাঁধ ও অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি করে তাহা চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ :—হিমরেখা, জলবিভাজিকা, গিরিখাত, গ্রাবরেখা, হিমানী-সম্প্রপাত, হিমশৈল, ব-দ্বীপ।

সপ্তম অধ্যায়

পর্বত

ভূ-ত্বকের আকস্মিক ও ধীর পরিবর্তনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন স্থলরূপের (Land form) উদ্ভব হয়।

পর্বত (Mountain)—অত্যন্ত উঁচু দূরব্যাপ্ত শিলাস্তূপের নাম **পর্বত** শিলাস্তূপ কম উঁচু ও অল্পদূরব্যাপী হইলে তাহাকে **পাহাড়** (hill) বলে। ছোট পাহাড় **টিলা** নামে কথিত হয়।

উৎপত্তির কারণ ও গঠন অনুসারে পর্বত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) **ভঙ্গিল পর্বত** (Fold mountain)—উত্তপ্ত ও তরল পৃথিবী ক্রমশ শীতল ও কঠিন হইয়া বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উপরিভাগ প্রথমে কঠিন হইয়া ভূ-ত্বক সৃষ্টি করে। অভ্যন্তর ভাগ তখনও উষ্ণ ছিল। উহা পরে ধীরে ধীরে শীতল হইতে থাকে। অভ্যন্তর ভাগ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়ায় উহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া উপরের ভূ-ত্বকে ভাজের সৃষ্টি
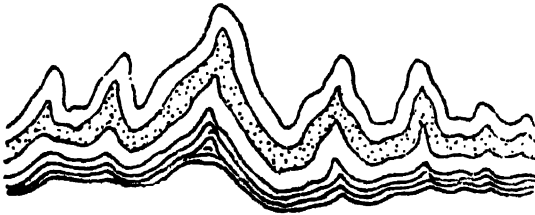
৩৪নং—ভঙ্গিল পর্বতমালার জন্ম

হয়। আবার ভূ-আন্দোলনের জন্যও পার্শ্বচাপের সৃষ্টি হয়। দুই দিক হইতে এই চাপের (compression) ফলে পাললিক শিলাস্তর যুগ যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া গুটাইয়া কোথাও উচ্চ কোথাও বা নিম্ন হইয়া উঠে। এইরূপ উঁচু-নীচু ভাঁজ পড়ার ফলে যে পর্বতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা **ভঙ্গিল** পর্বত। ক্ষয়ীভবনের ফলে ঐ ভাঁজগুলির কতক অংশ ক্ষয় হইতে থাকে অথচ পর্বতের উন্নতি

সমানভাবে চলিতে থাকে। ত্বকের দুর্বলতাবশত মধ্যে মধ্যে স্তরচ্যুতিও ঘটে। সেইজন্য নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালার সন্নিকটে ভূমিকম্প অধিক হয়। দুই ভাঁজের মধ্যবর্তী অবনত স্থানের নাম **উপত্যকা** (valley)। ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণীবদ্ধ ও দূরবিস্তৃতভাবে থাকে। হিমালয় একটি ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান উপাদান পাললিক শিলা; এই শিলাস্তরে সামুদ্রিক জীবাশ্ম (fossil) পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় হিমালয় প্রমুখ ভঙ্গিল পর্বতগুলি এক সময়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। যে সমুদ্র হইতে হিমালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে উহার নাম ছিল টেথিস (Tethys)।

হিমালয়, আল্পস্, রকি, আণ্ডিজ প্রভৃতি পৃথিবীর সু-উচ্চ পর্বতগুলি ভঙ্গিল পর্বত। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের পিনাইন, আমেরিকার আপেলেশিয়ান পর্বত, আফ্রিকার কেপরেঞ্জ, অস্ট্রেলিয়ার ডিভাইডিং রেঞ্জ এবং এশিয়ার টিয়েনশান, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, শিবালিক প্রভৃতিও ভঙ্গিল পর্বত।

(২) **স্তূপ পর্বত** (Block mountain)—ভূ-আন্দোলনের ফলে কখন কখন ভূ-পৃষ্ঠে ফাটল ধরিয়া খানিকটা শিলাস্তর স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। ইহাকে

রাইন নদীর গ্রস্ত উপত্যকা
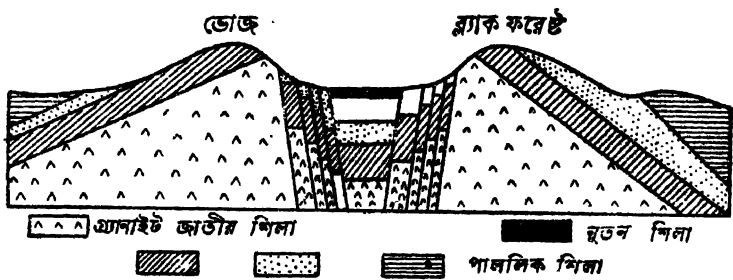
৩৫নং চিত্র

চ্যুতি (fault) বলা হয়। দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী বিচ্ছিন্ন ভূমি নিম্ন হইতে চাপে অথবা স্থানচ্যুত স্তরের পার্শ্বচাপে যদি ঠেলিয়া উপরে উঠে তবে তাহাকে **স্তূপ পর্বত** বলে। দুই চ্যুতির মধ্যস্থ ভূমি উভয় পার্শ্বের স্তর অপেক্ষা নীচে

বসিয়া গেলে **গ্রস্ত-উপত্যকার** (rift-valley) সৃষ্টি হয়। ইউরোপের হার্জ পর্বত, ভোজ ও ব্ল্যাক ফরেস্ট স্তূপ পর্বত। ভোজ ও ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যবর্তী রাইন নদীর উপত্যকা গ্রস্ত-উপত্যকার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহা ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অংশে **বেসিন রেঞ্জ** (Basin Range), ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরানেভেদা পর্বত এবং পাঞ্জাবের সল্ট রেঞ্জও (Salt Range) স্তূপ পর্বত।

আফ্রিকার পূর্বভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি বিশাল গ্রস্ত-উপত্যকা আছে। নায়াসা, ট্যাঙ্গানাইকা, রুডলফ্ প্রভৃতি হ্রদ এই উপত্যকায় অবস্থিত। এইরূপ একটি গ্রস্ত-উপত্যকা হইতেই লোহিত সাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের সাতপুরা একটি স্তূপ পর্বত এবং নর্মদা উপত্যকা একটি গ্রস্ত-উপত্যকা।

(৩) **ক্ষয়জাত পর্বত** (Relict mountain)—ভঙ্গিল বা স্তূপ পর্বতের (অথবা মালভূমির) কোমল শিলাস্তর বৃষ্টি, বায়ু, তুষার প্রভৃতির কার্যে ক্রমশ ক্ষয়িত হইয়া যায়; শুধু কঠিন শিলা বর্তমান থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতের এই অবশিষ্ট অংশকে **ক্ষয়জাত পর্বত** বলা হয়। পূর্বঘাট এবং পরেশনাথ পাহাড় ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ।

(৪) **সঞ্চয়জাত পর্বত** (Mountain of accumulation)—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যুগ যুগ ধরিয়া ভূ-পৃষ্ঠে লাভা জমিয়াছে। তাহাতেই এই পর্বতের সৃষ্টি। বিসুভিয়াস সঞ্চয়জাত পর্বতের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। হিমবাহের সম্মুখে গ্রাবরেখাও ঐরূপ **পর্বত** সৃষ্টি করে।

প্রশ্নাবলী

১। উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে পর্বতকে কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় বল। প্রত্যেক শ্রেণীর পর্বতের এক-একটি বিবরণ দাও।

২। ভঙ্গিল পর্বত কাহাকে বলে? ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া লিখ।

৩। স্তূপ পর্বত ও গ্রস্ত উপত্যকার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জান উদাহরণসহ লিখ।

৪। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—জীবাশ্ম, চ্যুতি, ক্ষয়জাত পর্বত, গ্রস্ত-উপত্যকা।

অষ্টম অধ্যায়

আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ও সমভূমি

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত—ভূ-গর্ভ অতিশয় উত্তপ্ত। কিন্তু উপরের অশ্মমণ্ডলের প্রচণ্ড চাপে ভূ-গর্ভের উত্তপ্ত পদার্থসমূহ কঠিন বস্তুর মত ঘন হইয়া থাকে। ভূ-ত্বকের ক্ষয় ও ভূ-গর্ভ সঙ্কোচনের ফলে অনেক সময় চাপ কমিয়া যায়; উত্তপ্ত পদার্থ সেই সময়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই তরল ধাতব পদার্থ হইতে নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাষ্প ও গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহারই প্রবল চাপে ভূ-ত্বক ফাটিয়া ভিতরকার গলিত পদার্থ বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইতে
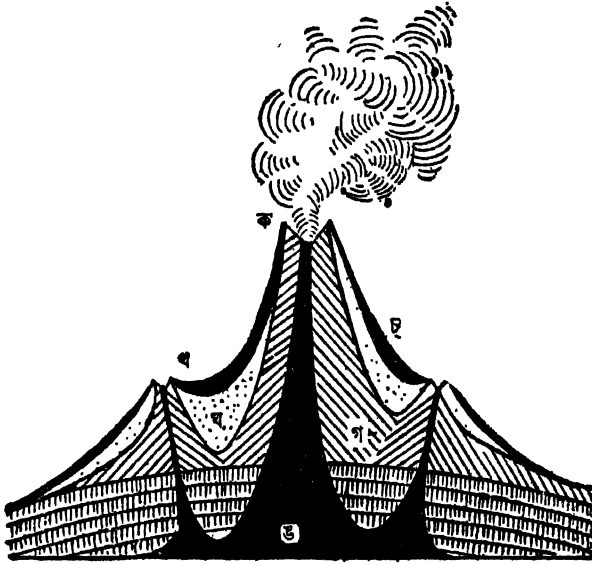
৩৬নং চিত্র—আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ

থাকে। ঐরূপ নির্গমকে **অগ্ন্যুৎপাত** (eruption) এবং গলিত পদার্থ-সমূহকে **লাভা** (lava) বলে। বৎসরের পর বৎসর ঐ সকল পদার্থ ছিদ্রমুখের চারিদিকে পর্বতাকারে জমিয়া উঠে। ইহাই **আগ্নেয়গিরি** (volcano)।

ছিদ্রমুখের বহিরাংশ বাটির মত। উহাকে **আগ্নেয়গিরির মুখ** বা

জ্বালামুখ (crater) বলা হয়। ছিদ্রের নিম্নভাগে বিশাল গহ্বরে গলিত পদার্থ সঞ্চিত থাকে। উহাকে বলে **ম্যাগমা চেম্বার** (magma chamber)।

যে আগ্নেয়গিরি হইতে অনবরত অথবা মধ্যে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাদিগকে **জীবন্ত** (active) আগ্নেয়গিরি বলে (যথা—হাওয়াই দ্বীপে মৌনালোয়া, ইটালিতে বিসুভিয়াস)। যাহা বহুকাল নিষ্ক্রিয় আছে তাহার নাম **সুপ্ত** (dormant) আগ্নেয়গিরি (যথা—জাপানের ফুজিয়ামা)। যে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাতের আর কোন সম্ভাবনা নাই তাহাকে **মৃত** (extinct) আগ্নেয়গিরি বলে (যথা—ব্রহ্মদেশের পোপা)।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা সঞ্চিত হইয়া মালভূমির সৃষ্টি হয়। দক্ষিণাপথের গুজরাট অঞ্চলের (Deccan lava region) মালভূমি এইরূপ লাভাদ্বারা গঠিত। সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভা সঞ্চিত হইয়া অনেক সময় সমুদ্রে নূতন দ্বীপের সৃষ্টি করে (যথা—হাওয়াই দ্বীপ)। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে আগ্নেয় শিলা ও খনিজ পদার্থ সঞ্চিত হয়। কখন কখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অংশবিশেষ ধ্বসিয়া গর্ত হইয়া যায়; নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া যায়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ক্রাকাতোয়া দ্বীপ সমুদ্রের নীচে ধ্বসিয়া গিয়াছিল। বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকুলেনিয়াম ও পম্পীয়াই নগর দুইটি লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল।

আগ্নেয়গিরির শ্রেণী—পৃথিবীতে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি আছে। আগ্নেয়গিরিগুলি সাধারণত পৃথিবীর দুর্বল অংশেই দেখা যায়। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি শ্রেণীবদ্ধভাবে পৃথিবীর এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত। ইহারা এক-একটি আগ্নেয়গিরি-মেখলার সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রথম শ্রেণী হর্ন অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার উপকূল দিয়া এশিয়ার পূর্বে এলিউসিয়ান, কামচকাটা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং অতঃপর নিউগিনি, নিউজিল্যাণ্ড হইয়া কুমেরু মহাদেশ অবধি গিয়াছে। ইহার একটি শাখা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি গিয়াছে। এই আগ্নেয়গিরি-শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরকে মালার মত ঘিরিয়াছে বলিয়া ইহাকে **প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা** (Fiery ring of the Pacific) বলা হয়।

৩৭নং চিত্র

পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুব রেখা
মকর ক্রান্তি

৩৮নং চিত্র
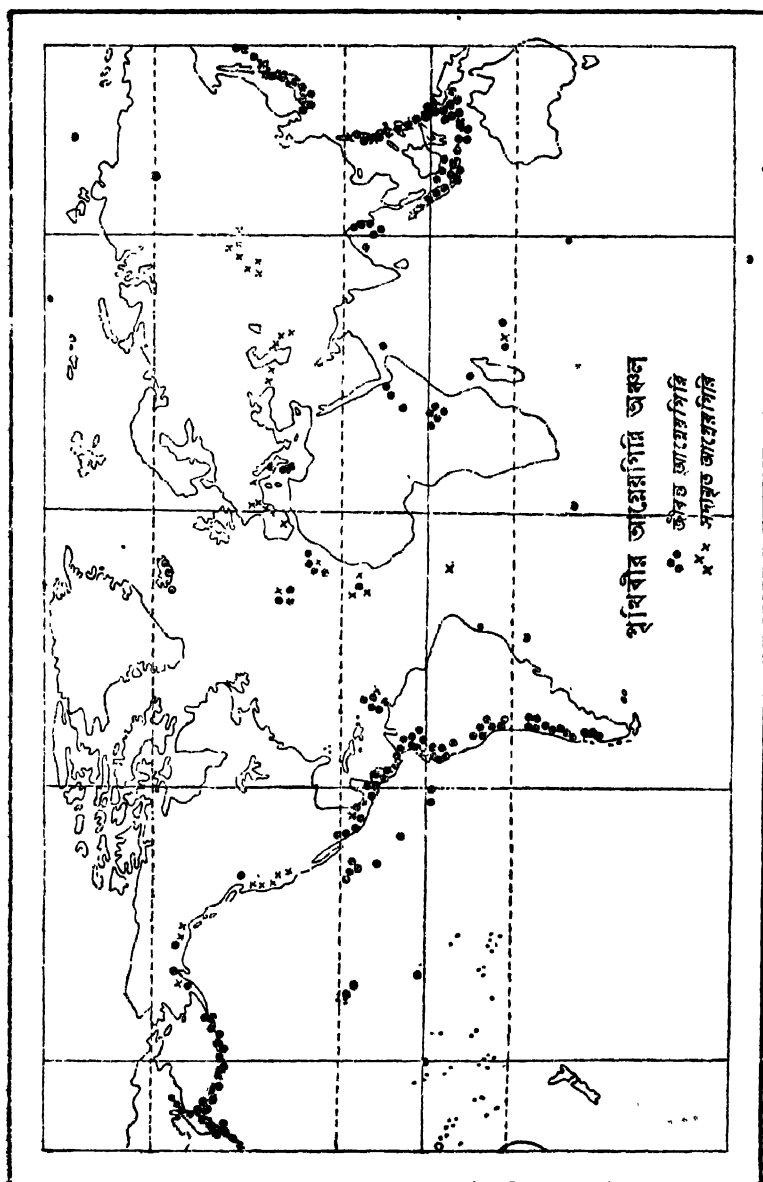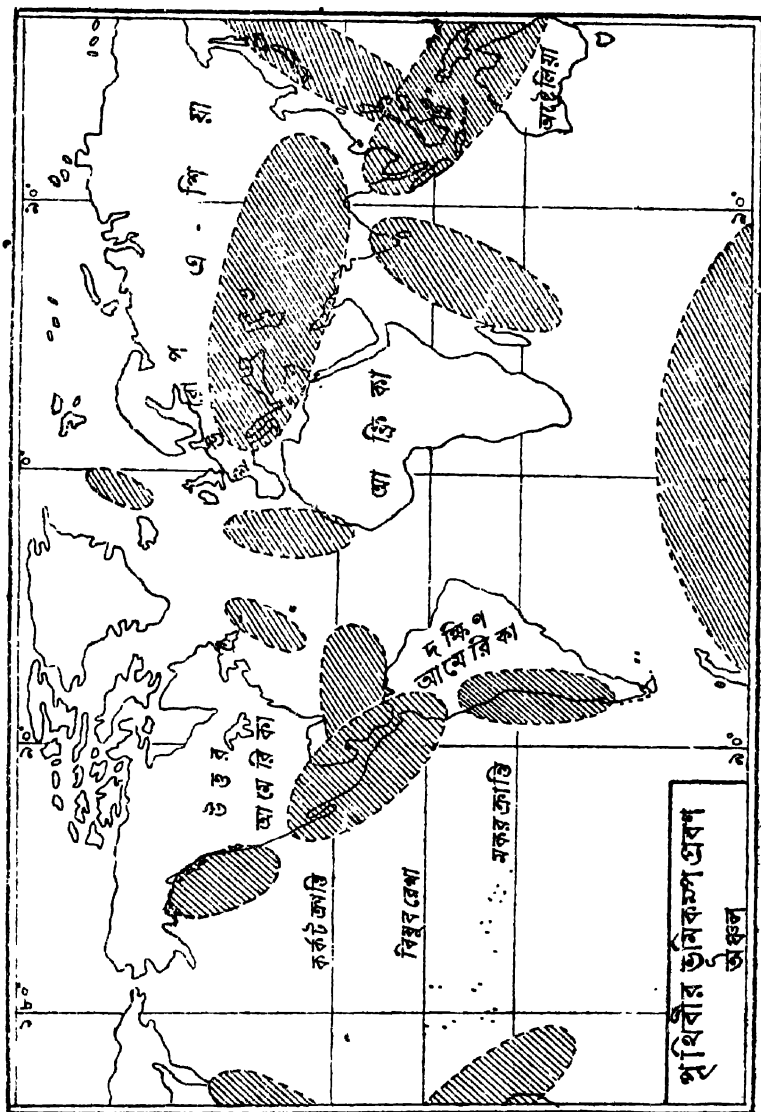
দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তর মহাসাগর হইতে আইসল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, এজোরস, কেপভার্ড দ্বীপ হইয়া গিনি উপসাগর অবধি গিয়াছে। উহার একটি শাখা ভূমধ্যসাগরের সিসিলি দ্বীপ হইয়া ককেসাস পর্বত অবধি এবং অপর একটি শাখা পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি গিয়াছে। মাদাগাস্কার, কিউলিয়াম প্রভৃতি দ্বীপ অবধিও একটি আগ্নেয়গিরি-শ্রেণী আছে।

ভূমিকম্প—কখন কখন ভূ-ত্বক হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে; ইহাই ভূমিকম্প (earthquake)। ভূ-গর্ভের কোন একটি স্থানে কম্পনের উৎপত্তি হইয়া চারিদিকে উহা তরঙ্গের মত ছড়াইয়া পড়ে। ঐ উৎপত্তি-স্থানকে **কেন্দ্র** (seismic focus) বলে। কেন্দ্রের সোজাসুজি পৃষ্ঠস্থ বিন্দু **উপকেন্দ্র** (epicentre) নামে অভিহিত হয়।

নিম্নোক্ত কারণে সাধারণত ভূমিকম্প হয়—(১) সঙ্কোচন, প্রসারণ অথবা ভূ-অভ্যন্তরের অন্য কোন কারণে শিলাস্তরের চ্যুতি (fault) ঘটে। যখন শিলাস্তর নীচে নামিতে বা উঠিতে থাকে তখন প্রবল ঘর্ষণের ফলে সেই স্থানে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতে ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পগুলি এই কারণেই ঘটিয়াছে। ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণী অঞ্চলে এই রকম শিলাচ্যুতি প্রায়ই হয়, তাই ঐ সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প অধিক হয়।

(২) ভূ-ত্বকে ভাঁজ সৃষ্টি হওয়ার সময় যে চাপ হয় তাহার ফলে সময় সময় ভূ-কম্পন হয়।

(৩) বৃষ্টির জল পড়িয়া শিলাস্তর আলগা হইয়া যায় এবং উপরের স্তর ধ্বসিয়া পড়ে। ইহাকে ভূ-পাত বলে। ইহার ফলে অনেক সময় ভূ-কম্পন হয়।

(৪) ভূ-গর্ভের সহিত বাষ্পে চাপ পড়িলে উহা ভূ-ত্বকের নীচে ধাক্কা দেয়, ইহাতে ভূমিকম্প হয়।

(৫) ভূ-গর্ভে কোন কারণে চাপ কমিয়া গেলে উত্তপ্ত পদার্থ গলিয়া উপরে উঠিতে চায়। ইহাতে ভূ-কম্পন ঘটে।

(৬) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় বহির্মুখী বাষ্পের চাপে কখন কখন ভূমিকম্প হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল (জাপান, আমেরিকা)

ভূ-কম্পপ্রবণ স্থান। ভূমধ্যসাগরের চারিদিক, এশিয়া মাইনর ও পামির মালভূমিতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। আসামে খাসিয়া পাহাড়, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের ফল—(১) ভূ-ত্বকে ফাটল পড়ে। (২) নদী গতি বদলায়, নদী শুকাইয়াও যায়। (৩) ভূ-ত্বকের চ্যুতি (fault) হয়, একদিকে ভূমি উঁচু হয়, অপর দিকে নামিয়া যায়। (৪) পর্বতের উপর শিলাপাত (rock slide) বা হিমানী-সম্প্রপাত (avalanche) হইতে পারে। (৫) উচ্চভূমি ধ্বসিয়া জলাভূমির সৃষ্টি হয়। (৬) সমুদ্রতীর হইতে জল নামিয়া যায়, পরে উহা আবার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইয়া উপকূল পরিপ্লাবিত করে। (৭) সমুদ্র-সমতলের নিম্নস্থ ভূমি জলের উপর জাগিয়া উঠে, আবার উচ্চভূমি জলতলে ডুবিয়া যায়। (৮) গ্রাম-নগর ধ্বংস হইয়া লোকক্ষয় ঘটে।

সমভূমি (Plain)—সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় সমতলে অবস্থিত স্থলভাগকে সমভূমি বলে। সমভূমি অনুভূমিক ক্রমনিম্ন অথবা সামান্য উঁচু-নীচু হইতে পারে।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী অগভীর অংশ যদি নদীবাহিত মাটিতে ভরাট হইয়া যায় অথবা ভূমিকম্পের ফলে জলের উপর ভাসিয়া উঠে তাহা হইলে **উপকূল প্লাবনভূমির** (coastal Plain) সৃষ্টি হয়। করোমণ্ডল উপকূল এইরূপ সমভূমি। বন্যার জলের সহিত পলি জমিয়া নদী-উপত্যকায় যে সমভূমির সৃষ্টি করে, তাহাকে **প্লাবনভূমি** (flood-plain) বলা হয়। গঙ্গা, হোয়াং হো প্রভৃতির উপত্যকা ও ব-দ্বীপ এইরূপ সমভূমি। নদীবাহিত বালুকা ও পলিদ্বারা হ্রদের গর্ভ ভরাট হইয়া হ্রদ-সমভূমি (lake-plain) উৎপত্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট বেসিন হ্রদ-সমভূমির নিদর্শন। হিমবাহের সহিত প্রবাহিত গ্রাবরেখার ঘর্ষণে অসমান ভূমি সমভূমিতে পরিণত হয়; ঐ গ্রাবরেখা হ্রদ ও নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হইয়া **হিমবাহ সমভূমি** (glacial plain) সৃষ্টি করে। কানাডার প্রেইরি অঞ্চল এইরূপ সমভূমি। ভূ-পৃষ্ঠের ফাটল বা আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভা জমিয়া লাভা সমভূমির (lava plain) সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক

শক্তির এই ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা লোপ পাইয়া শেষ অবস্থায় একটি সমভূমির সৃষ্টি হয়। ইহাকে **ক্ষয়ীভূত সমভূমি** (Peneplain) বলে।

প্রশ্নাবলী

১। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের পার্থক্য কি বল।

২। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি অধিক আছে তাহার বিবরণ দাও।

৩। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি ও উহার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। ভূমিকম্প কাহাকে বলে? ইহার কারণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চল অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ?

৫। সমভূমির উৎপত্তি কিভাবে হয়? পৃথিবীর সমভূমিগুলিকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তাহা উদাহরণসহ লিখ।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—লাভা, ম্যাগমা-চেম্বার, জ্বালামুখ, প্রশান্তমহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র, প্লাবনভূমি।

নবম অধ্যায়

সমুদ্র

ভূ-পৃষ্ঠের সাত ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ জল। ইহাই বারিমণ্ডল (hydrosphere)। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির বিভিন্ন অংশকে মহাসাগর (ocean), সাগর (sea), উপসাগর (bay or gulf) প্রভৃতি বলে। ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু অংশ স্থল, নীচু অংশ সমুদ্র।

মহাসাগর **পাঁচটি**—(১) **প্রশান্ত মহাসাগর** (Pacific Ocean) এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত) আয়তনে ইহা বৃহত্তম। প্রায় ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। ইহার গড়-গভীরতা প্রায় ১২,৫৬৪ ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা ৩২,৬৬৪ ফুট। নাবিক ম্যাগেলান এই মহাসাগরে ঝড়, তুফান কিংবা তরঙ্গাভিঘাত দেখিতে পান নাই। তাই এরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন।

(২) **আটলাণ্টিক মহাসাগর**—(Atlantic Ocean) আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে আফ্রিকা ও ইউরোপ অবধি প্রায় ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ বর্গমাইল অবধি বিস্তৃত। ইহার উপকূলে শক্তিমান বহু সমৃদ্ধ দেশ ও বন্দর অবস্থিত; পৃথিবীর অধিকাংশ বাণিজ্যপোত ইহার উপর দিয়া চলাচল করে। সেই হিসাবে আটলাণ্টিককে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর বলা যায়। ইহার গড়-গভীরতা প্রায় ১০,৩৭০ ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা ২৭,৯৭২ ফুট।

(৩) **ভারত মহাসাগর** (Indian Ocean)—এশিয়ার দক্ষিণভাগে আফ্রিকার পূর্বকূল হইতে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল অবধি প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। ইহার গড় গভীরতা ১৪,৭৯০ ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা ২২,৯৬০ ফুট।

(৪) **উত্তর মহাসাগর** (Arctic Ocean)—সুমেরু বৃত্তের মধ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। ইহার গড় গভীরতা ২,৭০০ ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা ১৫,৯১০ ফুট।

(৫) **দক্ষিণ মহাসাগর** (Antarctic Ocean) আণ্টার্টিকা মহাদেশের উত্তরে মোটামুটি ৪০° অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত। গড়-গভীরতা ৪,৯২০ ফুট এবং সর্বাধিক গভীরতা ১৮,৮৫০ ফুট।

সমুদ্রতল—মহাদেশের কিয়দংশ তটসীমা ছাড়াইয়া সমুদ্রজলে ডুবিয়া থাকে। সেখানে গভীরতা সাধারণত ৬০০ ফুটের বেশী হয় না। এই নিমজ্জিত অংশকে **মহীসোপান** (Continental shelf) বলে। মহীসোপান
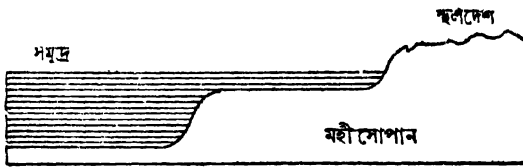
৩৯নং চিত্র

শেষ হইলে তলদেশ হঠাৎ ঢালু হইয়া যায়, সমুদ্র সুগভীর হয়। এই ঢালু অংশের নাম **মহীঢাল** (continental slope)। মহীঢালের পরে বিস্তীর্ণ **সমুদ্রতল** (ocean floor)। ইহা সমভূমি নহে—কোথাও পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, কোথাও-বা গভীর খাত রহিয়াছে।

সমুদ্রের অবক্ষেপ (deposits)—অগভীর মহীসোপানে জলস্রোত-বাহিত পলি, বালি, কাদা ইত্যাদি জমিয়া পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। গভীর সমুদ্রে সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ জমিয়া সিন্ধুমল (ooze) সৃষ্ট হয়। আরও গভীর (অন্যূন ১২,০০০ ফুট গভীর) সমুদ্রে লাল কাদা (red clay) সঞ্চিত হইতেছে। সাগরতলের আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত শিলাধূলি হইতে এই লাল কাদার জন্ম।

সামুদ্রিক জীব—সমুদ্রে অতিবৃহৎ তিমি হইতে আরম্ভ করিয়া হাঙর, অক্টোপাস, মৎস্য, স্পঞ্জ, প্রবালকীট, নানাজাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি রহিয়াছে। জলের মধ্যে ৩,০০০ ফুট পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করে; উহার নীচে প্রাণী বাস করিতে পারে না।

সমুদ্রজলের লবণতা—(salinity) সমুদ্রজল লবণাক্ত। এক হাজার ভাগ জলে ৩৫ ভাগ লবণ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ২৭ ভাগ সাধারণ লবণ (Sodium Chloride) ; বাকি নানাজাতীয় খনিজ লবণ।

লবণতার কারণ সম্পর্কে অনুমান করা যায়—(১) বৃষ্টিপাত, বন্যা প্রভৃতি দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ ধৌত হইয়া নদীজলের সহিত লবণ সমুদ্রে বাহিত হয়। (২) ভূ-আন্দোলনে সমুদ্রের উৎপত্তির সময়ে নানাপ্রকারের প্রচুর লবণ সমুদ্রজলে মিশিয়াছে। (৩) সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত লবণ জলে মিশিয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রজল সব জায়গায় সমান লবণাক্ত নহে। লবণতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে—(ক) নদীবাহিত স্বাদুজল ও বৃষ্টির পরিমাণ এবং (খ) বাষ্পীভবনের পরিমাণ অনুসারে (সাগরের জলের বাষ্পীভবন নির্ভর করে বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের উপর)।

(ক) নিরক্ষ-অঞ্চলে উষ্ণতার জন্য বাষ্পীভবন বেশী। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক বড় বড় নদী সাগরে মিলিত হওয়ায় এখানে সমুদ্রজল বেশী লবণাক্ত হইতে পারে না।

(খ] কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয়ে শুষ্ক মরুভূমি অবস্থিত ; সুতরাং এখানে সমুদ্র নদীজল হইতে বঞ্চিত। এ অঞ্চলে জলের বাষ্পীভবনও বেশী। এইজন্য এখানকার সমুদ্রজল অধিক লবণাক্ত।

(গ) মেরুপ্রদেশে শৈত্যের জন্য বাষ্পীভবন কম। তাই মেরুসাগর কম লবণাক্ত (মাত্র ২%)।

ভূমধ্যসাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের চারিদিক ভূ-বেষ্টিত এবং ইহারা মরুভূমির নিকটে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে পতিত নদীসংখ্যাও বেশী নয়। সেইজন্য ইহারা অধিক লবণাক্ত (শতকরা চারি ভাগ]। বাল্‌টিক সাগর ও কৃষ্ণসাগর ভূ-বেষ্টিত বটে কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক নদী আসিয়া পড়িয়াছে। জলবায়ু শীতল হওয়ায় বাষ্পীভবন খুব কম। সেজন্য ইহারা কম লবণাক্ত।

সমুদ্রজলের উষ্ণতা—সমুদ্রের জলের উপরিভাগে জলের উষ্ণতা পৃথিবীর অক্ষাংশ, ঋতুভেদ ও দিবারাত্রির ভেদের উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

নিরক্ষ অঞ্চলে গড়-উষ্ণতা ৮০° ফারেনহাইট। উত্তরে ও দক্ষিণে উষ্ণতা ক্রমশ কমিয়া মেরুপ্রদেশে ২৮° বা ২৯° ফা. হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে উষ্ণতা বেশী; নিম্নে উষ্ণতা ক্রমশ কমিয়া যায়। কিন্তু উষ্ণতার প্রভেদ সামান্যই (গ্রীষ্মে শীতে ১০° দিনে ও রাত্রে ১° মাত্র)।

সমুদ্রজল ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়; তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইতেও ইহার অনেক সময় লাগে। স্রোতে ও তরঙ্গে ইহা সর্বদা আলোড়িত হইতেছে। এই সকল কারণে উষ্ণতার পার্থক্য অধিক হইতে পারে না।

সমুদ্রজলের ঘনত্ব—সমুদ্রজলের উষ্ণতা এবং লবণের পরিমাণের উপর সমুদ্রজলের ঘনত্ব নির্ভর করে। যে জলে শতকরা ৩·৫ ভাগ লবণ আছে, ৩২° ফা. উত্তাপে উহার ঘনত্ব প্রায় ১·০৩। উত্তাপে জল আয়তনে বাড়িয়া যায়। তাই ঘনত্বও কমিয়া যায়। অধিক লবণাক্ত উষ্ণ সমুদ্রজলের চেয়ে কম লবণাক্ত শীতল সমুদ্রজল ভারী হইতে পারে।

সমদ্রস্রোত—বায়ুপ্রবাহ, জলের উষ্ণতা ও ঘনত্বের তারতম্য, পৃথিবীর আবর্তন প্রভৃতি কারণে সমুদ্রজলে গতি উৎপন্ন হয়। ইহাই স্রোত (current)।

স্রোতের উৎপত্তি প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে ঘটে—(১) প্রবল নিয়ত বায়ুসমূহ নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হইবার সময় সমুদ্রজলকেও সেই দিকে চালিত করে। (২) নিরক্ষ-অঞ্চলে সূর্যকিরণে সমুদ্রজল উত্তপ্ত হইয়া কতকটা বাষ্পীভূত হয় এবং কতক লঘু ও প্রসারিত হইয়া সমুদ্রের উপরিভাগে বহিঃস্রোত (surface current) রূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এই স্থান পূরণের জন্য মেরু-অঞ্চলের শীতল ও ঘন জল সমুদ্রনিম্ন দিয়া অন্তঃস্রোত (under current) রূপে নিরক্ষ-অঞ্চলে চলিয়া আসে। (৩) লবণাক্ত জল ভারী, স্বাদু জল লঘু; সেজন্য অধিক লবণাক্ত সমুদ্রের জল কম লবণাক্ত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য স্বভাবতই সমুদ্রজলের পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে গতির সৃষ্টি হয়।

স্রোত ও তরঙ্গ—স্রোত সমুদ্রজলকে একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যায়। তরঙ্গ হইলে জল আলোড়িত হয়, কিন্তু বিশেষ স্থানপরিবর্তন করে না।

সমদ্রস্রোতের গতিপথ—(১) সমুদ্রস্রোত বায়ুপ্রবাহের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সেজন্য অধিকাংশ সমুদ্রস্রোত বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণ করে। (২) ফেরেল সূত্র অনুযায়ী সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে প্রবাহিত হয়। (৩) মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জে প্রতিহত হইয়া সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়।
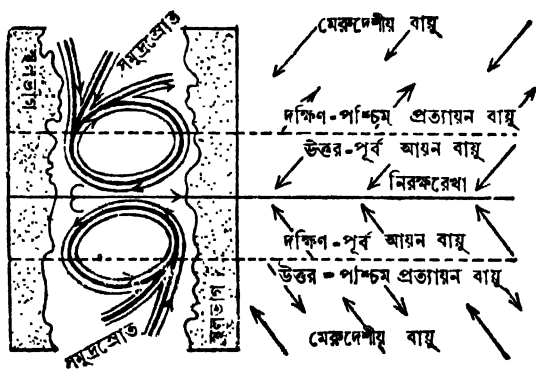
৪০নং চিত্র—বায়ু ও সমুদ্রের গতিপথ

প্রধান সমুদ্রস্রোত—আটলান্টিক, প্রশান্ত ও দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলি মোটামুটি এক রকমের। উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোত কিছু বিভিন্ন। মৌসুমীবায়ু এবং উত্তরে অবস্থিত স্থলভাগের জন্য এই পার্থক্য ঘটে।

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত—কুমেরু মহাসাগর হইতে অতি শীতল **কুমেরু** স্রোত (Antarctic current) দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া আটলান্টিকে আসে। তখন ইহা শীতল **বেঙ্গুয়েলা** স্রোত (Benguela current) নামে অভিহিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিকগতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর প্রভাবে এই স্রোত পশ্চিমে বাঁকিয়া **দক্ষিণ-নিরক্ষীয়** স্রোতের সঙ্গে মিশে। অতঃপর দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টরক অন্তরীপে প্রতিহত হইয়া ইহা দুই শাখায় ভাগ হইয়া যায়। এক শাখা উষ্ণ **ব্রেজিল** স্রোত (Brazil current) নামে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়। পরে উহা পূর্বমুখী হইয়া পুনর্বার

ঘূর্ণমান কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিশে। অপর শাখা উত্তর-পশ্চিমমুখী হইয়া প্রথমে ক্যারেবিয়ান সাগরে, পরে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে।

অতঃপর ফ্লোরিডা প্রণালীর মধ্য দিয়া ঐ স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। ইহাই উষ্ণ **উপসাগরীয় স্রোত** (Gulf stream)। তখন ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ মাইল, বর্ণ ঘননীল, উষ্ণতা ৮৫° ফা., বিস্তার প্রায় ৪০ মাইল, গভীরতা অন্যূন ৩,০০০ ফুট। উপসাগরীয় স্রোতের সহিত অতঃপর উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতের মিলন ঘটে এবং উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া আটলাণ্টিকের প্রায় মধ্যভাগে উহা তিনটি শাখায় ভাগ হইয়া যায়। এক শাখা নাতিশীতল **ক্যানারি** (Canaries) স্রোত নামে পর্তুগাল ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার পার্শ্ব ঘুরিয়া পুনর্বার উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতে মিশে। এই জলাবর্তের মধ্যদেশে স্রোত থাকে না, সেখানকার জলে শেওলা, নানা উদ্ভিদ ও জঞ্জাল জমিয়া থাকে। ইহাকে **শৈবালসাগর** (Sargasso Sea) বলে। উপসাগরীয় স্রোতের দ্বিতীয় শাখা উত্তর আটলাণ্টিক স্রোত (North Atlantic Drift) নামে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়া ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূল অবধি চলিয়া যায়। তৃতীয় শাখা গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম দিয়া উত্তরদিকে ধাবিত হয়।

উপসাগরীয় স্রোতের উষ্ণতায় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের উপকূলভাগ তুষারমুক্ত থাকে। প্রত্যায়ন বায়ুস্রোতের সংস্পর্শে আসিয়া উষ্ণ ও জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়। এই বায়ু ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলে তাপ-বিকিরণ ও বৃষ্টিবর্ষণ করে।

দুইটি অতি-শীতল স্রোত সুমেরু মহাসাগর হইতে গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পাশ দিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়। গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণে লাব্রাডর উপদ্বীপের নিকটে এই দুই স্রোত মিলিত হয়। ইহাই শীতল **লাব্রাডর স্রোত** (Labrador current)। অতঃপর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট আসিয়া এই স্রোত উপসাগরীয় স্রোতে মিশে। এখান হইতে লাব্রাডর স্রোতের একটি অংশ উপসাগরীয় স্রোতের নিম্নদেশ দিয়া যায়। অপর অংশ উপসাগরীয় স্রোতের পশ্চিমদিক দিয়া আমেরিকার উপকূল বাহিয়া অগ্রসর

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
পূঃ গ্রীণল্যাণ্ড স্রোত
ল্যাব্রাডর স্রোত
উঃ আটলান্টিক স্রোত
পশ্চিমা স্রোত
উপসাগরীয় স্রোত
ক্যানারী স্রোত
উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত
গিনি স্রোত
দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত
ব্রেজিল স্রোত
বেঙ্গুয়েলা স্রোত
দক্ষিণ আটলান্টিক স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৪২নং চিত্র

হয়, এক দিকে উষ্ণ সুনীল উপসাগরীয় স্রোত, অন্য দিকে লাব্রাডর স্রোতের শীতল সবুজ জলপ্রবাহ। উষ্ণ ও শীতল স্রোতদ্বয়ের সীমারেখায় তুহিন প্রাচীর দেখা যায়। ইহা **হিমপ্রাচীর** (cold-wall) নামে কথিত হইয়া থাকে। লাব্রাডর স্রোতে অনেক **হিমশৈল** (iceberg) ভাসিয়া আসে, উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে উহা গলিয়া যায়। হিমশৈলবাহিত বালি-পাথর ইত্যাদি জমিয়া এখানে মগ্ন চড়ার সৃষ্টি হয়। শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলনে তাপপার্থক্যের জন্য এই অঞ্চলে প্রায়ই কুয়াশা ও ঝড়বৃষ্টি হয়।

কুমেরু মহাসাগর হইতেও (লাব্রাডর স্রোতের অনুরূপ) একটি শীতল স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের পার্শ্ব দিয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **ফক্‌ল্যাণ্ড স্রোত** (Flokland current) বলে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত—দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া শীতল কুমেরু স্রোত উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। ইহাকে **হামবোলট্** (Humboldt) বা **পেরু** (Peruvian) **স্রোত** বলে (আটলাণ্টিক মহাসাগরীয় বেঙ্গুয়েলা স্রোতের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে)। নিরক্ষ অঞ্চলে আসিয়া ইহা পশ্চিমমুখী হয় এবং দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের সহিত মিশে। অতঃপর ৮,০০০ মাইল অগ্রসর হইয়া মালয় দ্বীপপুঞ্জের নিকট তিনটি শাখায় ভাগ হইয়া যায়। এক শাখা **নিউ সাউথ ওয়েলস্** (New South Wales) **স্রোত** নামে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল বাহিয়া চলে (ব্রেজিল স্রোতের সহিত ইহার তুলনা চলে)। অতঃপর উহা পুনরায় কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিশে। দ্বিতীয় শাখা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় শাখা নিরক্ষবৃত্ত পার হইয়া উত্তর-পশ্চিমমুখে অগ্রসর হয়; কিছুদূর আসিয়া উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতে পড়ে। এই মিলিত স্রোত এশিয়ার পূর্ব উপকূলে পৌছিয়া **কুরো-শিয়ো স্রোত** (Kuro Siwo) বা **জাপান স্রোত** নামে জাপানের পূর্ব দিয়া প্রবাহিত হয়। উত্তরদিকে কিছুদূর গিয়া ইহার সহিত শীতল সুমেরু স্রোতের মিলন ঘটে (লাব্রাডর স্রোতের সহিত এই শীতল স্রোতের তুলনা হইতে পারে)। উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনে এই অঞ্চলেও ঘন কুয়াশা হয়। কুরো-শিয়ো স্রোত অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়নবায়ুর তাড়নায় ক্রমাগত

প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
উঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
কুরোসিও স্রোত
উঃ নিরক্ষীয় স্রোত
নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত
দঃ নিরক্ষীয় স্রোত
পেরু স্রোত
দঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৪২নং চিত্র

পূর্বদিকে গিয়া কানাডার পশ্চিম উপকূলে দুইটি শাখায় ভাগ হইয়া যায়। এক শাখা কানাডা উপকূল বাহিয়া উত্তরে যায়; অপর শাখা **ক্যালিফোর্নিয়া** (California) **স্রোত** (ক্যানারি স্রোতের অনুরূপ) নামে দক্ষিণমুখে ঘুরিয়া পুনর্বার উত্তর-নিরক্ষীয় স্রোতে মিলিত হয় এবং জলাবর্তের মধ্যভাগে শৈবাল সাগরের সৃষ্টি করে।

কুরো-শিয়ো ও উপসাগরীয় স্রোতের তুলনা—উভয় স্রোতই উষ্ণ ও নিরক্ষীয় স্রোতের শাখা। কুরো-শিয়ো প্রথমে এশিয়ার পূর্ব উপকূল পরে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বাহিয়া গিয়াছে; উপসাগরীয় স্রোত প্রথমে আমেরিকার পূর্ব উপকুল পরে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকুল বাহিয়া গিয়াছে। উভয় স্রোতই পার্শ্ববর্তী উপকূল-ভাগ উষ্ণ করে। উভয়েই শীতল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া ঝড়-কুয়াসার সৃষ্টি করে। উভয়েই শৈবাল সাগর সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কুরো-শিয়োর শৈবাল সাগর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কুরো-শিয়ো বৃহত্তর, কিন্তু ইহার গতি উপসাগরীয় স্রোতের ন্যায় তীব্র নহে।

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত--শীতল কুমেরু স্রোতের এক শাখা **পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত** নামে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে প্রবেশ করে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর তাড়নায় তাহা পশ্চিমে ঝুঁকিয়া দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতে মিশে। এই মিলিত স্রোত মাদাগাস্কার দ্বীপে প্রতিহত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ দক্ষিণমুখী হইয়া কুমেরু স্রোতে মিশে। অপর ভাগ মোজাম্বিক প্রণালীর মধ্যে **মোজাম্বিক স্রোত** (Mozambique current) নাম লইয়া প্রবাহিত হয়। অবশেষে ইহা কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়।

ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে স্রোত প্রধানত মৌসুমীবায়ু-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই ইহা **মৌসুমী স্রোত** নামে অভিহিত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ-নিরক্ষীয় স্রোতের এক শাখা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বাহিয়া আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দিয়া প্রবাহিত হয়। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে এই স্রোত বিপরীতমুখী হয়।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব—(১) সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যধিক। উষ্ণ অঞ্চলে শীতল স্রোত আসিয়া

ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
দঃ পঃ মৌসুমি স্রোত
উঃ পূঃ মৌসুমি স্রোত
নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত
নিরক্ষীয় স্রোত
আগুলাস স্রোত
পঃ অষ্ট্রেলিয় স্রোত
দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
উষ্ণ স্রোত
শীতল স্রোত

৪৩নং চিত্র

উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত শীতল করে। আবার শীতল অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত গিয়া ঐ স্থান কতকটা উষ্ণ করিয়া তোলে।

(২) উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত বাতাসে বেশী জলীয় বাষ্প থাকে। সেইজন্য যে উপকূলের পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয় সেই উপকূলে অধিক বৃষ্টি হয়।

(৩) স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালাইবার সুবিধা হয়। উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতে নরওয়ের উত্তর উপকূল তুষারমুক্ত থাকে, বন্দরের পথ বন্ধ হইতে পারে না। উষ্ণ কুরো-শিয়োর প্রভাবে কানাডার পশ্চিম উপকূলে বরফ জমিতে পারে না। শীতল সুমেরু স্রোতের প্রভাবে লাব্রাডরের বন্দর বৎসরের নয় মাস বরফে ঢাকা থাকে; কিন্তু একই অক্ষাংশে অবস্থিত থাকিলেও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এই অসুবিধা নাই। অতএব বাণিজ্য-ব্যাপারেও সমুদ্রস্রোতের বিশেষ প্রভাব আছে।

(৪) শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে অনেক মাছ আসে। যেখানে উষ্ণ স্রোতের সহিত শীতল স্রোত মিশে, মাছ সেইখানে থামিয়া যায়। এইজন্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও জাপানের নিকটবর্তী সাগরে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

(৫) উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে হিমশৈল গলিয়া গিয়া উহার সঙ্গে আনীত কাদা মাটি, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সমুদ্রতলে জমে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটে এইরূপে মগ্নচড়ার সৃষ্টি হইয়াছে (গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, জর্জেস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি)।

(৬) সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে ঝড়, কুয়াশা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট এবং জাপান-উপকূলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনে প্রায়ই ঝড়-কুয়াশার উৎপত্তি হয়।

সমুদ্রতরঙ্গ—সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রবল বায়ুতাড়নায় তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। জলরাশি একস্থানে উঠানামা করে—তীরে বাধা পাইলে তখনই কেবল জলের অগ্রগতি দেখিতে পাওয়া যায়। তরঙ্গ কখন কখন ৪০।৫০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হইয়া উঠে। জলের ১,৮০০ ফুট নীচে কোন প্রকার তরঙ্গ অনুভব করা যায় না।

জোয়ার ভাঁটা—চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের জল এক জায়গায় ফুলিয়া উঠে, অন্যত্র নামিয়া যায়। সমুদ্রজলের এইরূপ ফুলিয়া উঠাকে **জোয়ার** (high tide) এবং নামিয়া যাওয়াকে **ভাঁটা** (low tide) বলে।

সূর্য ও চন্দ্র, পৃথিবী এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের যাবতীয় পদার্থকে অবিরত আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য আয়তনে বড়, কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত ; চন্দ্র ছোট হইলেও পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। এই চন্দ্রের আকর্ষণ আমরা অধিক অনুভব করি।

ভূ-পৃষ্ঠের **ক**-স্থান চন্দ্রের নিকটতম। অতএব **ক**-স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাধিক। তরল পদার্থ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। অতএব **ক**-স্থানে জল থাকিলে চন্দ্রের আকর্ষণে উহা ফুলিয়া উঠিবে এবং **গ** ও **ঘ**-স্থান হইতে জল আকৃষ্ট হইয়া **ক**-স্থানে জমিবে। ইহাই জোয়ার। **ক**-স্থানের এইরূপ জোয়ারকে **নিকটবর্তী** (near-side) বা **মুখ্য** (primary) জোয়ার বলে। **ক**-স্থানের প্রতিবাদ **খ**-স্থান। চন্দ্র হইতে ভূ-কেন্দ্রের যাহা
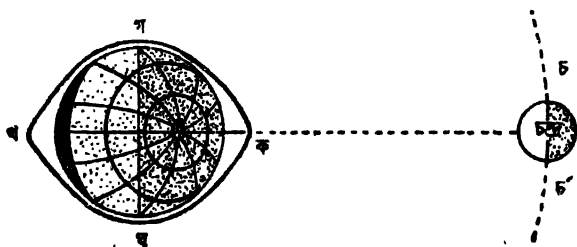
৪৪নং চিত্র—জোয়ার-ভাঁটা

দূরত্ব, **খ**-স্থানের দূরত্ব তদপেক্ষা প্রায় চার হাজার মাইল বেশী। অতএব ভূ-কেন্দ্রে চন্দ্রের যেরূপ আকর্ষণ, **খ**-স্থানে তাহার চেয়ে অনেক কম। **খ**-স্থানের জলতল ভূ-কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ—ওখানকার আকর্ষণ প্রায় ভূ-কেন্দ্রের আকর্ষণেরই মত। অতএব **খ**-স্থানের জলের চেয়ে এ স্থানের জলতলই চন্দ্রের দ্বারা বেশী আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে **খ**-স্থানের জলভাগ স্ফীত হইয়া উঠিবে। এখানেও জোয়ার হয়। এইরূপ জোয়ারকে **দূরবর্তী** (far-side) বা **গৌণ**

জোয়ার বলা হয়। দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী **গ** ও **ঘ**-স্থান হইতে জল সরিয়া যায়। ঐ দুই স্থানে **ভাঁটা**।

প্রতিদিন দুইবার জোয়ার, দুইবার ভাঁটা—পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের সম্মুখে আসে, সেই অংশে এবং তাহার প্রতিপাদ-স্থানে জোয়ার হয়; উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে ভাঁটা নামে। অতএব চন্দ্রের পূর্ণ আবর্তনে প্রতিদিন একই জায়গায় দুইবার ভাঁটা হইয়া থাকে।
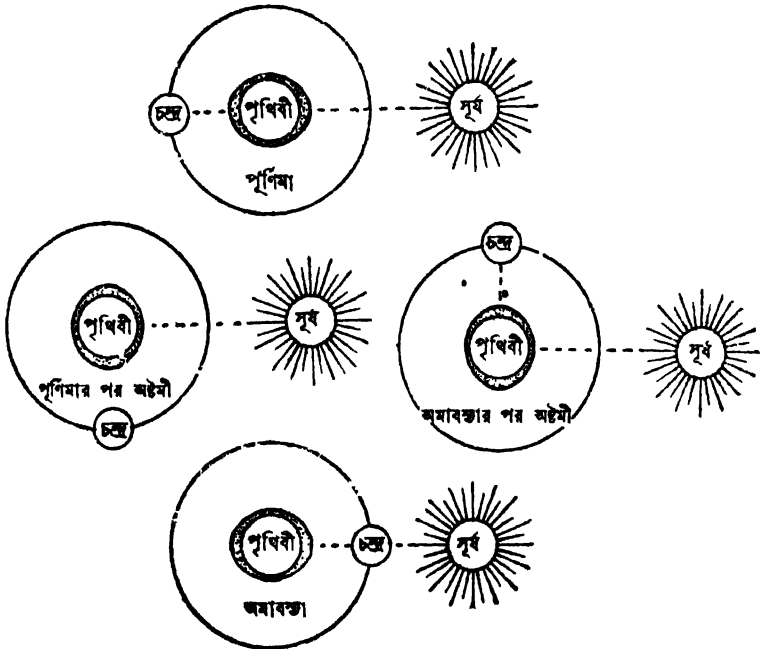
৪৫নং চিত্র—ভরা-কোটাল ও মরা-কোটাল

ভরা-কোটাল ও মরা-কোটাল—অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে উহার সমসূত্রে অবস্থিত। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের তুলনায় কম হইলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ অতিশয় প্রবল হয়। এই সময় যে জোয়ার হয়, তাহাতে জল অত্যধিক স্ফীত হয়। ইহাকে **ভরা-কোটাল** বা

তেজ-কোটাল (spring tide) বলে। পূর্ণিমায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর বিপরীত দিকে হইলেও সমসূত্রে অবস্থিত থাকে। এই সময় চন্দ্রের আকর্ষণে যে জায়গায় জোয়ার হয়, সূর্যের আকর্ষণেও ঠিক সেই জায়গায় জোয়ার আসে। ইহার ফলে পূর্ণিমাতেও ভরা-কোটাল হইয়া থাকে।

অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সমকোণে থাকিয়া পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার, সূর্যের আকর্ষণহেতু সেখানে কিয়ৎ পরিমাণ ভাঁটা হয়; কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ-শক্তি বেশী বলিয়া চন্দ্র ও তাহার বিপরীত দিকে জোয়ার এবং সূর্য ও তাহার বিপরীত দিকে ভাঁটা হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিভিন্ন আকর্ষণের ফলে জল বেশী স্ফীত হইতে পারে না। ইহাকে **মরা-কোটাল** (neap tide) বলে।

জোয়ার-ভাঁটার সময়-ব্যবধান—শুধু পৃথিবী নয়, চন্দ্রও নিজ কক্ষ-পথে ঘুরে। তাই কোন স্থানে একদিন যে সময়ে মুখ্য বা গৌণ জোয়ার হইল পরের দিন ঠিক সেই সময়ে পরবর্তী মুখ্য বা গৌণ জোয়ার হইবে না, ৫২ মিনিট পরে হইবে। চন্দ্র প্রায় ২৭⅓ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। অতএব একদিনে (অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে) চন্দ্র প্রায় ১৩° পথ আগাইয়া আসে। এই পথটুকু অতিক্রম করিয়া চন্দ্রের ঠিক সামনে আসিতে পৃথিবীর ৫২ মিনিট (প্রতি ডিগ্রিতে ৪ মিনিট হিসাবে) সময় লাগে।

জোয়ার-ভাঁটার টান—দূর সমুদ্রে জোয়ার-জল ৩।৪ ফুটের বেশী স্ফীত হয় না, কিন্তু উপকূলের নিকট ইহা কখন কখন ৩০।৪০ ফুট উঁচু হইয়া থাকে; পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তন করে; জোয়ারের স্রোত তাই পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে যায়। এই স্রোত জোয়ার-ভাঁটার টান (tidal current) নামে অভিহিত হয়। নদীমুখে স্রোতের বিপরীত দিকে প্রবেশ করিবার সময় জোয়ারের জল কখন কখন খুব উঁচু হইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হয়; ইহার নাম **বান** (tidal bore)। ভাগীরথী, সালউইন, আমাজন প্রভৃতি নদীর বান খুব প্রচণ্ড।

বাল্টিক ও ভূমধ্যসাগরের চারিদিকেই প্রায় স্থল, সেজন্য সামুদ্রিক জোয়ার-ভাঁটা খুব কমই দেখা যায়।

জোয়ার-ভাঁটার কার্য—(১) জোয়ারের সময় নদীমুখে জল বাড়ে ও জল প্রবলবেগে নদীতে প্রবেশ করে। বড় বড় জাহাজ এই সময়ে সহজে নদীতে ঢুকিতে পারে। আবার যখন ভাঁটার টান শুরু হয়, জাহাজ সেই সঙ্গে অনায়াসে সমুদ্রে নামিয়া আসে। (২) ভাঁটার টানে নদীর আবর্জনা সমুদ্রে গিয়া পড়ে। ইহার ফলে নদীজল নির্মল হয়। (৩) জোয়ার-ভাঁটার টানে নদীর খাত গভীর হয়, মোহনায় পলি জমিতে পারে না। ইহার ফলে নদী নাব্য অবস্থায় থাকে। (৪) জোয়ারের জন্য নদীজল কিয়ৎ পরিমাণে লবণাক্ত হয়, সেইজন্য শীতে সহজে জমিয়া যায় না। (ইংলণ্ডে নদীর কূলে বহু বন্দর এই কারণে তুষারমুক্ত)।

প্রশ্নাবলী

১। সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি কিভাবে হয়? আটলান্টিক মহাসাগরের সমুদ্রস্রোতগুলির একটি বিবরণ দাও।

২। বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে ভারতমহাসাগরের সমুদ্রস্রোতের বর্ণনা করিয়া তাহা বুঝাইয়া লিখ।

৩। সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব কি তাহা উদাহরণসহ লিখ।

৪। সমুদ্রজলের উষ্ণতা, লবণতা ও ঘনত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। জোয়ার-ভাঁটার উপকারিতা কি বল?

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—ভরা-কোটাল, ও মরা-কোটাল, কুরোশিয়ো স্রোত, হিমপ্রাচীর, শৈবাল সাগর, মহীসোপান, মহীঢাল, বান।

দশম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল (atmosphere) পৃথিবীর অংশ। পৃথিবীর আকর্ষণে ইহা ভূ-পৃষ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। পৃথিবীর সহিত ইহাও আবর্তিত হয়। আমাদের মাথার উপরে বহুদূর অবধি ইহার অস্তিত্ব আছে। উহার নিম্নতম অংশ—তিন-চার শত মাইল অবধি—মোটামুটি বায়ুমণ্ডল বলিয়া ধরা হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের ৮ মাইল উপর অবধি ট্রোপোস্ফিয়ার (troposphere)। এই স্তরে তাপ ও তাপের বৈষম্যে বায়ুপ্রবাহের উদ্ভব হয়। ইহার পর আরও ৪০ মাইল দূরে স্ট্রাটোস্ফিয়ার (stratosphere); এই স্তরে বায়ু শীতল ও প্রবাহহীন। ইহার পর (অর্থাৎ ৪৮ মাইল হইতে ১৩০ মাইল অবধি) উদ্‌জান বা হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকে, তাই ইহার নাম হাইড্রোজেনস্ফিয়ার (hydrogensphere)। নীল আকাশের সীমা এই অবধি। ১৩০ মাইল হইতে ৩১০ মাইল অবধি জীয়করোনিয়ম নামক লঘু গ্যাসে পরিপূর্ণ। ইহাকে জীয়করোনিয়মস্ফিয়ার (zyocaroniumsphere) বলে।

বায়ুর উপাদান—বিশুদ্ধ বায়ুতে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ **অম্লজান** (oxygen) গ্যাস, ৭৮ ভাগ **যবক্ষারজান** (nitrogen) ও ১ ভাগ **অঙ্গারাম্ল** (carbon-dioxied) গ্যাস আছে। ইহা ছাড়া উদ্‌জান, হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাসও অল্পাধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। অম্লজান প্রশ্বাসের সহিত প্রাণিদেহে প্রবেশ করিয়া রক্ত পরিষ্কার রাখে; ইহার অভাবে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। উদ্ভিদ যবক্ষারজান হইতে খাদ্য পায়। অঙ্গারাম্ল গ্যাস উদ্ভিদের পুষ্টিবিধানে সাহায্য করে।

বায়ুমণ্ডলে ধূম, ধূলিকণা প্রচুর। সূর্যতাপে ভূ-পৃষ্ঠের জল হইতে অবিরত জলীয় বাষ্প উঠিতেছে। ঐ জলীয় বাষ্প ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া মেঘ, বৃষ্টি ও কুয়াশার সৃষ্টি করে। ধূলিকণা সূর্য হইতে আলো ও তাপ আহরণ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়।

বায়ুর ধর্ম—(১) বায়ু তাপ পাইলে লঘু ও প্রসারিত এবং শৈত্যে ভারী ও সঙ্কুচিত হয়।

(২) বায়ুর উপর যত চাপ পড়ে, ততই উহা ভারী, সঙ্কুচিত ও উষ্ণ হয়; তাপ কমিয়া গেলে লঘু, প্রসারিত ও শীতল হয়।

(৩) জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হালকা।

(৪) উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ু অপেক্ষা বেশী বাষ্প ধারণ করে।

বায়ুমণ্ডলের ভূ-তাপরক্ষণ—পৃথিবী বায়ুমণ্ডলের আবরণে লেপের মতো সর্বাঙ্গ মুড়িয়া তাপ ধরিয়া রাখে। বায়ুমণ্ডলের জলকণা ও ধূলিকণা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিকীর্ণ তাপের কতকটা শোষণ করিয়া রাখে; শীতকালেও রাত্রিবেলা সেই সঞ্চিত তাপ ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ না হইলে সূর্যকিরণের অল্পতায় (অথবা উহার অভাবে) পৃথিবী শীতে জমিয়া যাইতে পারিত।

বায়ুর উষ্ণতা

বায়ুমণ্ডল কি ভাবে উত্তপ্ত হয়?—(ক) সূর্যকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পড়িবার সময় বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ধূলিকণা, জলকণা প্রভৃতি কিরণের সামান্য অংশ শোষণ করিয়া লয়। এই শোষণক্রিয়ার (absorption) ফলে বায়ুমণ্ডল ঈষৎ উত্তপ্ত হয়।

(খ) সূর্যতাপে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে উহার কিছু তাপ ছড়াইয়া পড়িয়া (radiation) বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে।

(গ) উত্তপ্ত-ভূ-পৃষ্ঠের সন্নিহিত বায়ু উষ্ণ ও হালকা। হালকা বায়ু উপরে উঠিয়া যায়, চারিদিক হইতে শীতল ও ভারী বায়ু সেখানে চলিয়া আসে। তাহাও অচিরে উষ্ণ হইয়া উপরে উঠে। এই পরিচলন-ক্রিয়ার (convection) ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর উত্তপ্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলে তাপের তারতম্য—(১) সূর্যরশ্মি যত হেলিয়া পড়িবে, বায়ুমণ্ডল তত কম উষ্ণ হইবে। এইজন্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে উত্তর-দক্ষিণে বায়ুর উষ্ণতা ক্রমশ কম হইয়া যায়। বায়ুর উষ্ণতা সাধারণত নিরক্ষ-প্রদেশেই সর্বাধিক।

(২) যেখানে দিবাভাগ যত বড়, সেখানে সাধারণত তাপ তত বেশী।

(৩) ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যে স্থান যত উঁচু, সেখানকার বায়ু তত বেশী শীতল।

(৪) বায়ুর স্তর যত ঘন ও গভীর হয়, বায়ু তত বেশী উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

(৫) বায়ুতে যত বেশী জলীয় বাষ্প থাকে, বায়ুর তাপ তত কমিয়া যায়। অরণ্যে গাছপালা জলীয় বাষ্প মোচন করে, বায়ু তাহাতে শীতল হয়। আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণে বায়ু উত্তপ্ত হয়। বৃষ্টিপাতে বায়ু শীতল হয়।

যত উপরে উঠি, বায়ুমণ্ডল ততই শীতল হয়। উঁচু জায়গায় সূর্যকিরণ প্রখরতর। তবু নিম্নের কারণগুলির জন্য সমুদ্র-সমতলের বায়ুর চেয়ে উপরের বায়ু অধিক শীতল।

(১) ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ উপরে সামান্যই পৌছে। সেজন্য সেখানকার বাতাস স্বভাবতই বেশী শীতল।

(২) উপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত পাতলা; উহার তাপ ধরিয়া রাখিবার শক্তি কম। আবার শীঘ্র তাপ বিকিরণ করিয়া ঐ বায়ু শীতল হইয়া যায়।

(৪) উপরের বায়ুতে ধূলিকণা কম, সেজন্য তাপ গ্রহণ করিবার শক্তিও উহার কম। প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতায় ১° ফা. উষ্ণতা কমে। উঁচু পর্বতশিখর দারুণ শৈত্যে তাই চিরতুষারাচ্ছন্ন থাকে।

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি অধিক উষ্ণ; মরু অঞ্চলের রাত্রি অধিক শীতল।

রাত্রিবেলা ভূ-পৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়। কিন্তু মেঘ থাকিলে তাপ অধিক দূর যাইতে পারে না—মেঘে আটকাইয়া যায়। এইজন্য মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে গরম বেশি।

মরু অঞ্চলে বায়ু শুষ্ক। ইহা আর্দ্র বায়ুর মতো ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ আটকাইয়া রাখিতে পারে না, তাই রাত্রিবেলা মরু অঞ্চলে অধিক শৈত্য অনুভব করা যায়।

বায়ুপ্রেষ

উপরে, নীচে, চারিপাশে সর্বত্র বায়ু চাপ দেয়। বায়ুর এই চাপকে **বায়ুপ্রেষ** (pressure of wind) বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুপ্রেষ যত, পর্বতচূড়ায় তাহার চেয়ে অনেক কম। উপরের বায়ুস্তর হালকা ও পাতলা। সেইজন্য যত উপরে উঠা যায়, বায়ুপ্রেষ তত কমিতে থাকে। বায়ু উত্তপ্ত হইলে আয়তন বাড়ে, তখন উহার ঘনত্ব কমে; অতএব চাপ কমিয়া যায়। জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা হালকা; অতএব বাতাসে বেশী জলীয় বাষ্প থাকিলে উহা হালকা হইবে এবং চাপও কমিবে। যে বায়ুর চাপ বেশী, তাহাকে **উচ্চপ্রেষ বায়ু** (high pressure wind) এবং যাহার চাপ কম তাহাকে **নিম্নপ্রেষ বায়ু** (low pressure wind) বলে।

বায়ুপ্রবাহ

বায়ুর চলাচল আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। বায়ুপ্রেষের তারতম্য বায়ুপ্রবাহের কারণ। বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে কয়েকটি রীতি লক্ষ্য করা যায়:—

(ক) যেখানে বায়ুর চাপ বেশী (উচ্চপ্রেষ অঞ্চল) সেখান হইতে যেখানে চাপ কম (অর্থাৎ নিম্নপ্রেষ অঞ্চল) সেইদিকে বায়ু প্রবাহিত হয়।

(খ) উচ্চপ্রেষ অঞ্চলের ভারী বায়ু নিম্নস্তর দিয়া নিম্নপ্রেষ অঞ্চলের দিকে এবং নিম্নপ্রেষ অঞ্চলের লঘু বায়ু উর্ধ্বস্তর দিয়া উচ্চপ্রেষ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়।

(গ) পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে আবর্তিত হইতেছে বলিয়া বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বাঁকিয়া যায়। (পৃথিবী যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে মেরুদ্বয় হইতে সোজাসুজি নিরক্ষবৃত্তের দিকে এবং নিরক্ষবৃত্ত হইতে সোজাসুজি মেরুদ্বয়ের দিকে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-উত্তর—কেবলমাত্র এই দুই দিকে বায়ু প্রবাহিত হইত)। এই রীতি **ফেরেলসূত্র** (Ferrel's Law) নামে অভিহিত।

বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, সেই দিকের নাম অনুসারে উহার নামকরণ হয়। উত্তরদিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে উত্তর বায়ু বলে; দক্ষিণ-দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে দক্ষিণ বায়ু বলে।

বায়ুর চাপবলয় (pressure belts)—বায়ুপ্রেষের তারতম্য অনুসারে ভূ-পৃষ্ঠে সাতটি চাপবলয় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(১) **নিরক্ষীয় নিম্ন চাপবলয়** (equatorial low pressure belt)—নিরক্ষ অঞ্চলে সূর্যতাপ অত্যন্ত প্রখর; জলভাগ স্থলভাগের চেয়ে বেশী। এই উভয় কারণে বায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা—তাই বায়ুপ্রেষও খুব কম। লঘু বায়ু নিরন্তর উপরে উঠিতেছে। ঐ আর্দ্র বায়ু হইতে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

বায়ু ঊর্ধ্বগামী বলিয়া এই অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ প্রায়ই অনুভব করা যায় না। তাই অনেক সময় এই অঞ্চলকে **নিরক্ষীয় শান্তবলয়** (equatorial
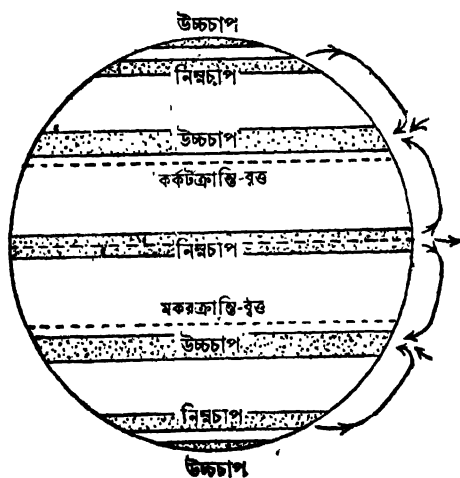
৪৬নং চিত্র—বায়ুবলয়

doldrums) বলে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ৫° অবধি ব্যাপ্ত অঞ্চল এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(২-৩) **কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চ চাপবলয়** (tropical high pressure belts)—নিরক্ষ অঞ্চলের হালকা বায়ু উপরে উঠিয়া গিয়া উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে প্রবাহিত হয়। তারপর ক্রমশ উহা শীতল ও ঘনীভূত হইয়া ভারী হয়। ভারী বাতাস কর্কট ও মকরক্রান্তি বৃত্তের কাছে নামিয়া আসে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সেজন্য বায়ুর উচ্চপ্রেষ।

এই অঞ্চলদ্বয়ের বায়ু নিম্নগামী ; ইহা ভিন্ন অন্য দিকে বায়ুপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে **ক্রান্তীয় শান্তবলয়** (tropical calms) বলা হইয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে ৩০° হইতে ৩৫° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত।

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর এই ক্রান্তীয় শান্তবলয় অশ্বাক্ষ (Horse latitude) নামে অভিহিত হয়। সেকালে পালের জাহাজে সমুদ্রে গমনাগমন চলিত। অনেক জাহাজ কর্কটক্রান্তীয় বলয়ে আসিয়া বায়ুপ্রবাহের অভাবে অচল হইত। পানীয় জলের অভাবে এই সময়ে জাহাজে আনীত বহু অশ্ব সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইত। সেই ঘটনা হইতে এই বিচিত্র নামকরণ।

নিম্নগামী বায়ুপ্রবাহে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হয়, সেইজন্য এই দুই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম। পৃথিবীর অধিকাংশ মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

(২-৫) **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নিম্ন চাপবলয়** (temperate low pressure belts)—সুমেরু ও কুমেরু হইতে প্রবাহিত শীতল বায়ু পৃথিবীর আবর্তনের ফলে ছিটকাইয়া ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে যায়। এইজন্য মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে (উত্তর ও দক্ষিণে ৬০° হইতে ৭০° অক্ষাংশ মধ্যে) বায়ুর চাপ কম।

(৬-৭) **মেরুস্থানীয় উচ্চ চাপবলয়** (polar high pressure belts)—মেরুপ্রদেশে অত্যধিক শীত ; সূর্যকিরণেরও প্রখরতা নাই। সেইজন্য বাতাস ভারী ও জলীয়বাষ্পশূন্য। এইজন্য বায়ুপ্রেষ এই অঞ্চলে বেশী।

বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহ

বায়ুপ্রবাহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) **নিয়ত বায়ু** (constant or planetary winds)—সারাবৎসর একদিকে প্রবাহিত হয়। আয়ন, প্রত্যায়ন ও মেরুবায়ু এই শ্রেণীর।

(২) **সাময়িক বায়ু** (seasonal winds)—সর্বদা প্রবাহিত হয় না ; বিশেষ বিশেষ সময়ে দেখা দেয়। স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু ও মৌসুমীবায়ু এই শ্রেণীর।

(৩) **আকস্মিক বায়ু** (irregular winds)—হঠাৎ আবির্ভূত হয়। ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ-ঘূর্ণবাত এই শ্রেণীর।

(৪) **স্থানীয় বায়ু** (local winds)—স্থানীয় কারণে প্রবাহিত হয়। লু, সাইমুম, সিরোক্কা প্রভৃতি এই শ্রেণীর।

নিয়ত বায়ু

আয়ন বায়ু (trade winds)—কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে বায়ু সর্বদাই নিরক্ষীয় নিম্ন চাপবলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব বায়ুতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব
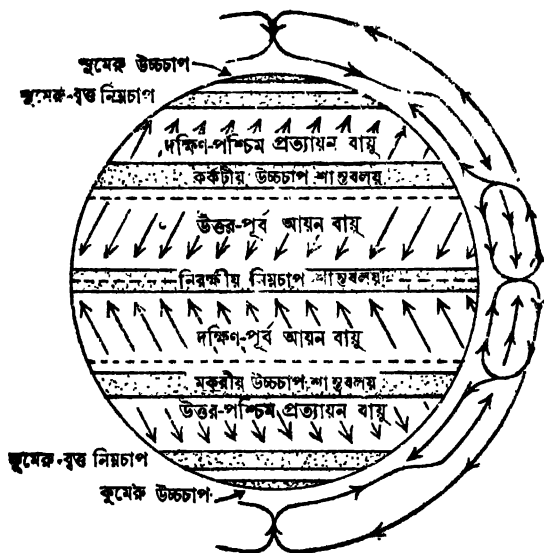
৪৭নং চিত্র—নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

বায়ুতে পরিণত হয়। উহারা যথাক্রমে **উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু** (N.-E. trade winds) ও **দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু** (S.-E. trade winds) নামে অভিহিত হয়। সেকালে পালের জাহাজে ব্যবসা-বাণিজ্য হইত। এই সুনির্দিষ্ট ও নিয়মিত বায়ুপ্রবাহে বাণিজ্য-জাহাজ চালাইবার সুবিধা হইত বলিয়া ইংরেজীতে

trade winds (বাণিজ্য বায়ু) এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ১০ মাইল ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর বেগ ঘণ্টায় ১৪ মাইল।

প্রত্যায়ন বায়ু (anti-trade winds)—কর্কটীয় উচ্চ চাপবলয় হইতে একটি উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ সুমেরুবৃত্ত নিম্ন চাপবলয়ের দিকে এবং মকরীয় উচ্চ চাপবলয় হইতে অপর একটি উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ কুমেরুবৃত্ত নিম্ন চাপবলয়ের দিকে ধাবিত হয়। ফেরেলসূত্র অনুসারে উহারা যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। আয়ন বায়ুর বিপরীতমুখী বলিয়া এই বায়ু-প্রবাহ দুইটির নাম **প্রত্যায়ন বায়ু**। ইহাকে **পশ্চিমা বায়ু** নামেও অভিহিত করা হয়। উত্তর গোলার্ধের বায়ু **দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু** (S.-W. anti-trade winds) এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বায়ু **উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু** (N.-W. anti-trade winds) নামে অভিহিত হয়।

উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ অধিক ; ভূ-পৃষ্ঠের অসমতা ও স্থানীয় বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর গতি ও বেগ নিয়ত পরিবর্তিত হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু দক্ষিণ গোলার্ধে প্রধানত জলভাগের উপরে প্রবহমান। সেইজন্য ইহা অধিক পরিবর্তনশীল নহে। ৪০° ও ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে ইহা খরবেগে সোজা পশ্চিমদিক হইতে আসে, তাই ইহাকে **প্রবল পশ্চিমা** (brave westerlies) বলে। এই অঞ্চল (বিশেষভাবে ৪০° অক্ষাংশ) গর্জনশীল চল্লিশা (roaring forties) নামে অভিহিত হয়।

মেরুবায়ু (polar winds) একটি উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ সুমেরু উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে সুমেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে এবং একটি দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ কুমেরু উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে কুমেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে সারা বৎসর ধাবিত হয়। ইহাদিগকে যথাক্রমে **সুমেরু বায়ু** (north polar winds) ও কুমেরু বায়ু (South polar winds) বলে। এই বায়ু শুষ্ক ও শীতল।

চাপ ও বায়ুবলয়ের স্থান-পরিবর্তন

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে সূর্যকিরণ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উষ্ণমণ্ডলের নানা অংশে লম্বভাবে পড়ে। সর্বোচ্চ তাপরেখা (heat equator) সেইজন্য

উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে সরিয়া যায়। চাপবলয় ও নিয়ত বায়ুবলয়গুলিও সেই সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে সরে (সূর্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে ২৩½° সরিয়া গেলেও এই
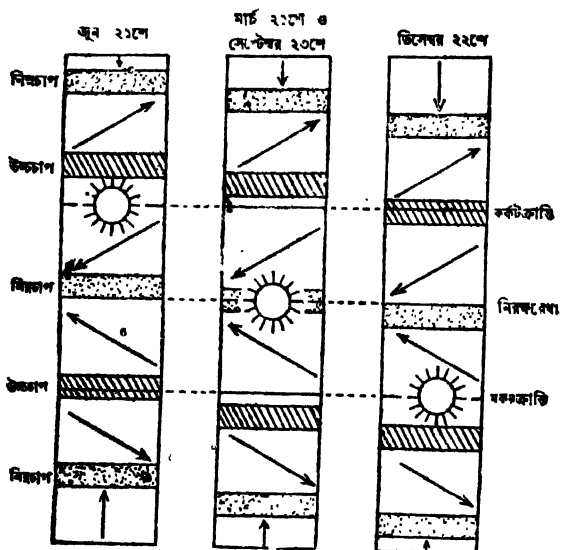
৪৮নং চিত্র—চাপ ও বায়ুবলয়ের স্থান পরিবর্তন

বলয়গুলি মাত্র ৫° সরে)। এই কারণে উত্তর গোলার্ধে ৪০—৪৫° অক্ষাংশে শীতে পশ্চিমা-বায়ু ও গ্রীষ্মে আয়ন বায়ু বহে। এই অঞ্চলে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টি হয়।

সাময়িক বায়ু

স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু—স্থল জলের চেয়ে শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। দিনের বেলা সূর্যকিরণে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল উত্তপ্ত হইলে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে; বায়ুপ্রেষ কমিয়া যায়। তখন সমুদ্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও উচ্চপ্রেষ বায়ু স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাই **সমুদ্রবায়ু** (sea breeze)। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বেগ বাড়ে; অপরাহ্নে ইহা প্রবলতম হয়।

স্থল জলের তুলনায় শীঘ্র তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়ে। সেইজন্য সন্ধ্যা হইতে স্থলবায়ু দ্রুত শীতলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমুদ্রজল সারাদিনের উত্তাপে বেশ উষ্ণ থাকে। অতএব সমুদ্র অতঃপর নিম্নপ্রেষ হইয়া পড়ে। তখন স্থল হইতে শীতলবায়ু নিম্নপ্রেষ সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। ইহাকে **স্থলবায়ু** (land breeze) বলে। স্থলবায়ু রাত্রিশেষে প্রবলতম হয়। ক্রমশ
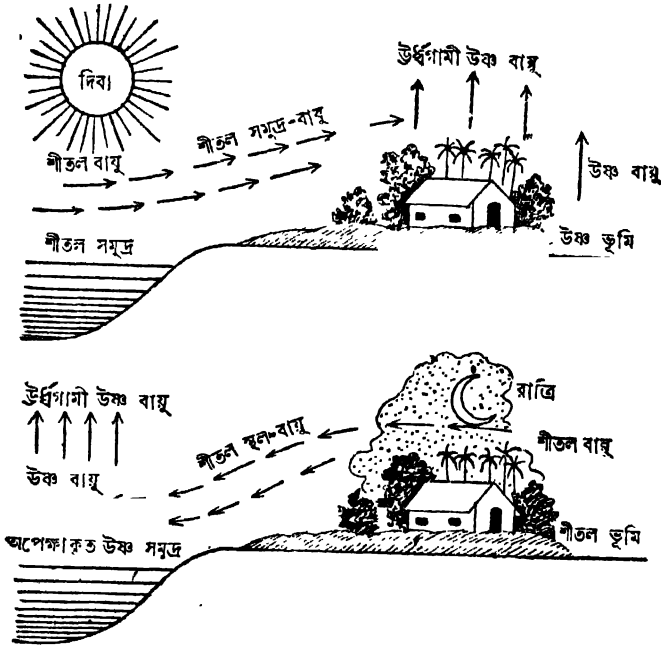
৪৯ নং চিত্র—সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু

স্থল ও জলের বায়ুর উষ্ণতা সমান হইয়া আসে। তখন বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়।

সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর প্রভাবে সমুদ্র উপকূলে ও বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলে জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও আরামপ্রদ হইয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলেও উপত্যকা ও শৃঙ্গগুলির মধ্যে ঐ প্রকার বায়ুর চলাচল দেখা যায় (ridge and valley wind)।

মৌসুমী বায়ু (monsoon winds)—'মৌসুমী' আরবী কথা; ইহার অর্থ 'ঋতু'। মৌসুমী বায়ু বিশেষ বিশেষ ঋতুতে প্রবাহিত হয়; সেইজন্য এই নামকরণ। ইহা স্থলবায়ুর ও সমুদ্রবায়ুর সুবৃহৎ রূপান্তর বিশেষ।

উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন সূর্য কর্কটক্রান্তীয় অঞ্চলে (দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য আফ্রিকার উত্তর ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগ, মেক্সিকো প্রভৃতি) লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই সব স্থানে (মহাদেশীয় অঞ্চলে) বায়ুও হালকা হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয়, বায়ুপ্রেষ অত্যন্ত কমিয়া যায়। সমুদ্রের উপরিভাগের বায়ু তখনও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ থাকে। তাই সমুদ্র অঞ্চলে উচ্চপ্রেষ বায়ু থাকে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ ঐ বায়ু নিম্নপ্রেষ স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের হেতু ফেরেলসূত্র অনুযায়ী এই বায়ু নিরক্ষবৃত্ত পার হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে বহিতে থাকে। ইহাকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু** (South-West monsoons) বলে। ইহার প্রভাবে মেক্সিকোয়, আফ্রিকার গিনি উপকূলে, ভারতে, পাকিস্তানে, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

মধ্য এশিয়ায় নিম্নপ্রেষ-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এইজন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) এবং চীন ও জাপানের দক্ষিণাংশের উপর দিয়া বহিয়া যায় এবং **দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু** (South-East monsoons) নামে অভিহিত হয়।

মৌসুমীবায়ু বামাবর্তে (ঘড়ির কাঁটা যেদিকে চলে তাহার উল্টা দিকে) মধ্য এশিয়ার নিম্নপ্রেষ-কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়।

উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল (অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল) তখন সূর্য মকরক্রান্তীয় অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। তখন মধ্য এশিয়ার স্থলদেশে তাপ কমিয়া যাওয়ায় উচ্চ-চাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয়; এখানকার উচ্চপ্রেষ বায়ু দক্ষিণ অভিমুখে বহিতে থাকে। ফেরেলসূত্র অনুসারে ইহা সোজা উত্তর হইতে না আসিয়া উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবাহিত হয়। ইহার নাম **উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু** (North-East monsoons)। স্থলভাগ হইতে আসে বলিয়া এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প সামান্যই থাকে তাই তখন ইহা উত্তর ভারতের উপর

১৮০°
৯০°
0°
৯০°
৬৬½°
২৩½°
ক্যারিবিয়ান অঞ্চল
বিষুব রেখা
ব্রাজিলের পূর্ব ভাগ
আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সমভূমি
দঃ পূর্ব এশিয়া
উঃ অষ্ট্রেলিয়া এবং পূঃ কুইন্সল্যাণ্ড
মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল

৫০নং চিত্র

দিয়া বহে, তখন বৃষ্টিপাত কমই হয়। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। তারপর যখন ইহা দক্ষিণ মাদ্রাজ ও সিংহলের পূর্ব উপকূলে পৌঁছে, সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য মাদ্রাজ ও সিংহলে বৎসরে দুই বার বর্ষা হয়।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু নিরক্ষবৃত্ত পার হইলে ফেরলসূত্র অনুসারে **উত্তর পশ্চিম মৌসুমীবায়ুতে** পরিণত হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল অস্ট্রেলিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যতাপে এই সময়ে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার বায়ুপ্রেষ কমিয়া যায়। ফলে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু এই দিকে ধাবিত হয়; ইহার ফলে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

আকস্মিক বায়ু

ঘূর্ণবাত (Cyclone)—কোন অল্পপরিসর স্থান কোন কারণে হঠাৎ যদি উত্তপ্ত হয়, সেখানকার বায়ু উষ্ণ ও হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেখানে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন চারিদিককার উচ্চচাপ-স্থানের শীতল ও ভারী বায়ু প্রবলবেগে ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া আসে; ঘুরিতে ঘুরিতে
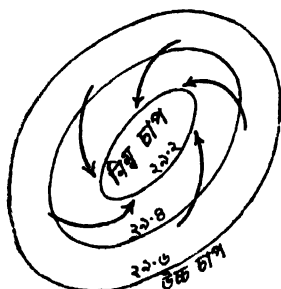
ঘূর্ণবাত (উঃ গোলার্ধ)
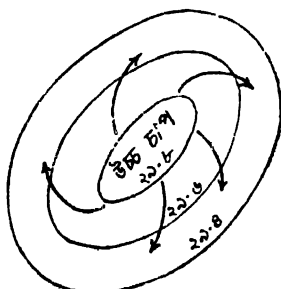
প্রতীপ ঘূর্ণবাত (উঃ গোলার্ধ)

৫১নং চিত্র

কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এই বায়ু উত্তর গোলার্ধে **বামাবর্তে** (ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে তাহার উল্টা দিকে) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে (ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে) ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেন্দ্রের দিকে আসে। কেন্দ্রে পৌঁছিয়া

উষ্ণবায়ুর সঙ্গে ইহার উপরে উঠে এবং চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বগামী এই সকল বায়ুকে ঘূর্ণবাত বলে।

ঘূর্ণবাত এক জায়গায় স্থির থাকে না। ঘুরিতে ঘুরিতে উহা বহুদূরে চলিয়া যায়—এবং গমনপথে যাহা পড়ে, ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হয়। কেন্দ্রের বায়ু উপরে উঠিয়া প্রসারিত ও শীতল হইলে উহার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বারিবর্ষণ করে। অতএব ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে ঝড়-বৃষ্টি দুই-ই হয়। ঘূর্ণবাত আসন্ন হইলে বায়ুপ্রেষ হঠাৎ কমিয়া ব্যারোমিটারের পারদ দ্রুত নামিতে থাকে। লোকে ইহা হইতে সাবধান হইতে পারে।

সমুদ্রের উপর দিয়া যাইবার সময় ঘূর্ণবাত অনেক সময় স্তম্ভের আকারে জলরাশি উর্ধ্বে তুলিয়া **জলস্তম্ভ** (waterspouts) সৃজন করে। মরুভূমির উপরে অনুরূপভাবে **বালুকাস্তম্ভ** (sandspouts) সৃষ্ট হয়।

ইহা চীন সমুদ্রে **টাইফুন** (typhoon), বঙ্গোপসাগরে **সাইক্লোন** (cyclone), পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে **হ্যারিকেন** (harricane) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে **কালবৈশাখী** ও আশ্বিনের ঝড় ঘূর্ণবাত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রতীপ-ঘূর্ণবাত (anti-cyclone)—হঠাৎ কোথাও বায়ুপ্রেষ অত্যধিক বাড়িয়া গেলে সেখানকার বায়ু নীচের দিকে নামে। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি আসিলে বায়ু কেন্দ্র ছাড়িয়া বাহিরের নিম্নচাপের দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হয়। নিম্নগামী ও বহির্মুখী এই বায়ু প্রতীপ ঘূর্ণবাত নামে অভিহিত হয়। ইহার গতি উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে (ঘূর্ণবাতের ঠিক উল্টো)। দুইটি ঘূর্ণবাতের মাঝে একটি প্রতীপ ঘূর্ণবাত দেখা যায়।

ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ-ঘূর্ণবাতের পার্থক্য

১। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে নিম্নচাপ, বাহিরে উচ্চচাপ ; বায়ু কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বগামী। প্রতীপ-ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রে উচ্চচাপ, বাহিরে নিম্নচাপ ; বায়ু বহির্মুখী ও নিম্নগামী।

২। ঘূর্ণবাতের 'গতি উত্তর গোলার্ধে বামাবর্তে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে। প্রতীপ-ঘূর্ণবাতের গতি উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে।

৩। ঘূর্ণবাত দ্রুতগতি, প্রচণ্ডশক্তি, কিন্তু অল্পক্ষণস্থায়ী; নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘূর্ণবাত বৃহৎ ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রতীপ-ঘূর্ণবাত ধীরগতি, ক্ষীণশক্তি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী।

৪। ঘূর্ণবাতের ফলে গ্রীষ্মকালে ঝড়-বৃষ্টি এবং শীতকালে শীতল স্থানে তুষারপাত হয়। প্রতীপ-ঘূর্ণবাতের ফলে আকাশ গ্রীষ্মকালে নির্মল এবং শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে।

টর্ণেডো (Tornedo)—অল্পস্থানে সীমাবদ্ধ প্রচণ্ডশক্তি ঘূর্ণবাতকে টর্ণেডো বলে। ইহার কেন্দ্রে বায়ুপ্রেষ অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং উচ্চপ্রেষ হইতে বায়ু সেইদিকে প্রবলবেগে ধাবিত হয়। ইহার ধ্বংসক্ষমতা অতিশয় ভয়াবহ। কিন্তু ইহা অল্পক্ষণস্থায়ী।

স্থানীয় বায়ু

স্থানীয় কারণে কখন কখন বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। দেশ-বিভেদে স্থানীয় বায়ুর বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। সাহারা মরুভূমি হইতে প্রবাহিত বায়ুর

৫২নং চিত্র

নাম মিশরে **খমসিন** (khamsin), সিসিলিতে **সিরক্কো** (sirocco), স্পেনে **সোলানো** (solano), আল্পসের উপত্যকায় **ফন** (fohn), গিনি উপকূলে **হারমাট্টান** (harmattan)। রকি পর্বতের বায়ু **চিনুক** (chinook),

আরব মরুভূমির বায়ু বা **সাইমুম** (simoom), দক্ষিণ আমেরিকার মরুপ্রায় অঞ্চলের বায়ু **পাম্পেরো** (pampero) নামে অভিহিত হয়।

বায়ুপ্রবাহের ফল—বায়ুপ্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠে কতক পরিমাণে তাপসমতা রক্ষা করে। নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ বায়ু উচ্চ অক্ষাংশের দিকে তাপ এবং উচ্চ অক্ষাংশের শীতল বায়ু নিম্ন অক্ষাংশের দিকে শৈত্য বহন করিয়া আনে। সমুদ্রবায়ু তটভূমির জলবায়ু সমভাবাপন্ন করে।

নিয়তবায়ু সমুদ্রস্রোত নিয়ন্ত্রিত করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেয়। বায়ুশক্তিতে অনেক দেশে নানাপ্রকার কল চালানো হয়।

জলীয়বাষ্পময় শীতল প্রদেশের উপর দিয়া যাইবার সময়, অথবা পাহাড়-পর্বতে বাধাগ্রস্ত হইলে কিংবা ঊর্ধ্বগামী হইলে বৃষ্টিপাত হয়।

বৃষ্টি—সূর্যতাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় ও বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। বায়ু যত উষ্ণ হয়, উহার জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা তত বাড়ে; শীতল হইলে জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা কমিয়া যায়। কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুর যতটা জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা আছে ঐ পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাকিলে তাহাকে **পরিপৃক্ত বায়ু** (saturated air) বলে।

জলীয় বাষ্প বায়ুর চেয়ে হালকা। অতএব পরিপৃক্ত বায়ুও সাধারণ বায়ুর চেয়ে হালকা। উহা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের শীতল ও নিম্নপ্রেষ বায়ু-মণ্ডলের সংযোগে উহা ক্রমশ শীতল ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। বায়ু তখন জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না, জলীয় বাষ্প বিচ্ছিন্ন হইয়া সূক্ষ্ম জলকণার আকারে বায়ুমণ্ডলের ধূলি আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাই **মেঘ**।

মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। মেঘের জলকণা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া বৃহত্তর জলবিন্দুতে পরিণত হয়। বায়ু অপেক্ষা ভারী হইয়া গিয়া তখন আর আকাশে ভাসিতে পারে না, বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে। সকল মেঘে বৃষ্টিপাত হয় না; কোন কারণে জলকণা উত্তপ্ত হইলে আবার বাষ্প হইয়া যায়।

অতএব বৃষ্টিপাত প্রধানত তিনটি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল—(১) জলের বাষ্প হইয়া যাওয়া, (২) জলীয় বাষ্প ধারণ করিয়া বায়ুর পরিপৃক্ত হওয়া, এবং (৩) ঐ পরিপৃক্ত বায়ুর শীতল হওয়া।

চারি উপায়ে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে ঃ—

(১) জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু লঘু বলিয়া উপরে উঠে এবং প্রসারিত ও শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহাকে **পরিচলন-বৃষ্টি** (convectional rain) বলে। নিরক্ষ অঞ্চলে সূর্যতাপ বেশী, জলভাগও বেশী, তাই সেখানকার জল অধিক পরিমাণে বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাতাস উর্ধ্বগামী হয়। এই অঞ্চলে সারা বৎসর ঘন ঘন পরিচলন-বৃষ্টি হইয়া থাকে।

(২) পরিপৃক্ত বায়ু পর্বতগাত্রে বাধা পাইলে উপরে উঠে। পর্বতশিখরে তুষার থাকিলে তাহার সংস্পর্শে কিংবা উপরে উঠিবার কালে ঐ বায়ু শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত হয়। ইহাকে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (relief rain) বলে। ভারতের হিমালয়, পশ্চিমঘাট পর্বত ও আসামের পাহাড়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু প্রতিহত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির পর বায়ুতে আর অধিক জলীয় বাষ্প থাকে না। ঐ বায়ু পর্বত পার হইয়া অপর পার্শ্বে যায়; কিন্তু সেখানে বৃষ্টি হয় না।
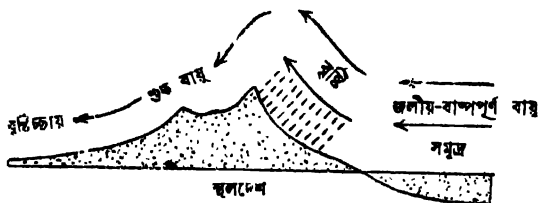
৫৩নং চিত্র—শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিচ্ছায়

বৃষ্টিবিরল ঐ অঞ্চলকে **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল** (Rain-shadow area) বলে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। শিলং জয়ন্তিয়া পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া চেরাপুঞ্জি অপেক্ষা বৃষ্টিপাত এখানে অনেক কম।

পর্বতের যে দিকে বায়ু প্রতিহত হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় তাহাকে **প্রতিবাত পার্শ্ব** (windward side) এবং বিপরীত দিককে **অনুবাত পার্শ্ব** (leeward side) বলে।

(৩) ঘূর্ণিবাতের কেন্দ্রদেশে নিম্নপ্রেষ। পরিপৃক্ত বায়ু সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া উপরে উঠে, তারপর শীতল হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহাকে **ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি** (cyclonic rains) বলে।

(৪) বিশাল বন অঞ্চলে সূর্যতাপের দ্বারা বায়ু পরিপৃক্ত হইয়া পড়ে। এই বায়ু উষ্ণ ও হাল্কা হইয়া উপরে উঠিলে বৃষ্টি হয়। ইহাকে **বন অঞ্চলের বৃষ্টি** বলা যাইতে পারে।

রাত্রিবেলা ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইলে উহার সংস্পর্শে বায়ুস্তরও শীতল হয়। তখন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর আকারে ঘাসপাতায় লাগিয়া থাকে। ইহাই **শিশির** (dew)। শীতপ্রধান দেশে শিশির পড়িয়া কঠিন হয়। ইহাকে **তুহিন** (frost) বলে।

জলীয় বাষ্প কখন কখন ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা আশ্রয় করিয়া ধোঁয়ার আকারে ভাসে। ইহাকে **কুয়াসা** (mist) বলে। কুয়াসাই অতি উচ্চে ভাসমান হইলে মেঘরূপে প্রতিভাত হয়। কুয়াসার জলকণা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে ইংরেজীতে তাহাকে **ফগ** (fog) বলা হয়। ঝড়ের সময় বৃষ্টিবিন্দু কখন কখন নীচে না পড়িয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়; এবং জমিয়া কঠিন হয়। ইহাকে **শিলা** বা **করকা** (hail) বলে। শীতপ্রধান দেশে ও পর্বত অঞ্চলে অনেক সময় জলকণা জমিয়া **তুষার** হয়; তখন আর বৃষ্টিপাত হয় না—**তুষারপাত** (snowfall) হয়।

জলবায়ু

কোন স্থানের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, সূর্যালোকের পরিমাণ, বায়ুপ্রেষ এবং বায়ুপ্রবাহের প্রকৃতি ইত্যাদির সমষ্টিগত অবস্থাকে সেই স্থানের **আবহাওয়া** (weather) বলা হয়। কোন স্থানের আবহাওয়ার ত্রিশ বা ততোধিক বৎসরের গড়ফলকে (average) সেই স্থানের **জলবায়ু** বলা হয়। জলবায়ু নিম্নের কয়েকটি অবস্থার উপর নির্ভরশীল :—

(১) **অক্ষাংশ**—অক্ষাংশ অনুযায়ী সূর্যকিরণ কোথাও সোজাভাবে কোথাও বা হেলিয়া পড়ে। হেলিয়া পড়িলে উত্তাপ কম হয়। এইজন্য যে

স্থান নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে সেখানকার জলবায়ু তত শীতল। নিরক্ষবৃত্ত হইতে প্রতি ১° দূরবর্তী স্থানে গড়ে ½° উষ্ণতা কমিয়া যায়।

(২) **উচ্চতা**—উঁচু জায়গার বায়ু নীচু জায়গার চেয়ে শীতলতর (কারণ সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে প্রতিহত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।) প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতায় ১° ফা. উষ্ণতা কমে। এলাহাবাদ (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ৩,২০০ ফুট) ও শিলং (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা ৫,০০০ ফুট) প্রায় একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত ; তবু উচ্চতার জন্য শিলং বেশী শীতল।

(৩) **সমুদ্র হইতে দূরত্ব**—গ্রীষ্মে সমুদ্রজল স্থলভাগের চেয়ে কিছু শীতল থাকে। শীতের সময় অপেক্ষাকৃত গরম। তাই উপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু **সমভাবাপন্ন** (equable)। যে জায়গা সমুদ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, সেখানকার জলবায়ু **চরম** (extreme)। বোম্বাই বন্দরের দৈনিক তাপের পার্থক্য যখন ১০° ফা. তখন সমুদ্র হইতে ৮০০ মাইল দূরবর্তী লাহোরে তাপপার্থক্য ১৫° হইতে ২০° ফা.।

(৪) **বায়ুপ্রবাহ**—উষ্ণ দেশের উপর দিয়া শীতল বায়ু বহিলে উত্তাপ হ্রাস পায় ; স্থান শীতল হয়। শীতল দেশের উপর দিয়া উষ্ণ বায়ু বহিয়া গেলে শীতের তীব্রতা কমে। আল্পস্ পর্বতের উপত্যকাগুলিতে শীতকালে ফন (fohn) নামে একপ্রকার বায়ু বহে। উহার প্রভাবে তুষারাচ্ছন্ন দেশে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৩° ফা. পর্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে।

(৫) **বৃষ্টিপাত**—বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিলে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তাপ কমে। ভারতে জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া জুন মাস অপেক্ষা ঐ মাস কম উষ্ণ। বৃষ্টিপাতের জন্যই নিরক্ষীয় অঞ্চলে গরম অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

(৬) **সমুদ্রস্রোত**—উপকূলভাগে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত বহিলে সেই অঞ্চলের উত্তাপ কতকটা বাড়িয়া যায় ; শীতল সমুদ্রস্রোত বহিয়া গেলে শীত বাড়ে। লাব্রাডর উপদ্বীপের চেয়ে নরওয়ে উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত। শীতল স্রোতের প্রভাবে লাব্রাডর উপকূলে বরফ জমে, কিন্তু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের ফলে নরওয়ে উপকূল শীতকালেও তুষারমুক্ত থাকে।

(৭) **ভূমির বন্ধুরতা**—উষ্ণ বা শীতল বায়ুর গতিপথে যদি পর্বত থাকে, উহা আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার ফলে বিপরীত পার্শ্বের দেশ উষ্ণতা বা শৈত্য হইতে রক্ষা পায়। মধ্য-এশিয়ার শীতল বায়ু হিমালয়ে বাধা পায় বলিয়া ভারতে শীত প্রবল হইতে পারে না। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু হিমালয়ে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে বৃষ্টিপাত ঘটায়, পর্বতের উত্তরদিকে বৃষ্টিপাত কম হয় না। এইজন্য ভারতের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; কিন্তু মধ্য-এশিয়ার জলবায়ু শুষ্ক ও শীতল।

(৮) **ভূমির ঢাল**—যেখানে ভূমির ঢাল সূর্যের দিকে, সেখানে লম্বভাবে সূর্যকিরণ পড়ে; ইহার ফলে সেই স্থান বেশী উষ্ণ হয়। ঢাল যদি সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, সূর্যকিরণ হেলিয়া পড়িবে। ফলে উষ্ণতা কম হইবে।

(৯) **ভূমির প্রকৃতি**—মৃত্তিকা শিলাময় বা বালুকাময় হইলে সেই স্থান অতি শীঘ্র উত্তপ্ত ও শীতল হয়। পলিগঠিত ও উদ্ভিদময় মৃত্তিকা বেশী উত্তপ্ত বা বেশী শীতল হইতে পারে না। মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে সেইজন্য দিবাভাগে অধিক উষ্ণতা, রাত্রে অধিক শৈত্য। কিন্তু পলিগঠিত বঙ্গদেশ দিনে বেশী উত্তপ্ত কিংবা রাত্রে বেশী শীতল হয় না।

(১০) **অরণ্যের অবস্থান**—যেখানে ঘনজঙ্গল, সেখানে জলীয় বাষ্প সহজে ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র।

প্রশ্নাবলী

১। বায়ুমণ্ডল কাহাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর কি কি? বায়ুর উপাদান ও বায়ুর ধর্ম সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। বায়ুর চাপ বলিতে কি বুঝ? পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন চাপ-বলয়ের একটি বর্ণনা দাও।

৩। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ কাহাকে বলে? এই সকল বায়ুপ্রবাহের সহিত চাপবলয়ের কি সম্বন্ধ তাহা চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৪। মৌসুমী বায়ু বলিতে কি বুঝ? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই বায়ু প্রবাহিত হয়? এই বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি কিভাবে হয় চিত্র অঙ্কন করিয়া তাহা বর্ণনা কর।

৫। বৃষ্টিপাতের কারণ কি? কি কি উপায়ে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে তাহা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬। 'জলবায়ু' ও 'আবহাওয়ার' মধ্যে পার্থক্য কি? কি কি অবস্থার উপর কোন স্থানের জলবায়ু নির্ভর করে বল।

৭। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির এক-একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও—

(ক) যত উপরে উঠা যায় বায়ুমণ্ডল তত শীতল হয় কেন?

(খ) মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি অধিক উষ্ণ থাকে কেন?

(গ) মরু অঞ্চলের রাত্রি শীতল হয় কেন?

(ঘ) পর্বতের অনুবাত পার্শ্বে বৃষ্টিপাত কম হয় কেন?

৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু, সুমেরু বায়ু, ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত, টর্ণেডো, সিরক্কো, চিনুক, পরিপৃক্ত বায়ু, বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল, শিশির।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক বিভাগ

প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ অতি নিবিড়। ভূ-প্রকৃতি, ভূ-গঠন, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, খনিজ, কৃষিসম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে এই সকল আবেষ্টনের সমষ্টিগত প্রভাব এবং মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীও মোটামুটি একই ধরনের সেই অঞ্চলকে একটি **প্রাকৃতিক বিভাগ** (natural region) বলা হয়।

মানুষের জীবনের উপর জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। তজ্জন্য জলবায়ু এবং উদ্ভিজ্জের প্রভাব অনুযায়ী পৃথিবীকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। **হিমমণ্ডল** (Cold Zone)

২। **তুন্দ্রা অঞ্চল** (Tundra Region)

৩। **হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল** (Cool Temperate Zone)

(ক) পশ্চিমভাগে—**বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর অঞ্চল** (British Type)

(খ) মধ্যভাগে—**সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Siberian Type)

(গ) পূর্বভাগে—**লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Laurentian Type)

৪। **উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল** (Warm Temperate Zone)

(ক) পশ্চিমভাগে—**ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Mediterranean Type)

(খ) মধ্যভাগে—**শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল** (Temperate Grassland) বা **স্টেপভূমি অঞ্চল** (Steppes Type)

(গ) পূর্বভাগে—**চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল** China Type) বা **শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল** (Temperate Monsoon Lands)

৫। **ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল** (Tropical Hot Zone)

(ক) পশ্চিমভাগে—**উষ্ণ মরু অঞ্চল** (Hot Deserts) বা **সাহারীয় জলবায়ুর অঞ্চল** (Sahara Type)

(খ) মধ্যভাগে—**সুদানী জলবায়ু অঞ্চল** (Sudan Type) বা **উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল** (Tropical Grasslands)

(গ) পূর্বভাগে—**মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চল** (Monsoon Type)

৬। **নিরক্ষীয় অঞ্চল** (Equatorial Type)

১। হিমমণ্ডল (Cold Zone)

বিস্তার—সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত হইতে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অংশকে উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলে।

জলবায়ু—সুমেরু ও কুমেরুর চতুর্দিকস্থ অংশে শীত খুব বেশী, গ্রীষ্মকালেও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের উপরে উঠে না।

উদ্ভিজ্জ—এখানে কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মে না বলিলেই চলে। এ অঞ্চলকে তুষার মরু অঞ্চল (Ice Cap Region or Cold Desert) বলা যাইতে পারে।

জীবজন্তু—এই অঞ্চলে সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতি জীবজন্তু পাওয়া যায়।

অধিবাসী—এ অঞ্চল মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে কোন স্থায়ী মনুষ্যবসতি নাই। সময় সময় শিকারীরা সিন্ধুঘোটক, সীল প্রভৃতির সন্ধানে এ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ায়।

২। তুন্দ্রা অঞ্চল (Tundra Region)

বিস্তার—উত্তর গোলার্ধে তুষার মরু অঞ্চলের দক্ষিণে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর ভাগ ব্যাপিয়া তুন্দ্রা অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ গোলার্ধে যে সমাক্ষরেখায় তুন্দ্রাভূমি থাকার কথা তথায় বিশাল সমুদ্র রহিয়াছে, তাই দক্ষিণ গোলার্ধে তুন্দ্রা অঞ্চল নাই। এই অঞ্চলের দক্ষিণ সীমা কখনও সুমেরু বৃত্তের উপর দিয়া কখনও দক্ষিণে, কখনও বা উত্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে।

জলবায়ু—তুন্দ্রা অঞ্চলে শীতের প্রকোপ খুব বেশী। বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফ জমিয়া থাকে। বৃষ্টিপাত খুব কম। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়। শীতে তুষারপাত হয়। বৃষ্টি ও তুষারের পরিমাণ ১০ ইঞ্চির বেশী হয় না।

বৃষ্টিপাত

৫৪নং চিত্র

প্রাকৃতিক বিভাগ

৫৫নং চিত্র

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ

৫৬নং চিত্র

৫৭নং চিত্র
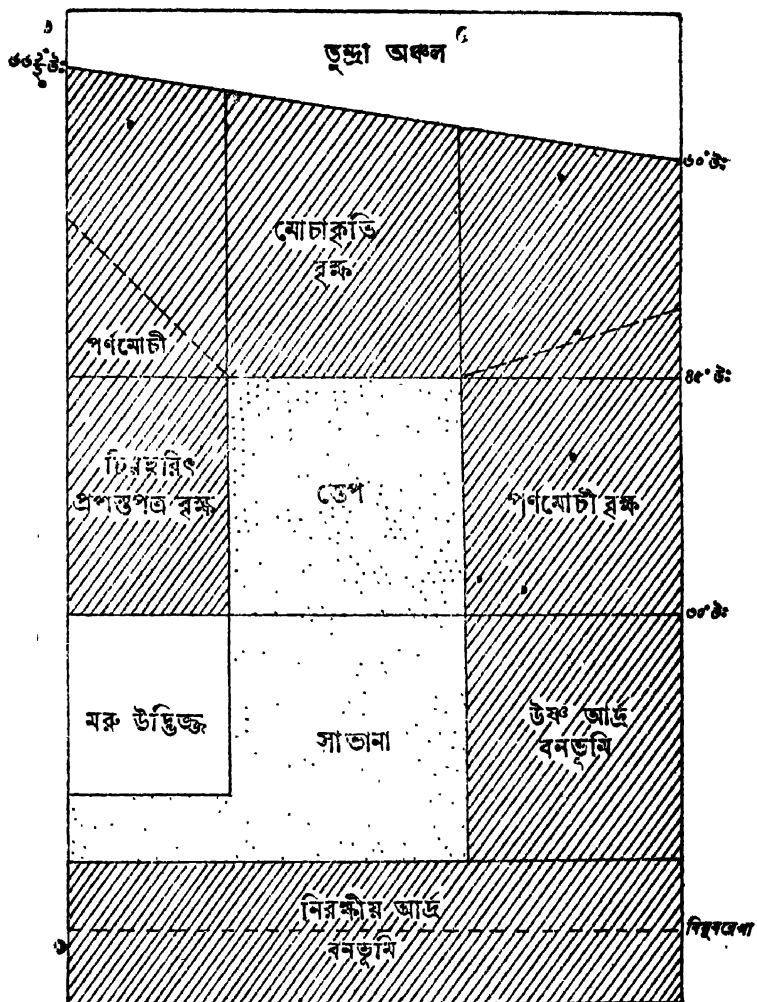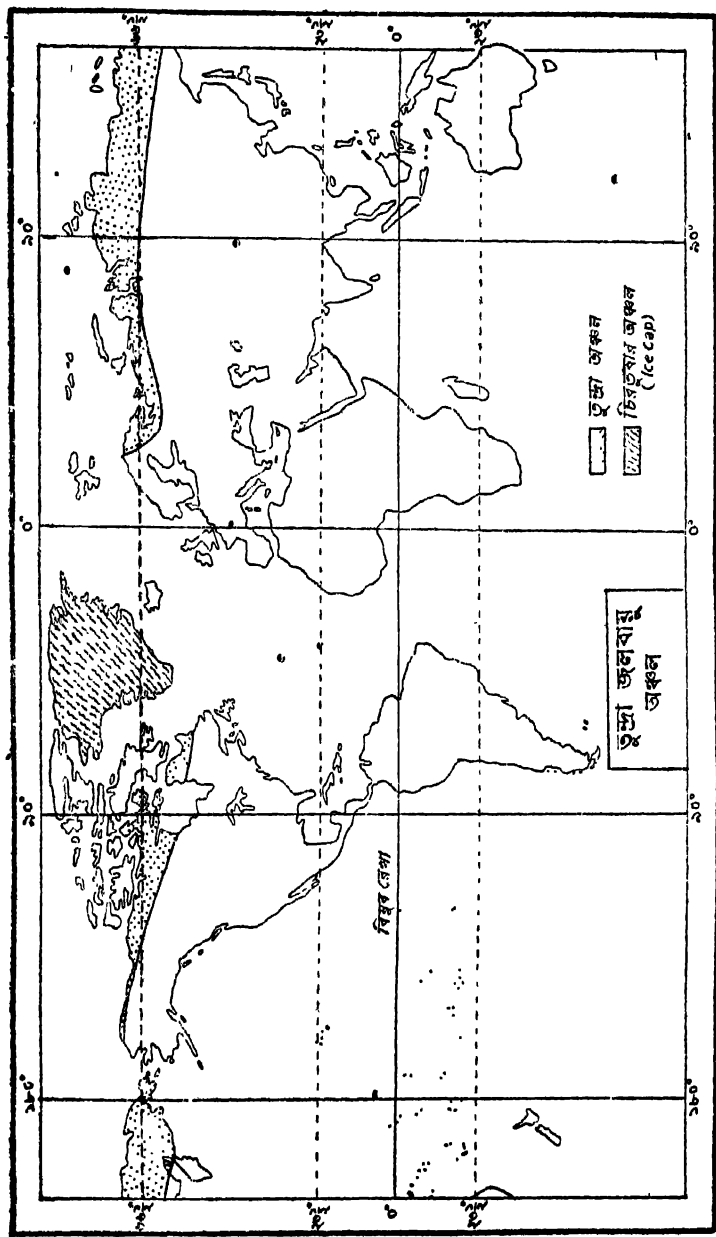
উদ্ভিজ্জ—এখানে কোন বৃক্ষ জন্মে না। গ্রীষ্মকালে যখন অল্প অল্প বরফ গলে, তখন শৈবাল, ছোট ছোট গুল্ম, ছোট ছোট চারাগাছের ঝোপ এবং বল্গা হরিণের খাদ্য লিচেন (lichen) নামক বিশেষ একপ্রকার শৈবাল জন্মে।

জীবজন্তু—এ অঞ্চলের সমুদ্রে তিমি, সীল, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখা যায়। স্থলজন্তুর মধ্যে ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে বল্গা হরিণ এবং উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চলে ক্যারিবুই প্রধান। এ ছাড়া শ্বেতভল্লুক, নকুল প্রভৃতি জন্তু সর্বত্রই পাওয়া যায়। তুন্দ্রাবাসীরা সকলেই কুকুর পুষিয়া থাকে।

অধিবাসী—তুন্দ্রা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করে। ইউরোপের উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ড দেশে **ল্যাপ,** ফিনল্যাণ্ড ও রুশিয়ায় **ফিন** এবং সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে **সাময়েদ্‌** ও **ইয়াকুত**দের বাস। আমেরিকার তুন্দ্রাভূমির সমুদ্র উপকূলের লোকদিগকে বলে **এস্কিমো**।

এই বরফের দেশে কৃষিকার্য সম্ভব নয়। তাই জল ও স্থলের জীবজন্তুর উপরেই এখানকার অধিবাসীদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়।

ইউরেশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীরা বল্গা হরিণ প্রতিপালন করে; ইহার মাংস খায়। ইহার চামড়া দিয়া পোশাক ও তাঁবুর আচ্ছাদন তৈয়ারী করে, নাড়ীগুলি শুকাইয়া দড়ির মত ব্যবহার করে, হাড় দিয়া শ্লেজ গাড়ির কাঠামো তৈয়ারী করে। এই বল্গা হরিণই আবার ভারবাহী পশু, বরফের উপর দিয়া ইহারাই শ্লেজ গাড়ি টানিয়া লইয়া যায়।

শিকারই এস্কিমোদের প্রধান উপজীবিকা। সীল, তিমি, সিন্ধুঘোটক, ক্যারিবু ও শ্বেত ভল্লুক ইহাদের প্রধান শিকার। মাংসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ক্যারিবুর চামড়া হইতে ইহারা পোশাক, শয্যাদ্রব্য, তাঁবুর আচ্ছাদন এবং শিরা ও নাড়ী দিয়া দড়ি এবং হাড় দিয়া অস্ত্র তৈয়ারী করে। সীল হইতে ইহারা তাঁবুর কাঠামো এবং নৌকা প্রস্তুতের যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে। কুকুর ইহাদের একমাত্র গৃহপালিত জন্তু। কুকুরই এস্কিমোদের শ্লেজ গাড়ি টানিয়া নিয়া যায়।

তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের জন্যই পশু ও মৎস্য শিকার এবং পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

৩। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল (Cool Temperate Zone)

(৪৫° উ. হইতে ৬৬½° উ. এবং ৪৫° দ. হইতে ৬৬½° দ.)

বিস্তার—উত্তর গোলার্ধে ৪৫° উঃ অক্ষরেখা হইতে তুন্দ্রাভূমি পর্যন্ত হিমশীতোষ্ণ মণ্ডল বিস্তৃত। দক্ষিণ গোলার্ধে চিলির দক্ষিণাংশ, তাসমেনিয়া দ্বীপ এবং নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণের কতক অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু—এখানে তুন্দ্রা অঞ্চলের মত তীব্র শীত নাই। উত্তাপের আধিক্যও তুন্দ্রার তুলনায় বেশী।

উদ্ভিজ্জ—এ অঞ্চলের সর্বত্রই অরণ্যভূমি আছে। যেখানে শীতের প্রভাব বেশী সেখানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি (Coniferous forest) আছে। সরলবর্গীয় বৃক্ষের মধ্যে পাইন, ফার, স্প্রুস, লার্চ প্রভৃতিই প্রধান। যেখানে শীত কম অথচ বৃষ্টিপাত অধিক সেখানে প্রশস্তপত্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (Deciduous forest) দেখা যায়। ওক্, ম্যাপল্, পপ্লার, বার্চ, বীচ, এল্ম প্রভৃতি পর্ণমোচী প্রশস্তপত্র বৃক্ষ। এই শ্রেণীর অরণ্যভূমি সাধারণত এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে দেখা যায়।

হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলকে আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ (ক) পশ্চিমভাগে—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর অঞ্চল; (খ) মধ্যভাগে—সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল ; এবং (গ) পূর্বভাগের লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল।

(ক) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর অঞ্চল

বিস্তার—বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, দক্ষিণ চিলি, তাসমেনিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের জলবায়ু বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সুপরিস্ফুট বলিয়া ইহাকে বৃটিশ জলবায়ু বলা হয়।

জলবায়ু—এ অঞ্চলে সারা বৎসরই পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হয়। এইজন্য এখানে বারোমাসই বৃষ্টি হয়। তবে বৃষ্টিপাত শীতকালেই অধিক হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অধিক। শীতের কঠোরতা অপেক্ষাকৃত কম। শীতকালের গড়-উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে নামে না, আবার গ্রীষ্মের প্রখরতাও বেশী নয়।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া

উঃ পঃ ইউরোপ

বিষুব রেখা

দক্ষিণ দ্বীপ (নিউ জীল্যাণ্ড)

দক্ষিণ চিলি

তাসমানিয়া

ব্রিটিশ জলবায়ু অঞ্চল

৫৮নং চিত্র

বিষুব রেখা

সাইবেরিয়া

সাইবেরীয় জলবায়ু অঞ্চল
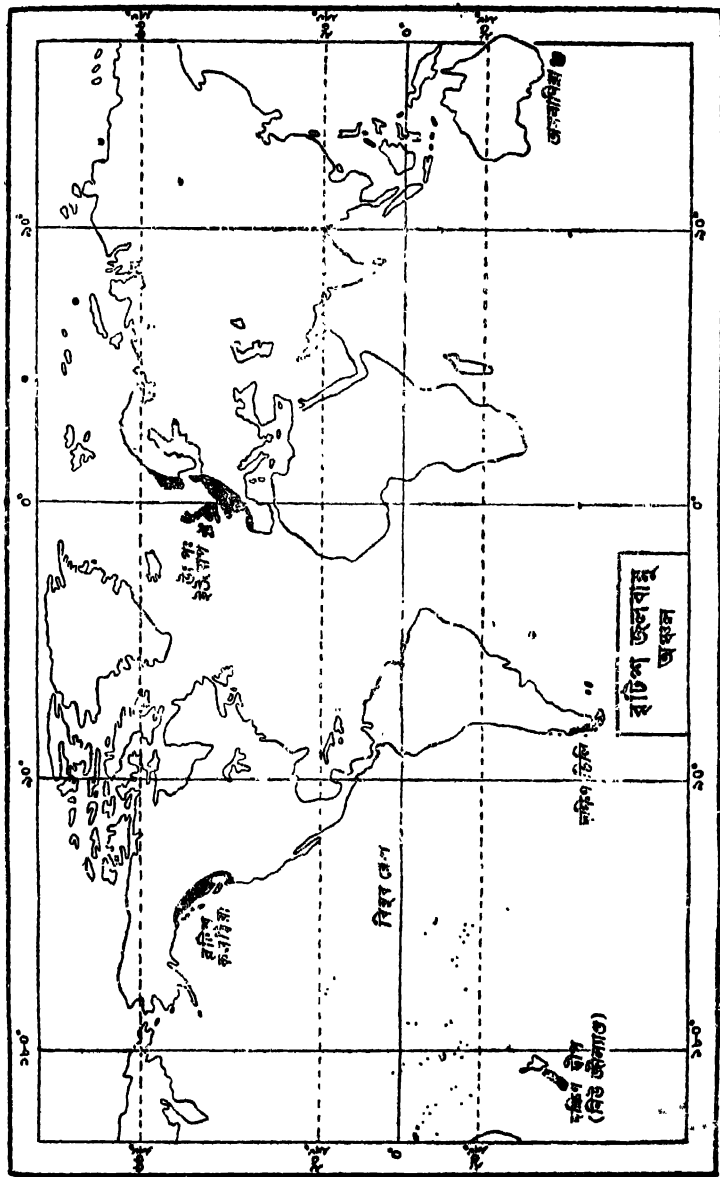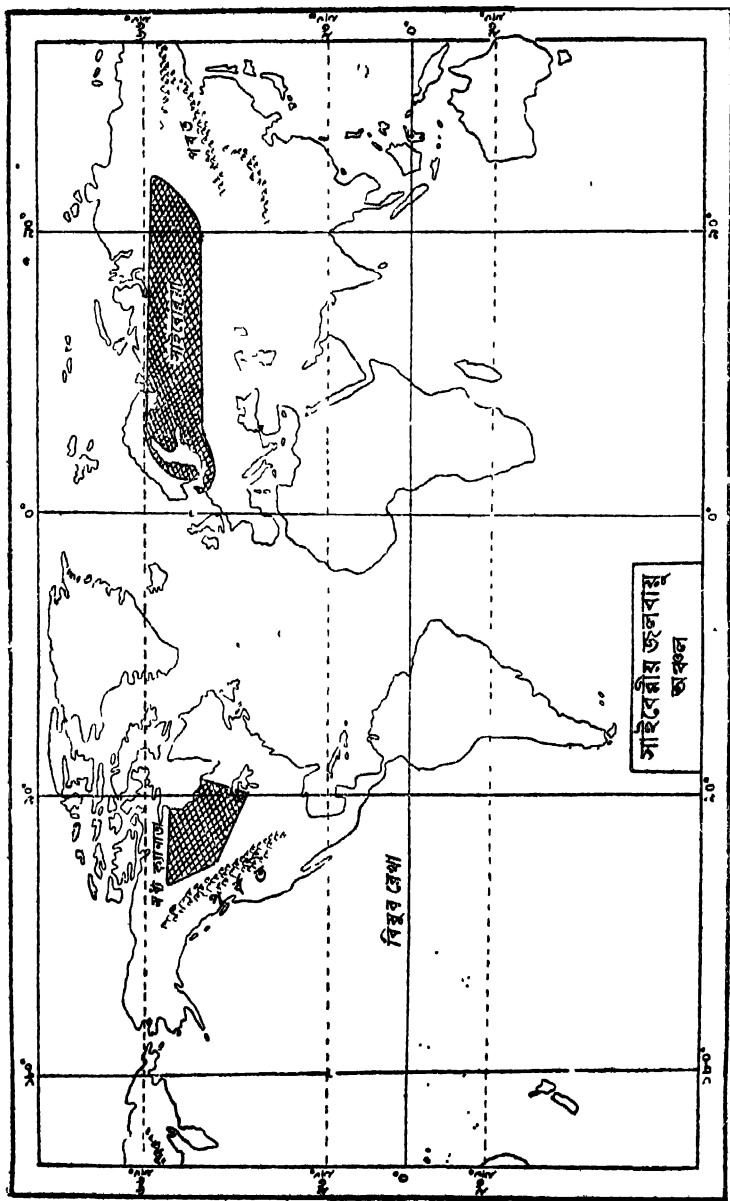
৫৯নং চিত্র

বার্ষিক উত্তাপের বৈষম্য খুবই কম; প্রায় ১৫° ফা.। উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে এ অঞ্চলের পূর্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। শীতে নদী বা সমুদ্র জমিয়া যায় না।

উদ্ভিজ্জ—অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চলে পর্ণমোচী প্রশস্তবৃক্ষের বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। ইউরোপের এই অঞ্চলে এককালে বিস্তীর্ণ অরণ্য ছিল; কিন্তু মানুষের কর্মতৎপরতার জন্য আজ বনভূমি প্রায় নিশ্চিহ্ন। বনভূমি এখন স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার উচ্চভূমি এবং, ভোজ, ব্ল্যাক ফরেস্ট প্রভৃতি পর্বতেই সীমাবদ্ধ।

অধিবাসী—ক্রমে ক্রমে এই উচ্চ বনভূমির পরিবর্তন হয়। গভীর বনে (১) মানুষ প্রথমে থাকে শিকারী। বনের পশু শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া সে জীবন যাপন করে। তারপরে (২) মানুষ কাঠুরিয়ার বৃত্তি অবলম্বন করে, তখন সে কাঠ কাটে ও বিক্রয় করে এবং সামান্য ব্যবসা-বাণিজ্যও করিতে থাকে। তারপর হয় (৩) চাষী, বন পরিষ্কার করিয়া সে কৃষিকার্য করিতে থাকে। তারপর ঐ অঞ্চলে কোন শক্তির সন্ধান পাইলে উহার সাহায্যে সে (৪) শিল্প গড়িয়া তোলে। তাই এই অঞ্চলের এক-এক স্থানে মানুষের জীবনধারা এবং কর্মতৎপরতা এক-এক রকম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে খনিজ কয়লা থাকায় সেখানকার অধিবাসীরা কয়লার সাহায্যে কাঁচা মাল হইতে শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহা পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল। কলকারখানার মজুরের কাজই এখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা। চিলি, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য চলিতেছে। কৃষি এবং মেষচারণই এখানকার লোকের প্রধান কাজ। আবার উত্তর আমেরিকার বৃটিশ কলাম্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আদিম অধিবাসীরা এখনও প্রথম স্তরে আছে। মুটকা, হাইডা প্রভৃতি অধিবাসীরা এখনও নদীর মাছ ও বনের পশু শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ঐ একই অঞ্চলে ইউরোপীয়রা কাঠের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে। বনভূমি হইতে কাঠ কাটিয়া তাহারা অন্যত্র চালান দেয়। উপকূলে সমুদ্রে কড্, হেরিং, স্যামন প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া যায়। এই মৎস্যের ব্যবসায়েও বহু লোক নিযুক্ত।

(খ) সাইবেরীয় জলবায়ুর অঞ্চল

বিস্তার—ইউরেশিয়ায় সুইডেনের পূর্বাংশ হইতে পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ এবং উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের উত্তর ভাগ সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ুর দেশ। দক্ষিণ গোলার্ধে ভূ-ভাগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া সেখানে এই অঞ্চল নাই।

জলবায়ু—উপকূল হইতে অনেক দূরে বলিয়া সমুদ্র এখানে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। জলবায়ু চরম। গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী (৭০ ফা.) শীতের তীব্রতাও অধিক (২০°-২২° ফা.)। বৃষ্টিপাত খুবই অল্প হয় (২০ ইঞ্চি)।

উদ্ভিজ্জ—এখানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি আছে। শীতকালে এ অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে, তাই কাঠ কাটিয়া অনায়াসেই বরফের উপর দিয়া চেরাই-ঘর (saw mill) লইয়া যাওয়া যায়।

অধিবাসী—এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে মানুষের কর্মতৎপরতা বিভিন্ন। কোথাও বন্য পশুশিকার, পশুচর্ম ও পশুলোম-সংগ্রহ, কোন অংশে বন্য পণ্য-সংগ্রহ ও কাঠুরিয়া-বৃত্তি মানুষের প্রধান উপজীবিকা। আবার কোথাও বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য চলিতেছে। কোন কোন অঞ্চলে শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্যানাডা ও সাইবেরিয়া—সাইবেরীয় জলবায়ুর এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ক্যানাডাই বেশী উন্নত। ক্যানাডায় নদী ও রেলপথ থাকায় যাতায়াতের অনেক সুবিধা। শ্বেত অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্মঠ, তাই ক্যানাডার প্রেইরী অঞ্চলে উহারা বনভূমি পরিষ্কার করিয়া গম চাষ করিতেছে। কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া বিদেশে পাঠাইতেছে। নরম কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলে প্রচুর কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। সাইবেরিয়া এখনও অনেক পশ্চাতে আছে। রুশিয়ার সাম্যবাদী সরকার এই অঞ্চলের জন্য বর্তমানে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

(গ) লরেন্সীয় জলবায়ুর অঞ্চল

বিস্তার—উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ক্যানাডা এবং এশিয়ার উত্তর-পূর্ব কোরিয়া এবং সাইবেরিয়ার উপকূল-ভাগ,

৬০নং চিত্র

ক্যালিফোর্নিয়া
ভূমধ্য সাগর
তীরবর্তী অঞ্চল
বিষুব রেখা
উত্তর দ্বীপ
(নিউ জিল্যাণ্ড)
মধ্য চিলি
কেপ কলোনি
দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ
দক্ষিণ পশ্চিম
অষ্ট্রেলিয়া
এডিলেড হইতে
মেলবোর্ণ পর্যন্ত অঞ্চল
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু
অঞ্চল

৬১নং চিত্র
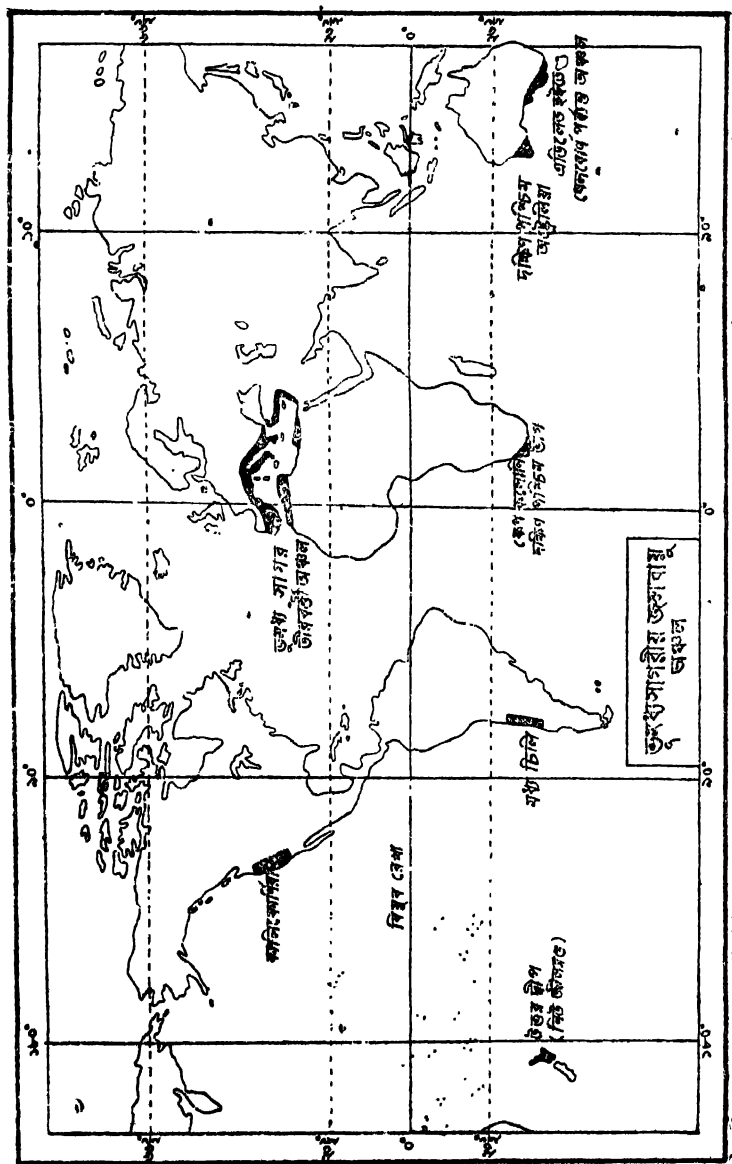
জাপানের হক্কাইডো ও হন্‌সিউ দ্বীপের উত্তর অংশ এই জলবায়ুর দেশ। দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ কোন অঞ্চল নাই।

জলবায়ু—পশ্চিম প্রান্তের অঞ্চল অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্ম বেশী। আবার শীতও অধিক। শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে এ অঞ্চলে শীতকালে অনেক স্থানে নদীমুখের জল জমিয়া যায়। তখন জাহাজ ও নৌ-চলাচলের কোন সুবিধাই থাকে না। বৃষ্টিপাত পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা কম, কিন্তু মধ্যভাগ অপেক্ষা বেশী। সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়, তবে গ্রীষ্মে অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

উদ্ভিজ্জ—এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ—সরলবর্গীয় বৃক্ষ।

অধিবাসী—এই অঞ্চলের সকল স্থান সমান উন্নত নয়। ক্যানাডার যে অঞ্চলে ভূমি শীতে বরফে আচ্ছাদিত থাকে সেখানে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ের (lumbering) সুবিধা, আবার সারা বৎসর বৃষ্টিপাতের সুবিধার জন্য উত্তর-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ক্যানাডায় কৃষি ও দুগ্ধের ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছে। নিকটেই কয়লা আছে। তাছাড়া জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া এখানকার অধিবাসীরা এই অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চল অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল। ক্যানাডার এই অঞ্চলে কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এশিয়ার এই অঞ্চলের মধ্যে জাপানই শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী এশিয়ার প্রধান ভূ-খণ্ডের বিশেষ উন্নতি এখনও হয় নাই। মাঞ্চুকুওর লোকেদের কাষ্ঠব্যবসাই এখনও প্রধান অবলম্বন। জাপান নিজের শিল্পের জন্য এই কাষ্ঠসম্পদ ব্যবহার করিত।

৪। উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডল

(Warm Temperate Zone—৩০° উ.—৪৫° উ. ও ৩০° দ.—৪৫° দ.)

উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলে শীতকালে পশ্চিমাবায়ু এবং গ্রীষ্মকালে উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু প্রবাহিত হয়। এজন্য এ অঞ্চলে শীতে বৃষ্টিপাত হয়, পূর্বভাগে গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত হয়। মধ্যভাগে অল্প বৃষ্টিপাত হয়। এই মণ্ডলকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

(ক) পশ্চিমভাগে—**ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল।**

(খ) মধ্যভাগে—(১) **শীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমির অঞ্চল;** (২) **শীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমি অঞ্চল**।

(গ) পূর্বভাগে—**চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বা শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল**।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অঞ্চল

বিস্তার—ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানে (মেসেটা মালভূমি বাদে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল, পো নদীর অববাহিকা বাদে ইটালী দেশ, আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূল, বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনের পশ্চিম উপকূল, সিরিয়া ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা), উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত উপকূলের দক্ষিণে কালিফোর্নিয়া পর্যন্ত অংশে, চিলির মধ্যভাগে উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, ভিক্টোরিয়ার পশ্চিম অংশে এবং নিউজিলণ্ড দেশের উত্তর ভাগে এই ধরনের জলবায়ু দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ বলা হয়।

জলবায়ু—এখানকার বিশেষত্ব—শীতকালে বৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে আকাশ নির্মেঘ থাকে এবং প্রচুর রৌদ্র পাওয়া যায়। শীতে শীত বেশী নয়, গ্রীষ্মকালেও উষ্ণতা খুব বেশী হয় না।

উদ্ভিজ্জ—এ অঞ্চলে চিরহরিৎ প্রশস্তপত্র বৃক্ষ জন্মে। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক, তাই জলের অভাবে পাছে গাছগুলি শুকাইয়া যায় এইজন্য এখানকার গাছগুলি নানা উপায়ে রস সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই অঞ্চল নানা রকম ফলের জন্য বিখ্যাত। জলপাই, আঙুর, কমলালেবু, লেবু, ডুমুর, পীচ, প্লাম্, এপরিকট, নাসপাতি, পেয়ারা, আপেল, ডালিম প্রভৃতি ফল এবং গম, যব প্রভৃতি শস্য এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এখানে গুটিপোকার খাদ্য তুঁতগাছের চাষও হয়। এজন্য এই অঞ্চলে রেশম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃণভূমির অভাবের জন্য এখানে গো-পালনের সুবিধা নাই, তবে ছাগল, ভেড়া প্রতিপালিত হয়।

অধিবাসী—এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত কৃষক। ফলের বাগানের কাজ এবং গম ও যবের জমিতে কৃষির কাজ এখানকার লোকের প্রধান

স্তেপ

হাঙ্গারী

মাঞ্চুরিয়ার সমতল ভূমি

আমেরিকার তৃণাচ্ছাদিত ভূমি

বিষুব রেখা

পাম্পাস

ভেল্ড

মারে ডার্লিং সমতল ভূমি

স্তেপ জলবায়ু অঞ্চল

৬২নং চিত্র

দক্ষিণ পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র
উঃ ও মধ্য চীন এবং দঃ জাপান
বিষুব রেখা
দক্ষিণ ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে
নাটাল
নিউ সাউথ ওয়েলসের উপকূল ভূমি
চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল

৬৩নং চিত্র

উপজীবিকা। কয়লার অভাবের জন্য এখানে পশ্চিম ইউরোপের মত শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। তবে ছোট ছোট অনেক শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন—আঙুর হইতে মদ, জলপাই হইতে জলপাই তৈল (olive oil) ও তাহা হইতে সাবান, মোমবাতি ইত্যাদি, ভেড়ার লোম হইতে পশমী কাপড়, এবং গুটিপোকা হইতে রেশম ইত্যাদি। যেখানে স্বর্ণ, গন্ধক, খনিজ তৈল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে সেখানে কৃষিই লোকের একমাত্র উপজীবিকা নহে। কালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বহু লোক পেট্রোলিয়ামের খনি এবং পেট্রোলিয়াম শোধনাগারগুলিতে শ্রমিকের কাজ করে। সেখানে ফলের চাষেও বহুলোক নিযুক্ত।

উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি বা স্টেপভূমি

বিস্তার—উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে বহুদূরে এই অঞ্চল অবস্থিত।

জলবায়ু—এখানকার জলবায়ু চরম, শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের বৈষম্য অত্যন্ত বেশী (৮০° ফা.—৩০° ফা.)। এ অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম (১৫ ইঞ্চির চেয়েও কম)। সেইজন্য এ অঞ্চলে বৃক্ষ বিশেষ জন্মে না।

উদ্ভিজ্জ—বিস্তীর্ণ তৃণভূমিই এখানকার বিশেষত্ব। এই তৃণ কোথাও বড়, কোথাও ছোট, কোথাও ঘন; কোথাও-বা স্বল্প। শীতোষ্ণ মণ্ডলের এই তৃণভূমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাশিয়াতে এই তৃণভূমিকে বলে স্টেপস্ (Steppes), উত্তর আমেরিকায় ইহার নাম প্রেইরি (Prairy), দক্ষিণ আমেরিকায় প্যাম্পাস্ (Pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড (Veldt) এবং অস্ট্রেলিয়ায় ডাউন্স্ (Downs)।

জীবজন্তু—এই অঞ্চলে প্রধানত তৃণভোজী জন্তুই দেখা যায়। এশিয়া ও আফ্রিকার এই অঞ্চলে ঘোড়া, গাধা, উট ও কৃষ্ণসার মৃগই প্রধান জন্তু। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলে বাইসন ও অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙারু দেখা যায়। নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীও এখানে কখনও কখনও দেখা যায়।

অধিবাসী—এই সকল তৃণভূমিতে পশুপালনই প্রধান কার্য। প্যাম্পাস্

ভেল্‌ড এবং অস্ট্রেলিয়ার ডাউনস্‌-এ অসংখ্য ভেড়া প্রতিপালিত হয়। ভেড়ার লোম এবং উহা হইতে প্রস্তুত পশমী বস্ত্র এখানকার প্রধান সম্পদ। প্রেইরী অঞ্চলের পশ্চিমাংশে ভেড়া, কিন্তু পূর্বাংশে অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গরু প্রতিপালিত হয়। একেবারে পূর্বভাগে যেখানে পূর্বে তৃণভূমি ছিল, সেখানে তৃণ পরিষ্কার করিয়া গম, ভুট্টা, তুলা, তামাক প্রভৃতি চাষ হইতেছে রুশিয়ার স্টেপ অঞ্চলে ভেড়া ও গরু প্রতিপালিত হয়। দক্ষিণ দিকে এবং কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে জলসেচের সুবিধার জন্য গম, রাই প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মরুপ্রায় ভূমি

বিস্তার—উষ্ণশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যভাগের কোন কোন অংশে পর্বতবেষ্টিত বলিয়া বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। সেই সকল স্থান কতকটা মরুভূমির মত। গোবি মরুভূমি, তুর্কিস্তান, তিব্বত, আফগানিস্তান, পারস্য ও এশিয়া মাইনরের আভ্যন্তরীণ ভাগ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, উত্তর মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনার পশ্চিম ভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু—এখানে শীতকালে শীত অধিক, আবার গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মও অধিক হয়। তাই বাৎসরিক উত্তাপের বৈষম্যও খুব বেশী হয়। বৃষ্টিপাত খুব কম গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

উদ্ভিজ্জ—এই মরুপ্রায় অঞ্চলের কোন কোন অংশে তৃণ জন্মে। যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অধিক সেখানে তৃণ অধিক জন্মে ও বেশী দিন স্থায়ী হয়।

অধিবাসী—পশুপালনই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান কাজ। জলসেচের সুবিধা হওয়াতে আজকাল অনেক স্থানে গম, ভুট্টা, তুলা, আঙুর, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইতেছে। মধ্য-এশিয়ার এই অঞ্চলের লোকেরা এখনও পশুপালন করে এবং পশুপাল লইয়া ঘাসের সন্ধানে যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

চৈনিক জলবায়ুর অঞ্চল বা শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল

বিস্তার—মধ্য ও উত্তর চীন, পশ্চিম কোরিয়া, দক্ষিণ জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ব্রাজিল ও উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারত

১৮০°
৯০°
০°
৯০°
৬৬½°
২৩½°
০°
২৩½°
ল্যানস
বিষুব রেখা
সুদান
হৃদ মালভূমি
ক্যাম্পোস
এঙ্গোলা
রোডেসিয়া
কুইন্সল্যাণ্ডের
মধ্যভাগ
সাভানা জলবায়ু অঞ্চল

৬৪নং চিত্র

উষ্ণমরু জলবায়ু অঞ্চল

ক্যালিফোর্নিয়া
আরিজোনা
মেক্সিকো
বিষুব রেখা
পেরু চিলি
আটাকামা
সাহারা
আরব
থর
সোমালিল্যাণ্ড
কালাহারি
পশ্চিম
অস্ট্রেলিয়া
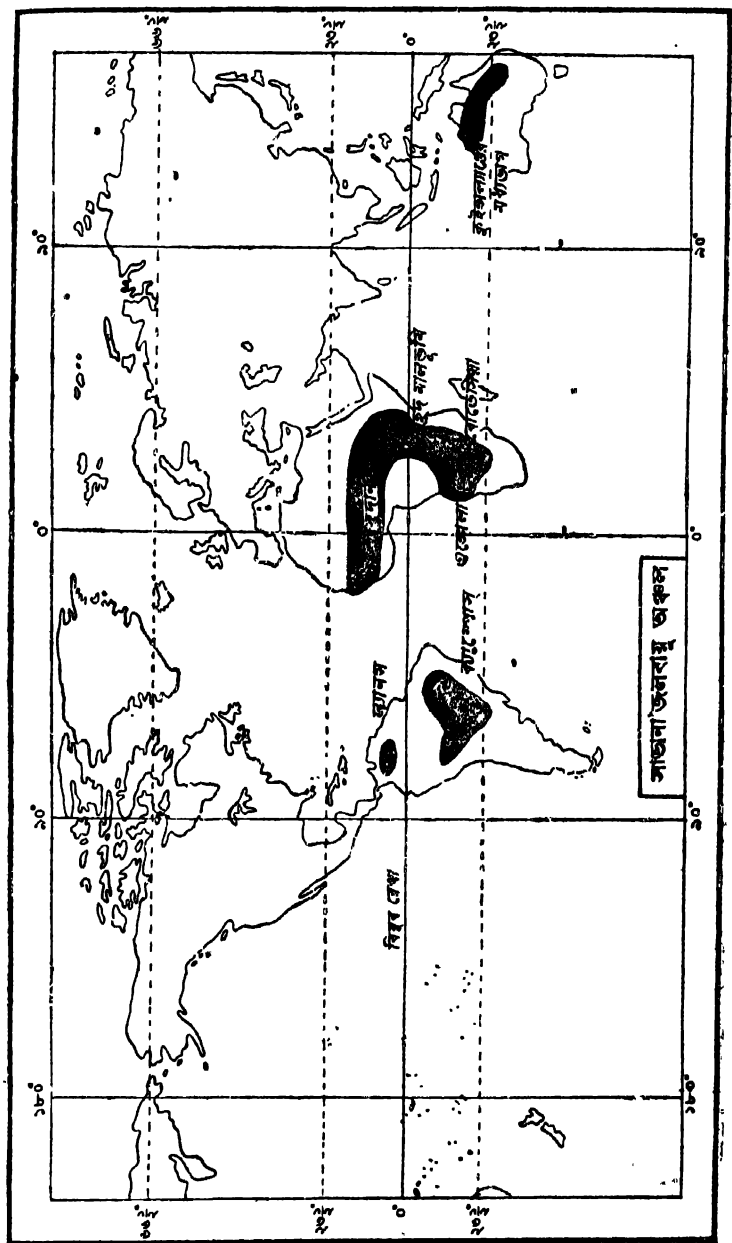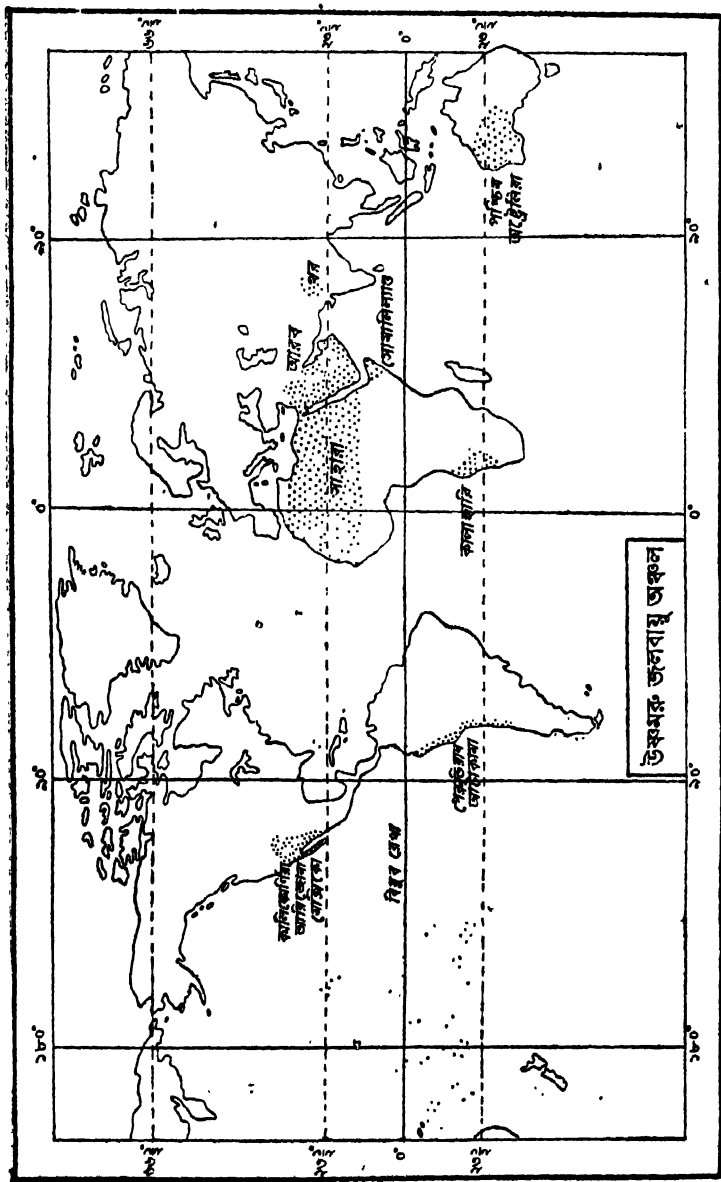
৬৫নং চিত্র

মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ কুইন্সলণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের পূর্ব উপকূল-ভাগকে শীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চল বলা যাইতে পারে।

জলবায়ু—এই অঞ্চলে বার মাসই বৃষ্টি হয়, তবে শীতের চেয়ে গ্রীষ্মকালে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে এখানে খুব বেশী শীত পড়ে না, গ্রীষ্মকালেও খুব বেশী গরম হয় না। উত্তাপের প্রখরতা প্রায় ৩৫° ফা. (৮০°—৫০° ফা.)।

উদ্ভিজ্জ—এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রশস্তপত্র বৃক্ষ। প্রচুর জল ও উত্তাপের জন্য এ অঞ্চল কৃষিকার্যের উপযোগী।

অধিবাসী—কৃষিকার্যই এ অঞ্চলের লোকের প্রধান উপজীবিকা, তবে কোন কোন স্থানে কলকারখানা গড়িয়া উঠায় বহু লোক শ্রমিকের কাজও করে। চীন দেশের এই অঞ্চলে ধান, গম, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু, চা ও তুঁত গাছের চাষ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষই প্রধান। জাপানে ধান, গম, চা ও তুঁত গাছের চাষ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় ইক্ষু; দক্ষিণ আমেরিকায় গম, ভুট্টা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভুট্টার চাষ হয়।

৫। ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল (Tropical Hot Zone)

৩০° দ. অক্ষরেখা হইতে ৩০° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডল। নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্শ্বের কতকটা অঞ্চল বাদে ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের অবশিষ্ট অংশকে তিনটি প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—উষ্ণ মরু অঞ্চল, স্যাভানা অঞ্চল এবং মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল।

উষ্ণ মরু অঞ্চল বা সাহারীয় জলবায়ু অঞ্চল

বিস্তার—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলে মহাদেশীয় বৃহৎ ভূভাগগুলির পশ্চিমাংশে উষ্ণ মরু অঞ্চল অবস্থিত। ইহার এক দিকে ক্রান্তীয় তৃণভূমি, অপর দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সাহারা, সোমালিল্যাণ্ড, সিরিয়া-আরবের কিয়দংশ, ভারতের থর মরুভূমি, কলেরেডো, আটাকামা, কালাহারি, মধ্য ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

জলবায়ু—এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম। শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রখরতা অত্যন্ত বেশী। এখানে দিনের বেলায় বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে এবং

প্রচণ্ড উত্তাপ হয়, আবার রাত্রিতে বেশ শীত অনুভূত হয়। দিন ও রাত্রির উত্তাপের বৈষম্যও অত্যন্ত বেশী। বৃষ্টিপাত বৎসরে ১০ ইঞ্চির চেয়েও কম হয়। কোন কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও কম (বৎসরে ১ ইঞ্চি—২ ইঞ্চি)।

উদ্ভিজ্জ—এই উষ্ণ মরুমণ্ডলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ জন্মায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দিকে গুল্মজাতীয় উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। অন্যান্য অংশে কাঁটাগাছের ঝোপ ও অন্যান্য ছোট ছোট কণ্টকাকীর্ণ গাছের ঝোপঝাড় আছে। যেখানে ভূগর্ভস্থ জল ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসে সেখানে মরূদ্যানের সৃষ্টি হয়। মরূদ্যানে উদ্ভিজ্জ অনেক বেশী। এই সব উদ্ভিজ্জের মধ্যে খেজুর গাছই প্রধান।

জীবজন্তু—উট মরুভূমির প্রধান জন্তু, ভারবাহী পশু এবং মানুষের পরম বন্ধু। উট পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। দিনের পর দিন উহা অনায়াসে শুষ্ক উষ্ণ মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে পারে। ইহা ছাড়া ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুও আছে।

অধিবাসী—এই সব মরুভূমিতে মরূদ্যান আছে। তথায় জল থাকাতে অধিবাসীরা চাষবাস করে। সেখানে (যেমন সাহারা) গম, যব, ধান, খেজুর ও কার্পাস প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। ইহারা এই সব পণ্যের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিয়া থাকে। মরুভূমিতে আর এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা যাযাবর। ইহারা দলবদ্ধভাবে উট, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি লইয়া মরুভূমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও করে এবং সুযোগ-সুবিধা পাইলে দস্যুতা করিতেও দ্বিধা করে না। আবার দক্ষিণ আফ্রিকা, আটাকামা ও অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে যে সব স্থানে খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকল স্থানে বিদেশীয় বণিকরা খনির কাজ করিতেছে।

ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি অঞ্চল

বিস্তার—ক্রান্তীয় উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি অঞ্চল অবস্থিত ইহার এক দিকে নিরক্ষীয় অঞ্চল, অপর দিকে উষ্ণ মরু অঞ্চল।
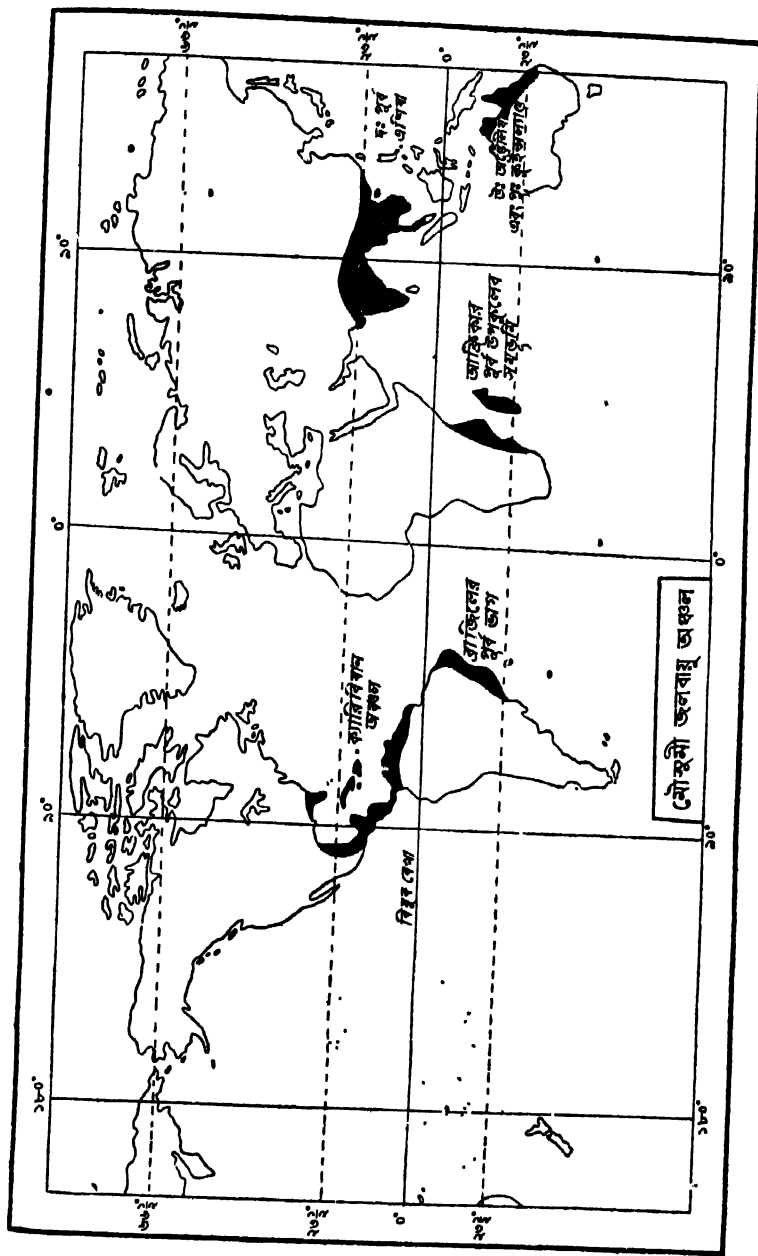
জলবায়ু—এই অঞ্চলে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী—৮০° ফা.—৯০° ফা.। এখানকার শীতকাল বৃষ্টিহীন ও শুষ্ক। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র।

উদ্ভিজ্জ—এই তৃণভূমি আফ্রিকায় স্যাভানা, ব্রেজিলে ক্যাম্পো (Campos) এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে ল্যানো (Llanos) নামে পরিচিত।

জীবজন্তু—এই অঞ্চলে হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, ঘোড়া ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী বেশী। সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীও আছে—তাহারা তৃণভোজীদের মারিয়া খায়।

অধিবাসী—বৃষ্টির অল্পতার জন্য এ অঞ্চলে ভাল চাষ হয় না। তৃণভূমিতে পশুপালনের খুব সুবিধা। শিকারযোগ্য পশুও অনেক পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা তাই প্রধানত পশুপালক ও শিকারী।

মৌসুমী অথবা ভারতীয় জলবায়ুর অঞ্চল

বিস্তার—ভারত ও পাকিস্তান, উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল, মেক্সিকো, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের কিছু অংশ, ব্রাজিলের পূর্বভাগ ও মধ্য-আমেরিকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু—ইহা মৌসুমীবায়ু-সেবিত অঞ্চল। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়; তাই গ্রীষ্মে প্রচুর বারিপাত হয়। শীতকালে স্থলভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাই শীতকালে শুষ্ক। গ্রীষ্মের উত্তাপ ৮০° ফা,—৯০° ফা. পর্যন্ত উঠে।

উদ্ভিজ্জ—মৌসুমী অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য আছে। এই অরণ্যের প্রধান সম্পদ শাল ও সেগুন কাঠ। যে অংশে বৃষ্টিপাত বেশী, সেখানে গভীর বন ও বড় বড় গাছ জন্মে। অধিকাংশ গাছের পাতা ঝরে, আবার নবপত্রের উদ্গম হয়। বট, অশ্বত্থ, শাল, সেগুন, বাঁশ প্রভৃতি গাছ এবং কলা, আম কাঁঠাল, তাল প্রভৃতি ফলের গাছ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। যে অংশে বৃষ্টিপাত কম সেখানে শুধু তৃণ জন্মে।

জীবজন্তু—বনের মধ্যে বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, প্রভৃতি মাংসাশী এবং হরিণ, গণ্ডার, হাতী প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী বাস করে।

অধিবাসী—বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের আধিক্যহেতু এই অঞ্চল কৃষিকার্যের খুব উপযোগী। এখানকার নদী-উপত্যকাগুলিতে পৃথিবীর সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। কৃষিই এখানকার লোকের প্রধান অবলম্বন। এই অঞ্চলে ধান, পাট, গম, জোয়ার, বাজরা, তিল, তিসি, আখ, পাট, কার্পাস, চা, কফি প্রভৃতির চাষ হয়। জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ এবং খাদ্য সহজলভ্য বলিয়া এ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন।

৬। নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial Zone)

বিস্তার—নিরক্ষবৃত্তের ৫° উত্তর ও ৫° দক্ষিণ পর্যন্ত সাধারণত এই অঞ্চল বিস্তৃত। তবে কোথাও কোথাও ১০° পর্যন্ত স্থানে ইহা বিস্তৃত।

জলবায়ু—প্রচণ্ড উত্তাপ এখানে সারা বৎসর প্রায়ই সমভাবে থাকে এবং সারা বৎসরই প্রচুর পরিচলন-বৃষ্টি হয়। এখানকার গড়-উষ্ণতা ৮০° ফা. এবং গড়-বৃষ্টিপাত ৮০ ইঞ্চিরও বেশী। বায়ু সর্বদাই উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। গিনি উপকূল, কঙ্গো ও আমাজন নদীর অববাহিকা, কলম্বিয়া, ব্রেজিলের উত্তরাংশ এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জলবায়ু এই প্রকার।

উদ্ভিজ্জ—এই অঞ্চলে বিশাল বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। বন এমন নিবিড় যে সূর্যালোক পাইবার জন্য গাছপালা সোজা উপরের দিকে বাড়িয়া উঠে। সারা বৎসর গাছ ও লতার পত্রোদ্গম হয়, বন সর্বদা সবুজ থাকে। তাই ইহা চিরহরিৎ (evergreen) বনভূমি নামে খ্যাত। এখানে মেহগিনি, আবলুস, রবার, কোকো প্রভৃতি গাছ জন্মে। উপকূল অঞ্চলে তাল-নারিকেলও দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় এইরূপ বনভূমির নাম হইয়াছে Selva।

জীবজন্তু—বানর, গরিলা, কাঠবিড়াল প্রভৃতি অরণ্যচারী প্রাণী, নানা-জাতীয় পক্ষী ও কীটপতঙ্গ এবং কুমীর, জলহস্তী প্রভৃতি জলচর প্রাণী এই বনভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল
আমাজনের নিম্ন ভূমি
বিষুব রেখা
কলম্বিয়ার উপকূল ভূমি
পশ্চিম আফ্রিকা এবং কঙ্গো উপত্যকা
মালয় এবং ইন্দোনেশিয়া
১৮০°
৯০°
০°
৯০°

৩৭নং চিত্র

অধিবাসী—মনুষ্যবসতি এ অঞ্চলে বিরল, আফ্রিকার 'পিগমি', আমেরিকার 'মাকু' ইত্যাদি খর্বকায় অসভ্য জাতি বনভূমির প্রধান বাসিন্দা। বনের ফল ও শিকারলব্ধ পশুর মাংস তাহাদের খাদ্য; গাছের উপর তাহাদের ঘর। এইজন্য তাহাদের বৃক্ষাশ্রয়ী (tree-dwellers) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। প্রাকৃতিক বিভাগ কাহাকে বলে? পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলিকে কি কি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে বল। যে কোন একটি প্রাকৃতিক বিভাগের বিশদ বর্ণনা লিখ।

২। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবনধারাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা আলোচনা করিয়া তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দাও।

৩। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বলিতে কোন কোন অঞ্চলকে বুঝায়? এই অঞ্চলের জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বিশেষত্ব কি? এখানকার মানুষের কর্মতৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি? সেখানকার অধিবাসীরা কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বর্ণনা কর।

৫। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তার, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ এবং অধিবাসী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৬। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিস্তার কতখানি? এই অঞ্চলে জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের বিশেষত্ব কি? এখানকার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে তুমি কি জান বল।

৭। বৃটিশ জলবায়ু অঞ্চল বলিতে কোন কোন অঞ্চল বুঝায়? এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ—

এস্কিমো, ল্যাপা, পিগমী, স্যাভানা, তৃণভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য

ধান—সর্বপ্রধান কৃষিজদ্রব্য। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক লোক ভাত খায়। মৌসুমী অঞ্চলে যেখানে উত্তাপ ৭৫° ফা. ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির বেশী, সেখানে ধান হইয়া থাকে। চীন, ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান, ব্রহ্ম, শ্যাম, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট ধান জন্মে। পশ্চিম-পাকিস্তান (সিন্ধুর উপত্যকা), মিশর (নীল নদের উপত্যকা), ইটালী (পো-র উপত্যকা), যুক্তরাষ্ট্র (মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল কালিফোর্নিয়া) ইত্যাদি অঞ্চলে জলসেচন করিয়া ধান চাষ হইতেছে।

গম—যে সব অঞ্চলে উত্তাপ ৬০° ফা. এর কাছাকাছি, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি সেখানে ভাল গম জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশে শীতকালে, শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মে ও বসন্তকালে গম হয়। দক্ষিণ রাশিয়া, চীন, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা, ভারতের পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, পাকিস্তানের পাঞ্জাব, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

তুলা—ইহা উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ। তবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। যে স্থানের গড়-উষ্ণতা ৬৫° ফা., বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি, সেখানে ভাল তুলা জন্মে। যেখানে জল দাঁড়ায় না, অথচ মাটি অনেকদিন পর্যন্ত ভিজা থাকে, সেই জমি তুলাচাষের পক্ষে প্রশস্ত। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাষ ভাল হয়। যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, চীন, রাশিয়া, মিশর, সুদান, ব্রেজীল এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়।

পাট—পাট চাষের জন্য বেশী জল ও উত্তাপের প্রয়োজন। নদীতীরে যেখানে প্রতিবৎসর পলিমাটি সঞ্চিত হয় এবং যেখানে বৃষ্টিপাত ৬০ ইঞ্চির

পৃথিবীর তুলা উৎপাদন অঞ্চল
তুলা—
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুবরেখা
মকরক্রান্তি

৬৮নং চিত্র

পৃথিবীর চিনি উৎপাদন অঞ্চল

ইক্ষু –
বীট –

উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুবরেখা
মকরক্রান্তি

৬৯নং চিত্র
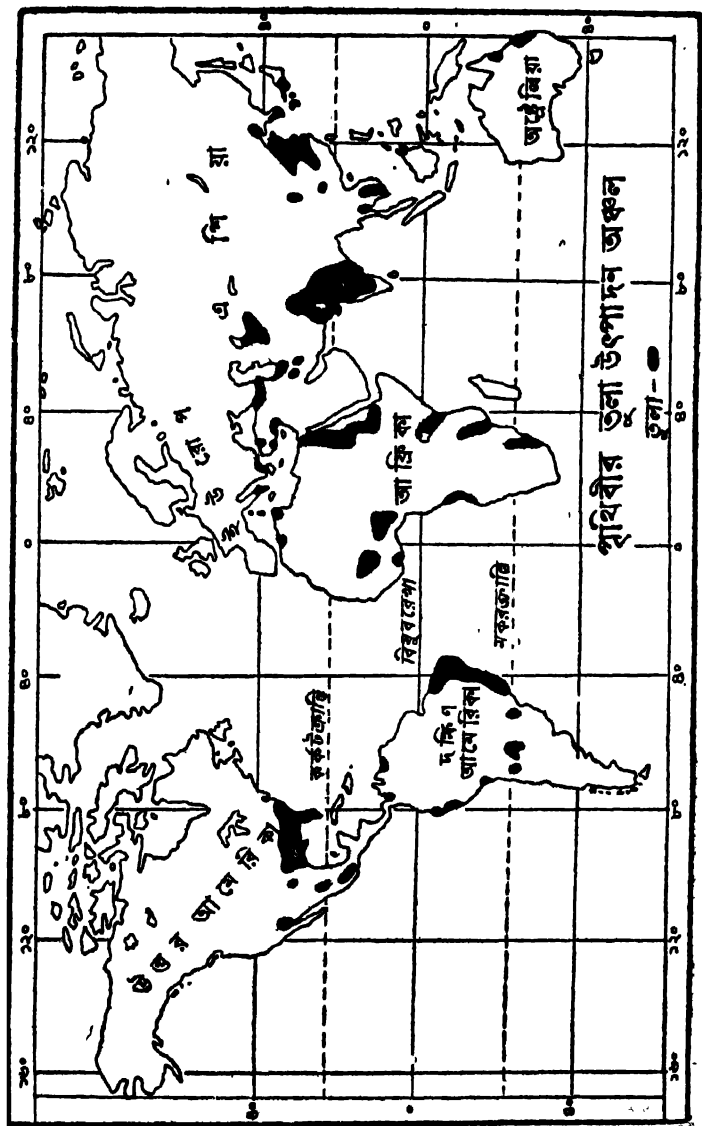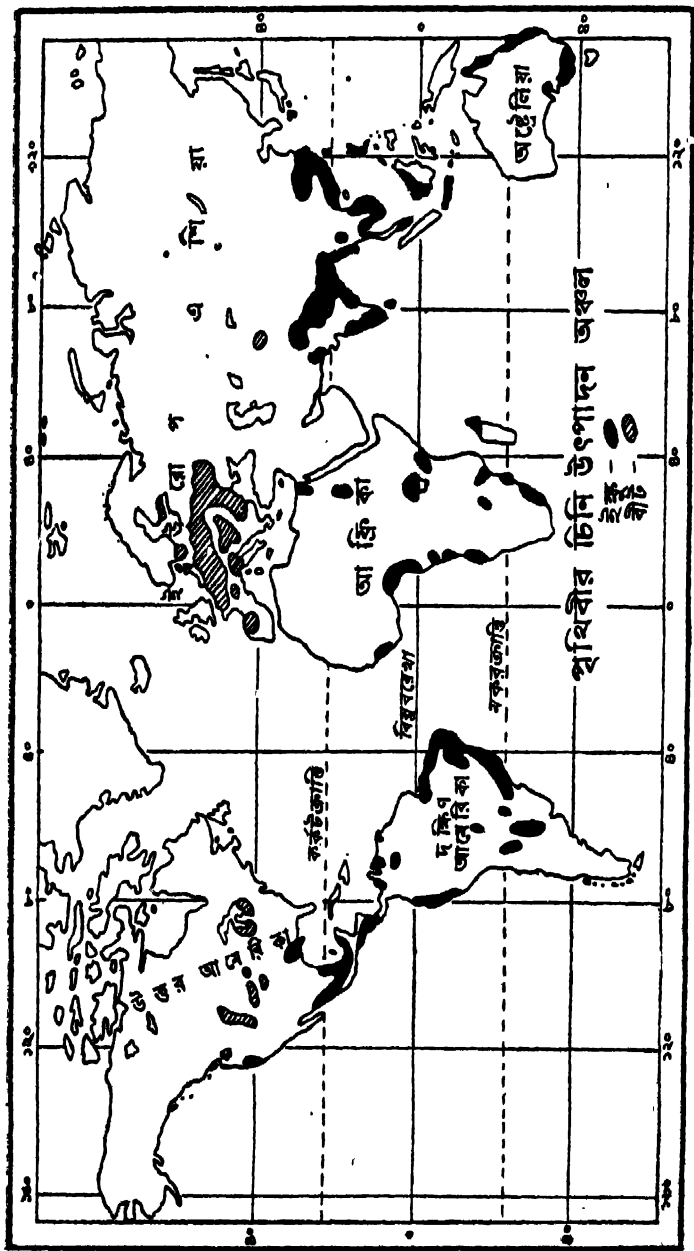
অধিক, সেখানে ভাল পাট জন্মে। পৃথিবীর অধিকাংশ পাট পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামেও ভাল পাট জন্মে। বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল, সিংহল, ফরমোসা, মালয় উপদ্বীপ এবং চীনে পাট চাষ হয়। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও আন্দামানে পাট চাষ শুরু হইয়াছে।

ইক্ষু—ইক্ষুরস হইতে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও বেশী চিনি উৎপন্ন হয়। প্রচুর উত্তাপ (মোটামুটি ৭০°—৭৫° ফা.), প্রচুর বৃষ্টিপাত (৬০ ইঞ্চির কাছাকাছি) এবং আর্দ্র নিম্ন ভূমি ইক্ষু চাষের উপযোগী। ইক্ষু উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান প্রথম, ইহার পর কিউবা, ব্রাজিল ও জাভা। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। তবে উত্তর-প্রদেশ এবং উত্তর বিহারেই ইক্ষুর চাষ সবচেয়ে বেশী হয়। ইহা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে মেক্সিকো, হাওয়াই দ্বীপ, মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চিলি ব্যতীত প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা, নাটাল, মরিসস দ্বীপ, পাকিস্তান, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ইক্ষুর চাষ হইতেছে।

বীট—পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির অর্ধেকের চেয়ে কিছু কম বীট হইতে পাওয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই বীটের চাষ হয়। বীট চাষের জন্য বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মাঝারি রকমের বৃষ্টি ও ৬৫° ফা. হইতে ৭০° ফা. পর্যন্ত উত্তাপের প্রয়োজন।

পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বীটের চাষ হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ায়ও বীটের চাষ প্রচুর হয়। বীট-চিনি উৎপাদনে রাশিয়ার স্থানই প্রথম। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীকে একত্র ধরিলে বীট চিনি উৎপাদনে ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তাহা হইলে এই চিনি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

চা—চা-গাছের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া চা-পাতা প্রস্তুত করা হয়। এই চা-পাতাই চা নামে বাজারে বিক্রি হয়। উষ্ণ মণ্ডল ও নিকটবর্তী মৌসুমী অঞ্চলে ভাল চা জন্মে। চা-চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও

প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় (৬০—১০০ ইঞ্চি)। পাহাড়ের ঢালু জমি—যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল জমিয়া থাকিতে পারে না এরূপ জমি. চা-চাষের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয় চীন দেশে। চীনের পরেই চা উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্থান। আসাম এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতে ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চা উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিমালয়ের পাদভূমিতে চা উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলায় প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফরমোজা এবং ব্রাজিলেও চা উৎপন্ন হয়। ভাবতবর্ষ হইতে সবচেয়ে বেশী চা বিদেশে রপ্তানি হয়।

পশম—মেষের লোম হইতে পশম তৈয়ারী হয়। তাই যে সকল অঞ্চলে মেষ প্রতিপালিত হয় সেই সকল অঞ্চলেই সাধারণত পশম পাওয়া যায়; তবে সব রকমের মেষ হইতে বা যে-কোন ভাবে প্রতিপালিত মেষ হইতে ভাল পশম পাওয়া যায় না। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে তৃণভূমি অঞ্চলই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেষচারণ-ক্ষেত্র। তাই এই সকল অঞ্চলেই অধিকাংশ পশম উৎপন্ন হয়। পশম উৎপাদন এবং পশম রপ্তানি এই দুইটি বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্থান প্রথম। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ পশম রপ্তানি করে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া এবং কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার পরেই পশম উৎপাদনে আর্জেন্টিনার স্থান। ইহা ব্যতীত নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসংঘ, উত্তর আফ্রিকা, উরুগুয়ে, ব্রাজিল এবং ভারতবর্ষ পশম উৎপন্ন ও রপ্তানি করে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেশেও পশম উৎপন্ন হয়। তবে এই সকল দেশের নিজস্ব চাহিদা বেশী বলিয়া উহারা বিদেশে পশম রপ্তানি করিতে পারে না। এই সকল দেশের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলই প্রধান।

উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুবরেখা
মকরক্রান্তি
পৃথিবীর চা উৎপাদন অঞ্চল
চা-
১৬০
১২০
৮০
৪০
০
৪০
৮০
১২০

৭০নং চিত্র

পৃথিবীর পশম উৎপাদন অঞ্চল

পশম—●

উত্তর আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকা

ইউরোপ

এশিয়া

আফ্রিকা

অষ্ট্রেলিয়া

কর্কটক্রান্তি

বিষুবরেখা

মকরক্রান্তি

৭১নং চিত্র

পৃথিবীর কয়লা উৎপাদন অঞ্চল
কয়লা—
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুবরেখা
মকরক্রান্তি

১২নং চিত্র

উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
কর্কটক্রান্তি
বিষুবরেখা
মকরক্রান্তি
পৃথিবীর লৌহ উৎপাদন অঞ্চল
লৌহ-

৭৩নং চিত্র
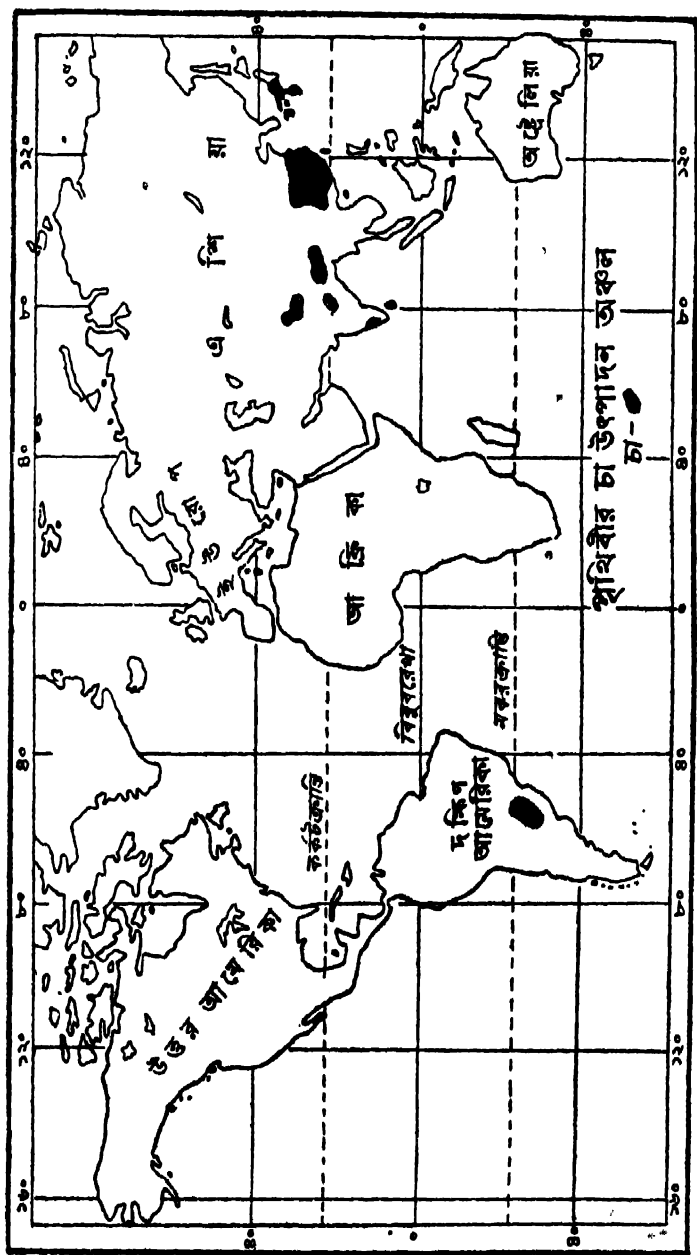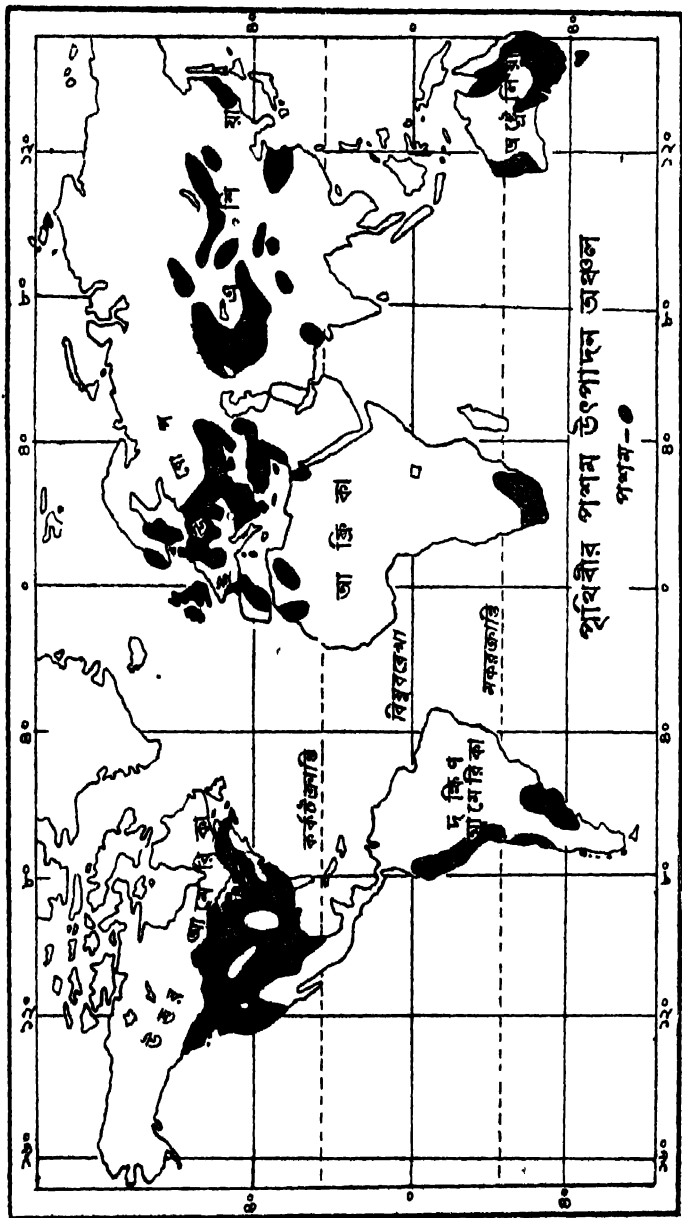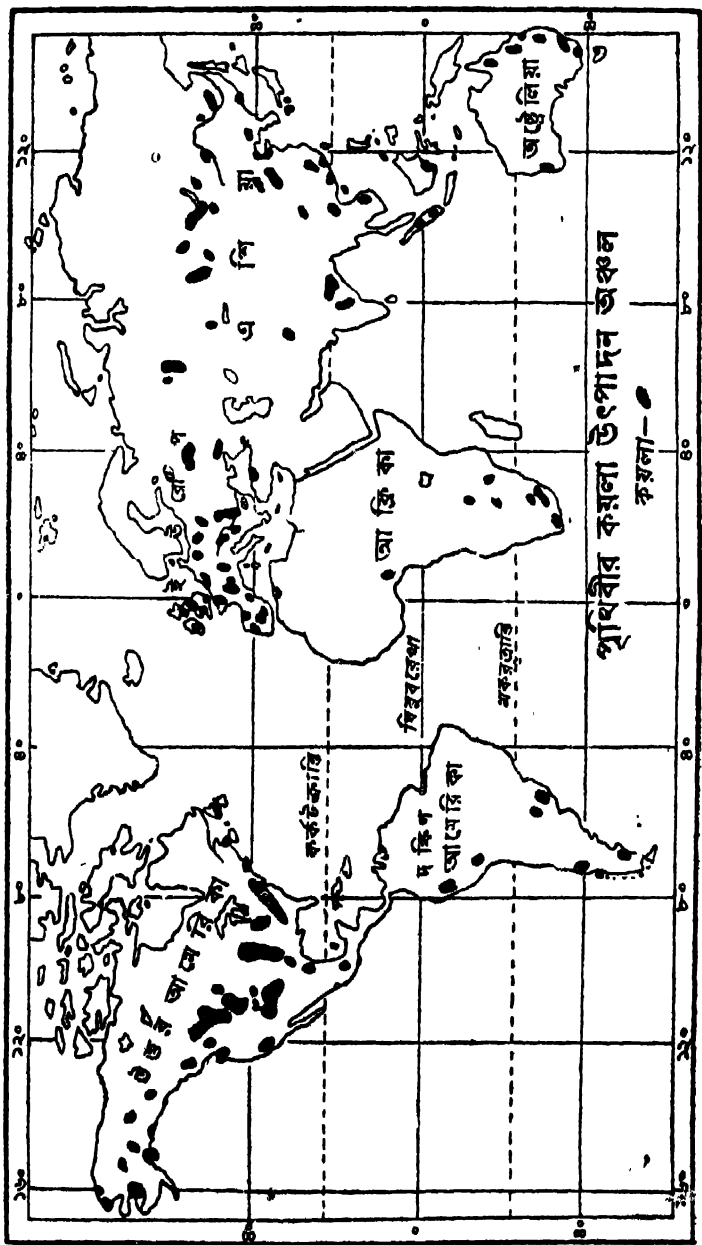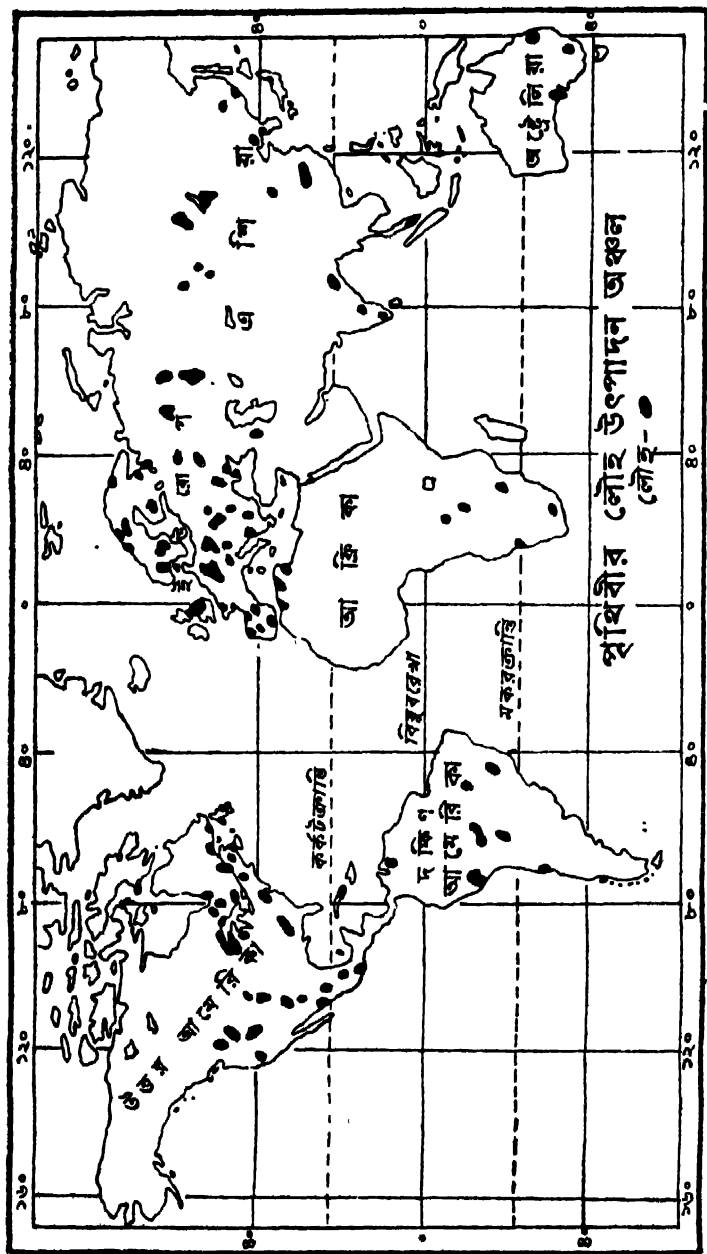
খনিজ দ্রব্য

কয়লা—উদ্ভিদের অবশেষ সুদীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিয়া কয়লায় রূপান্তরিত হয়। অধুনাতন শিল্পপ্রগতির দিনে তাপ উৎপাদনের জন্য কয়লার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কয়লা উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বপ্রথম। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই কয়লার খনি আছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বদিকে আপেলেশিয়ান তঞ্চলেই সর্বাধিক কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই বৃটেনের স্থান। প্রাক্তন জার্মানীর ওয়েস্টফ্যালিয়া (পশ্চিম জার্মানী), স্যাক্সনী (রুশ-অধিকৃত পূর্ব জার্মানী) ও সাইবেরিয়া (বর্তমানে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) কয়লাক্ষেত্র হইতে প্রচুর কয়লা উত্তোলিত হয়। রাশিয়াতেও প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয়। রাশিয়ার ডোনেৎসে (Donetz) এবং কুজনেৎস্ক (Kuznetsk) কয়লাক্ষেত্রই প্রধান। ইহা ব্যতীত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসংঘ, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষে কয়লা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের অন্তর্গত রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা-খনি অঞ্চল হইতে এদেশে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বোকারো, করানপুরা, গিরিডি, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, আসাম, দার্জিলিং এবং কাশ্মীরেও কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

লৌহ—ধাতুর মধ্যে লৌহ সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। লৌহ উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান প্রথম। সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের মিনেসোটা ও মিচিগান প্রদেশে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, জাপান, ক্যানাডা এবং ভারতবর্ষে প্রচুর লৌহ উত্তোলিত হয়। ভারতের সিংভূম, কেওঞ্ঝর, বোনাই ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট লৌহখনি অঞ্চল।

পরিবহণ-ব্যবস্থা

রেলপথ—১৮২৫ অব্দে ইংলণ্ডে ডার্লিংটন স্টকটন শহরে সর্বপ্রথম রেলগাড়ি চলে। তারপর পৃথিবীর সকল সভ্য অঞ্চলে রেলপথের বিস্তার হইয়াছে। ইউরেশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান (Trans-Siberian) রেলপথ

রুশিয়ায় লেনিনগ্রাড হইতে মস্কো হইয়া ব্লাডিভোস্টক অবধি বিস্তৃত। ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। মস্কো হইতে ব্লাডিভোস্টক—৫,৪০০ মাইল। উত্তর আমেরিকার ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক (Canadian Pacific), যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন প্যাসিফিক (Union Pacific), দক্ষিণ আমেরিকার ট্রান্স আন্দিস (Trans Andis) এই তিনটি এবং আরও দুইটি অপ্রধান রেলপথ আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ সাধন করিতেছে। সিম্পলন ওরিয়েন্ট (Simplon Orient) এবং এশিয়ার টান্স-কাস্পিয়ান রেলপথও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেপ কায়রো রেলপথ আজও অসমাপ্ত রহিয়াছে। উহা সমাপ্ত হইলে উহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ হইবে (৯,০০০ মাইল)।

সমুদ্রপথ—(Ocean Route)—(১) **উত্তর আটলান্টিক পথ**—(North Atlantic Route)—ইউরোপের পশ্চিম উপকূল ও আমেরিকার পূর্ব উপকূলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রপথ। এত অধিক জাহাজ আর কোন পথে যাতায়াত করে না। বাণিজ্য-জাহাজের পথ উত্তর আটলান্টিক দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। কারণ উহাই নিকটতম ব্যবধান।

(২) **সুয়েজ খাল পথ** (The Suez Canel Route)—ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলের দেশগুলিতে এবং অস্ট্রেলিয়ায় যাইবার ইহা প্রধান সমুদ্রপথ। সুয়েজ খাল কাটিয়া এই সমুদ্রপথ চলিত হইবার পর ভারত হইতে লণ্ডন যাইতে জাহাজের ৫,০০০ মাইল পথ সংক্ষেপ হইয়াছে।

(৩) **অন্তরীপ পথ** (The Cape Route)—ইউরোপ হইতে এই পথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়াও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া যায়। সুয়েজ খাল খনন হইবার পূর্বে এই পথে উভয় মহাদেশের মধ্যে যাতায়াত অধিক চলিত।

(৪) **পানামা খালপথ** (The Panama Canal Route)—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানামা যোজকেও খাল কাটা হইয়াছে। ঐ খাল দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে যাওয়া যায়। ইউরোপের পশ্চিম উপকূল হইতে অনেক জাহাজ এই পথে অস্ট্রেলিয়ায় যায়।

(৫) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথ** (Pacific Route)—চীন ও জাপান

হইতে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া এই পথে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যাওয়া যায়।

(৬) **দক্ষিণ আটলান্টিক পথ** (South Atlantic Route)—ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত।

জাহাজ খাল (Ship Canal)—ঐ সকল সমুদ্রপথ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার-লিভারপুল খাল, জার্মানীর কিয়েল খাল, চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানেল দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করে।

বিমানপথ (Air Route)—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে অতি দ্রুত বিমানপথের বিস্তৃতি ঘটিতেছে। বিমানযাত্রার বিপদ কমিয়াছে। বিমানের গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে ; না থামিয়া এক-একটি যাত্রীবিমান ৩,৬০০ মাইল পর্যন্ত উড়িতে পারে। যাত্রী, ডাক, বহুমূল্য দ্রব্যাদি ও মাছ, ফল প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যাদি বিমানে এক স্থান হইতে বহু দূরে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। মাত্র দুই দিনে বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ করা যায়। আধুনিকতম জেট বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল। বৃহৎ চার-ইঞ্জিনযুক্ত বিমানগুলিতে ৭০ জন যাত্রী যাইতে পারে। নিম্নের বিমানপথগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) লণ্ডন হইতে ফ্রান্সের মার্সাই ও গ্রীসের এথেন্স হইয়া মিশরের কায়রো পর্যন্ত।

(২) লণ্ডন হইতে কায়রো হইয়া ইরানের বাগদাদ, পাকিস্তানের করাচী, ভারতের যোধপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া হইয়া অস্ট্রেলিয়ার ডারউইন পর্যন্ত।

(৩) ফ্রান্সের প্যারী হইতে মার্সাই হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার ডাকার—সেখান হইতে আটলান্টিকের উপর দিয়া দক্ষিণ আমেরিকার পার্নম্বুকো, সেখান হইতে এক শাখা উত্তর আমেরিকার এবং অপর শাখা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত।

(৪) কায়রো হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ (কেপটাউন) পর্যন্ত।

(৫) লেনিনগ্রাড হইতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ধরিয়া মস্কো হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত।

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নলিখিত কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য কি ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রয়োজন বল :—

ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, চা।

কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল ফসল উৎপন্ন হয়?

২। পৃথিবীর কয়লা ও লৌহ উৎপাদন স্থান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। নিম্নলিখিত সমুদ্রপথগুলির একটি বিশদ বিবরণ লিখ :—

সুয়েজখাল পথ, পানামাখাল পথ ও উত্তর আটলাণ্টিক পথ।

৪। বিমানযোগে কলিকাতা হইতে লণ্ডন হইয়া ওয়াশিংটন যাইতে হইলে পথে কোন্ কোন্ বিমান-বন্দর হইয়া যাইতে হইবে বল।

এশিয়ার
আয়তন ও অবস্থান
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
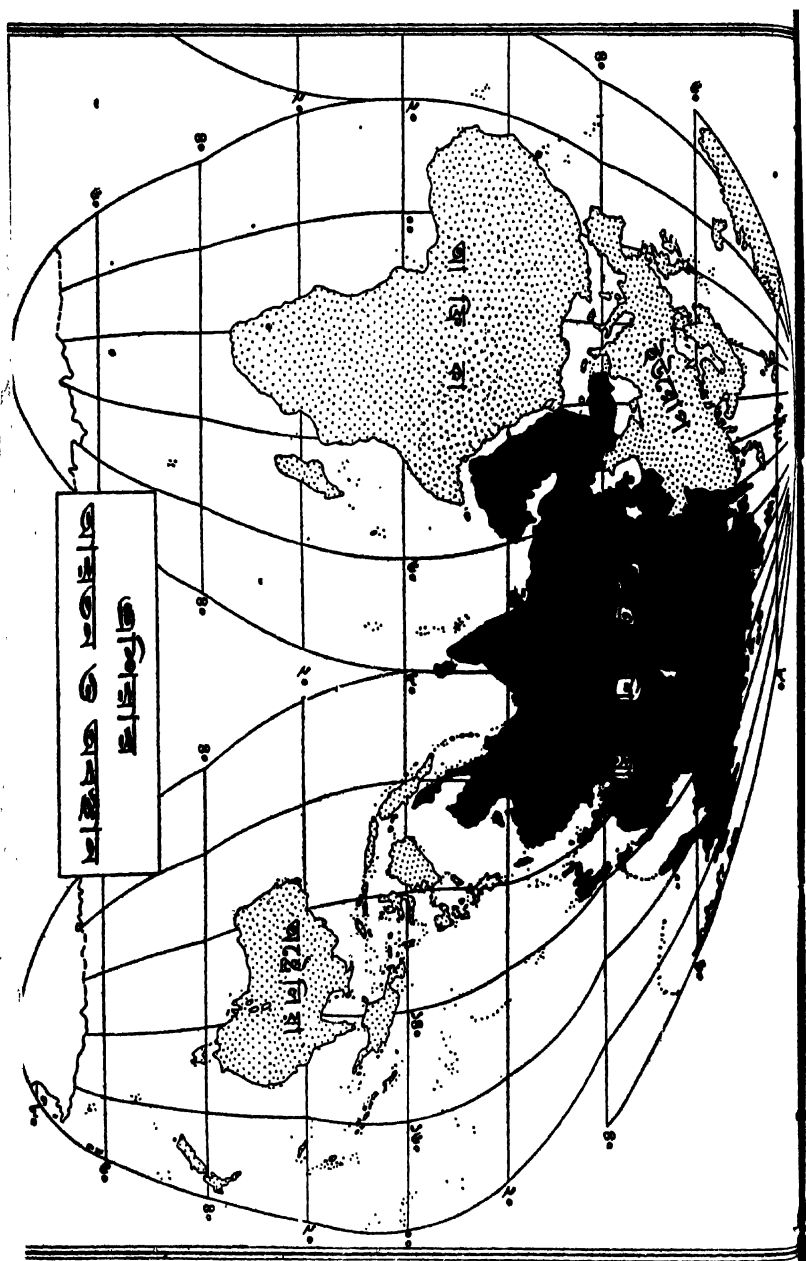
তৃতীয় খণ্ড

প্রথম ভাগ

এশিয়া

অবস্থান ও আয়তন

ভারত মহাসাগর ও আফ্রিকার উত্তরে বিশাল স্থলভাগ আছে, তাহা ইউরেশিয়া নামে পরিচিত। মানচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে এই ইউরেশিয়া মহাদেশ পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূখণ্ডেরই পশ্চিমাংশ ও পূর্বাংশ এশিয়া। ইউরেশিয়া অতি-মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে ক্ষুদ্র ইউরোপকে উপদ্বীপ বলিয়া মনে হয়। ইউরোপ ইউরেশিয়া মহাদেশের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র।

এশিয়ার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে উরাল পর্বত, ইউরাল নদী, কাস্পিয়ান হ্রদ, ককেশাস পর্বত, কৃষ্ণ সাগর, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর। ইউরাল, পর্বত, ককেশাস পর্বত, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগর ইউরোপ হইতে এবং লোহিত সাগর (ও সুয়েজ খাল) আফ্রিকা হইতে এশিয়াকে পৃথক করিতেছে। উত্তরে ৭৮° উ. অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে প্রায় নিরক্ষবৃত্ত অবধি এবং পশ্চিমে ২৬° পূ. দেশান্তর হইতে পূর্বে প্রায় ১৮০° দেশান্তর অবধি এশিয়া মহাদেশের বিস্তার।

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। ইহার আয়তন ১ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ-মাইল। ইহা আফ্রিকা মহাদেশের দেড়-গুণ ও উত্তর আমেরিকার প্রায় দ্বিগুণ বড়। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের মত পাঁচটি মহাদেশ পাশাপাশি রাখিলে এশিয়া মহাদেশের সমান হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ এশিয়া কত বিশাল।

এশিয়ার বিশেষত্ব

এশিয়া অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাদেশ। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, মানবসভ্যতা, লোকবসতি, ধনসম্পদ সব কিছুরই চরম অবস্থা এই মহাদেশে পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালাও যেমন এশিয়াতে

আছে তেমনি সমুদ্র-সমতল হইতে সহস্রাধিক ফুট নিম্ন স্থানও (মরুসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল) এশিয়াতে আছে। পৃথিবীর শীতলতম স্থান, উষ্ণতম অঞ্চল, বৃষ্টিবিরল, সর্বাধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল সবই এশিয়ায় আছে। এখানে এক দিকে যেমন মৌসুমী ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘননিবিড় অরণ্য আছে অন্য দিকে তেমনি বৃক্ষলতাহীন ঊষর মরুভূমিরও অভাব নাই। মানবসভ্যতারও অনেক বিচিত্র রূপ এই মহাদেশে দেখিতে পাইবে। এক দিকে প্রাচীন সভ্য চীনা, ভারতীয়, আরব ও আসিরীয়রা যেমন আছে, তেমনি অন্য দিকে অসভ্য, অর্ধ-সভ্য জাতিও অনেক আছে। এক দিকে জনমানবহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর অন্য দিকে পৃথিবীর ঘনতম বসতির অঞ্চল আছে। এশিয়াতে সব কিছুরই চরম অবস্থা দেখিতে পাইবে। ইহাই এশিয়ার বৈশিষ্ট্য।

উপকূল

আয়তনের অনুপাতে এশিয়ার উপকূল বেশী দীর্ঘ নহে, মাত্র ৩,৬০০ মাইল; অর্থাৎ প্রতি ৫০০ বর্গমাইল আয়তনে তটরেখা ১ মাইল মাত্র। তটরেখা খুব সামান্য পরিমাণে ভগ্ন। সাগর ও উপসাগরের সংখ্যাও অধিক নহে। এজন্য এশিয়ায় উৎকৃষ্ট বন্দর বেশী নাই।

পূর্ব উপকূলের উত্তর প্রান্তে **বেরিং সাগর**। **এলিউসিয়ান** দ্বীপপুঞ্জ ও **কামচকাটকা** উপদ্বীপ ইহার দক্ষিণে ও পূর্ব সীমায়। কামচকাটকার দক্ষিণ-পূর্বে **ওখটস্ক** সাগর। **কিউরাইল** দ্বীপপুঞ্জ ও **সাখালিন** দ্বীপ ইহার প্রান্ত ভাগে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে **জাপান সাগর, কোরিয়া** উপদ্বীপ অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। **জাপান** দ্বীপপুঞ্জ জাপান সাগরের পূর্বদিকে, কিছু দক্ষিণে **লুচু** দ্বীপপুঞ্জ ও **ফরমোসা** দ্বীপের মাঝে **পীত সাগর** (Yellow Sea); **সাণ্টুং** ও **লিয়াউ টুং** উপদ্বীপ দুইটি পীত সাগরে অবস্থিত। **চীন সাগর** দক্ষিণে **ফিলিপাইন** দ্বীপপুঞ্জ ও **বোর্নিও** অবধি বিস্তৃত। **টঙ্কিং** ও **শ্যাম** উপসাগর চীন সাগরের অংশ। **হাইনান** দ্বীপ **টঙ্কিং** উপসাগরের প্রান্তে অবস্থিত।

দক্ষিণ উপকূলে **ইন্দোচীন, ভারত ও আরব** তিনটি বৃহৎ উপদ্বীপ। **মালয়** উপদ্বীপ ইন্দোচীনেরই অংশ। ইন্দোচীন ও ভারতের মধ্যে **বঙ্গোপসাগর** ও **মালাক্কা** প্রণালী। **আন্দামান** ও **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণে **পক** প্রণালী ও **মান্নার** উপসাগর; উহারা **সিংহল** দ্বীপকে ভারত হইতে পৃথক করিতেছে। আরব এবং ভারতের (ও পশ্চিম পাকিস্তানের) মধ্যে **আরব সাগর, পারস্য উপসাগর** ও **এডেন উপসাগর**। **ওমান উপসাগর** (ও **অর্মাজ প্রণালী**) আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। **লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ** আরব সাগরে রহিয়াছে।

পশ্চিম উপকূলে **লোহিত সাগর** (Red Sea) ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে **লেভান্ট**। **সাইপ্রাস** দ্বীপ লেভান্টে অবস্থিত। **বাব-এল-মাণ্ডেব** প্রণালী আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মাঝখানে; **এশিয়া মাইনর** এই উপকূলের প্রধান উপদ্বীপ।

৭৪নং চিত্র—এশিয়ার ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য (উত্তর-দক্ষিণ)

উত্তর উপকূলে **চেলুস্কিন** অন্তরীপ সাইবেরিয়ার অন্তর্গত। সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বে **পূর্ব অন্তরীপ**। **লিয়াখোব, নিউ-সাইবেরিয়া** ইত্যাদি দ্বীপ উত্তর মহাসাগরে অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি

এশিয়ার ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। কোথাও ২৯,১৪১ ফুট উচ্চ এভারেস্ট শৃঙ্গ, আবার কোথাও ভূপৃষ্ঠ হইতে সহস্রাধিক ফুট নিম্নে অবস্থিত মরুসাগর-সন্নিহিত অঞ্চল। কোন স্থানে সুপ্রাচীন শিলা কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া মালভূমিরূপে বিরাজ করিতেছে, কোথাও বা পলিমাটিতে সমুদ্র ভরাট হইয়া ব-দ্বীপপ্রান্ত ক্রমশ আগাইয়া

চলিয়াছে। এশিয়ার প্রাকৃতিক বিভাগ মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ হইতে পারে :—

(১) উত্তর এশিয়ার সমভূমি; (২) মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতময় মালভূমি; (৩) নদীমাতৃক সমভূমি; (৪) দক্ষিণ এশিয়ার সুপ্রাচীন মালভূমি এবং (৫) পূর্ব উপকূলের ভঙ্গিল পর্বতময় আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জ।

(১) **উত্তর-এশিয়ার সমভূমি**—এশিয়ার উত্তরভাগে বিশাল সমভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমে অনুন্নত ইউরাল পর্বতের ঢালু পাদদেশ হইতে পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত ভূ-ভাগই কিন্তু সমতল নহে—মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় (৫০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ) আছে। এই অনুচ্চ মালভূমিগুলি ছাড়া ওবি নদীর অববাহিকায় এক বিশাল সমভূমি রহিয়াছে। ইনেসি ও লেনা নদীর তীরের সমভূমিগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিসর।

(২) **মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতময় মালভূমি**—এশিয়ার সমগ্র মধ্যভাগ জুড়িয়া ধনুকের মতো দক্ষিণদিকে বাঁকা সুবৃহৎ মালভূমি রহিয়াছে। পশ্চিম প্রান্তে তুরস্ক হইতে উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কামচকাটকা উপদ্বীপ পর্যন্ত ইহার বিস্তার। এই মালভূমির উপর দিয়া মোটামুটিভাবে সমান্তরাল কয়েকটি সমুন্নত শৈলশিরা অবস্থিত। পর্বতমালাগুলি দুইটি সুনির্দিষ্ট গ্রন্থি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একটি **পামির** ও অপরটি **আর্মেনিয়ান** গ্রন্থি। আর্মেনিয়ান গ্রন্থিতে পশ্চিমদিক হইতে **টরাস,** দক্ষিণ হইতে **লেবানন** ও উত্তর হইতে **ককেশাস** পর্বতমালা মিলিত হইয়াছে। পূর্বদিকে **এলবার্জ** পর্বতমালা **ইরান** মালভূমির উত্তর প্রান্ত ঘেঁষিয়া পামিরগ্রন্থি-সম্ভূত **হিন্দুকুশ** পর্বতমালার সঙ্গে মিশিয়াছে। ইরান মালভূমির দক্ষিণেও একশ্রেণী সমুন্নত (১৬,০০০ ফুট) পর্বতমালা আর্মেনিয়ান গ্রন্থির সহিত **সফেদকো** (বেলুচিস্তান) পর্বতের সংযোগ-সাধন করিয়াছে। এইভাবে দুইটি গ্রন্থি হইতে উদ্ভূত পর্বতমালা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

পামির মালভূমি হইতে (ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি—সেইজন্য ইহাকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়) পূর্বদিকে সমান্তরালভাবে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যথাক্রমে অভ্রভেদী **হিমালয়, কারাকোরাম, কুনলুন, আলটিয়ান, টাগ,**

আলটাই, ইয়াব্লোনোই, স্টানোভোই ও আরও পূর্বে চীনদেশের **সিন-লিংশান** পর্বতমালা বর্তমান।

(৩) **নদীমাতৃক সমভূমি**—এশিয়ার অভ্যন্তরস্থ মালভূমির ঠিক দক্ষিণেই কতকগুলি বড় বড় নদী দুই পাশে বিস্তৃত অববাহিকার সৃষ্টি করিয়াছে। আর্মেনিয়ান গ্রন্থির ঠিক দক্ষিণে **ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস** সমভূমি, পামিরের দক্ষিণে **সিন্ধু-গাঙ্গেয়** সমভূমি, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে **মেকং-ইরাবতী** সমভূমি এবং চীনদেশে **ইয়াংসিকিয়াং-হোয়াং-হো।** সমভূমিতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে।

(৪) **দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন মালভূমি**—এই সকল মালভূমি প্রাচীন যুগের শৈলমালায় গঠিত। কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি উহাদের নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। এখনও কোন কোন স্থানে উহারা ৭।৮ হাজার ফুট উঁচু (সিংহল)। অপেক্ষাকৃত নরম শিলাগুলি ক্ষয়ীভবন এবং স্তরচ্যুতির ফলে নীচু হইয়া গিয়াছে। নানাপ্রকার নগ্নীভূত পর্বতমালা এই সকল মালভূমিতে দেখা যায়। আরব ও ভারত উপদ্বীপে এবং ব্রহ্মদেশের পূর্বে এই শ্রেণীর মালভূমি দেখা যায়।

(৫) **পূর্ব উপকূলের ভঙ্গিল পর্বতময় আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল দ্বীপপুঞ্জ**—উত্তরে জাপান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে যবদ্বীপ পর্যন্ত এশিয়ার সমগ্র পূর্ব প্রান্ত ধরিয়া মালার মতো ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে। এগুলি এক সময় এশিয়ার মূল ভূখণ্ডেরই অংশ ছিল; মধ্যবর্তী স্থান বসিয়া গিয়া এখন সাগরে পরিণত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দ্বীপে অসংখ্য জীবন্ত আগ্নেয়গিরি দেখা যায়।

নদী ও হ্রদ

মধ্যভাগে অবস্থিত সু-উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হইতে এশিয়ার অধিকাংশ নদী বাহির হইয়াছে। ঢাল অনুসারে উহারা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অভিমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। কতকগুলি হ্রদেও পড়িয়াছে।

উত্তর মহাসাগরে পতিত নদী—**ওব** (Ob), **ইনেসি** (Yenesei) ও **লেনা** (Lena) উত্তরবাহিনী। ওব ও ইনেসি মোঙ্গোলিয়ার মালভূমি

হইতে এবং লেনা বৈকাল হ্রদ হইতে বাহির হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি বৃহৎ উপনদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত নদী—আমুর (Amur) ইয়াব্লোনয় পর্বত হইতে বাহির হইয়া প্রথমে পূর্বমুখী পরে উত্তরমুখী হইয়া ওখটস্ক সাগরে পড়িতেছে। **হোয়াং-হো** (Hwang-ho) এবং **ইয়াংসি-কিয়াং** (Yangtse-Kiang) প্রধানত পূর্ববাহিনী। হোয়াং-হো পার্বত্য অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে পীতবর্ণের 'লোয়েস' মাটি বহিয়া আনে, তাই ইহার অপর নাম **পীত নদী**। এই নদীতে বন্যা হইয়া অনেক সময় অধিবাসীদের অসীম দুঃখের কারণ ঘটে। তাই ইহা **চীনের দুঃখ** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হোয়াং-হো পেচিলি উপসাগরে পড়িতেছে। ইয়াংসি-কিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী—ইহা চীন-সাগরে পড়িয়াছে। ইউনান মালভূমি হইতে বাহির হইয়া **সিকিয়াং** (Si-kiang) টঙ্কিং উপসাগরে এবং **মেকং** (Mekong) ও **মেনাম** (Menam) দক্ষিণ চীন-সাগরে পড়িয়াছে।

ভারত মহাসাগরে পতিত নদী—সালুইন (Salwin) ও **ইরাবতী** (Irrawadi) ব্রহ্মদেশের উপর দিয়া মার্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। **গঙ্গা** ও **ব্রহ্মপুত্র** ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত **সিন্ধু নদ** (Indus) আরব সাগরে পড়িতেছে। আর্মেনিয়ার মালভূমি হইতে উদ্ভূত **টাইগ্রিস** (Tigris) ও **ইউফ্রেটিস** (Euphretes)—**সত-এল-আরব** (Shatt-al-Arab) নামে মিলিত হইয়া পারস্য উপসাগরে পড়িতেছে।

অন্তর্বাহিনী নদী—মধ্য এশিয়ার **তারিম** (Tarim) নদী লবনর হ্রদে, **ইউরাল** (Ural) কাস্পিয়ান সাগরে, **শির** (Sir) ও **আমু** (Amu) আরল হ্রদে পড়িয়াছে। ইরানের **হেলমন্দ** নদী হামুন হ্রদে এবং প্যালেস্টাইনের **জর্ডান** নদী মরুসাগরে পড়িয়াছে।

হ্রদ—সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে **কাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর বৃহত্তম** লবণাক্ত হ্রদ (১৭০ হাজার বর্গমাইল)। **আরল, বলখাস, উরুমিয়া,**

লবনর, হামুন, মরুসাগর, (Dead Sea), **তুজগুল** ও **ভান**—ইহারাও লবণাক্ত জলের হ্রদ। মরুসাগর একটি প্রস্ত উপত্যকায় সমুদ্র-সমতল হইতে ১৩০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর নিম্নতম হ্রদ।

স্বাদু জলের হ্রদগুলির মধ্যে **বৈকাল** (১৩০০ বর্গমাইল) বৃহত্তম। ইহা পৃথিবীর গভীরতম (প্রায় ৫,০০০ ফুট গভীর) হ্রদ। কাশ্মীরের **উলার হ্রদ** ও তিব্বতের **মানস সরোবর** স্বাদু জলের হ্রদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ।

জলবায়ু

নিরক্ষবৃত্ত হইতে সুমেরুর নিকট পর্যন্ত এশিয়ার বিস্তার। এই মহাদেশের জলবায়ু প্রধানত স্থলভাগ ও মহাসাগরের পরিবর্তনশীল উত্তাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শীতকাল—শীতকালে এশিয়ার মধ্যভাগে ও উত্তরভাগে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সুতরাং ঐ সময় সেখানকার বায়ু শীতল ও ভারী হইয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসে। ফলে একটি বিশাল বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। উচ্চ-প্রেষকেন্দ্র হইতে বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণাবর্তে বাহিরের দিকে ধাবিত হয়। এই বায়ু যেমন শীতল, তেমনি শুষ্ক। ইহা উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতের দিকে বহে বলিয়া উহাকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু বলা হয়। চীন দেশে ঐ বায়ু উত্তর হইতে এবং জাপানে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বহে। জাপান সাগর পার হইবার সময় ঐ বায়ু ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও কিছু জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে এবং জাপানের পশ্চিম উপকূলে বারিপাত ঘটায়। চীন দেশ হইতে আগত বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ ইন্দোচীনে বারিপাত ঘটাইয়া থাকে।

যাহাকে আমরা উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু বলি, তাহা সু-উচ্চ হিমালয় পর্বত পার হইয়া ভারতে কমই প্রবেশ করিতে পারে। ফলে ভারত দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটি স্বাধীন উচ্চপ্রেষের সৃষ্টি হয়। সেখান হইতে বায়ু উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হইয়া বঙ্গে প্রবেশ করে এবং তারপর বঙ্গোপসাগর পার হইয়া সিংহলে বারিপাত ঘটায়। দক্ষিণ মাদ্রাজে নভেম্বর মাসে বৃষ্টি হয়—তাহা মৌসুমী

বায়ুর জন্য নহে। উহা ঘূর্ণবাত-বৃষ্টি। এশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ভূমধ্যসাগরীয় বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মকাল—গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় অধিক উত্তপ্ত হয়। সুতরাং এই সময় এশিয়ার মধ্যভাগে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমে নিম্নপ্রেষের সৃষ্টি হয়। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর হইতে বায়ুপ্রবাহ বামাবর্তে মধ্য এশিয়ায় ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। ইহার ফলে যে মৌসুমীবায়ুর সৃষ্টি হয়—উহা ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ু, চীনে দক্ষিণ এবং জাপানে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমীবায়ু নামে অভিহিত।

এই বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে আসে বলিয়া উষ্ণ এবং সাগর পার হইয়া আসে বলিয়া জলকণাপূর্ণ হয়। ইহার প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলসমূহে, প্রচুর বারিপাত ঘটে।

জলবায়ু হিসাবে এশিয়াকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) **নিরক্ষীয় অঞ্চল**—সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় ও বোর্নিও দ্বীপে উষ্ণতা হেতু বারো মাস পরিচলন-বৃষ্টিপাত ঘটে; সেইজন্য এই অঞ্চল গভীর অরণ্যে ঢাকা। (২) **মৌসুমী অঞ্চল**—ভারত, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের উপর দিয়া মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে প্রধানত গ্রীষ্মকালে প্রবল বারিপাত ঘটে। এই অঞ্চলে বারো মাসই গরম। শীতকাল নাই বলিলেই হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনুসারে নিরক্ষীয় অরণ্য হইতে অর্ধ-মেরু—সকল প্রকার প্রাকৃতিক অঞ্চলই এখানে বর্তমান। (৩) **চৈনিক অঞ্চল**—ইহা মৌসুমী অঞ্চলেরই প্রকারবিশেষ। শীতকালে এই অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত পড়ে। (৪) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল**—তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও পশ্চিম পারস্যে বৃষ্টিপাত প্রধানত শীতকালে হয়। (৫) **মধ্য এশিয়ার স্টেপভূমি ও গোবি মরুভূমি**—মহাদেশীয় অবস্থানের জন্য এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম। তৃণাঙ্কুর-বিশিষ্ট ভূমি অথবা প্রস্তরময় মরুভূমি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। তাপ গ্রহণ ও বর্জন—উভয়ই এখানে দ্রুত হয়। ঋতুভেদে তাপের পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। (৬) **সরলবর্গীয় বনভূমি**—সমগ্র সোভিয়েট-এশিয়ার উত্তরভাগ জুড়িয়া এই বিশাল বনভূমি। এখানকার শীত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক ; **ভারখায়ানস্ক**

পৃথিবীর শীতলতম স্থান। (৭) **তুন্দ্রা**—তুন্দ্রা অঞ্চল উত্তর মহাসাগরতীরে অবস্থিত। এই অঞ্চল বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে। জীবনের চিহ্নমাত্র এখানে দেখা যায় না। ইহাকে তাই হিমমরু বলা হয়।

উদ্ভিজ্জ

জলবায়ুর সহিত স্বভাবজ গাছপালার নিকট সম্বন্ধ। এশিয়া মহাদেশকে নিম্নলিখিত রূপ উদ্ভিদ্ অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ

(১) **নিরক্ষীয় অরণ্য**—নিরক্ষবৃত্তের সান্নিধ্যহেতু অতিবৃষ্টিপাতের জন্য এখানে গভীর জঙ্গল হইয়াছে। আবলুস, মেহগিনি প্রভৃতি কাঠ এই জঙ্গল হইতে পাওয়া যায়। (২) **মৌসুমী অরণ্য**—বৃষ্টিপাত অনুসারে এই অরণ্য বিভিন্ন প্রকারের। যেখানে ৮০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত সেখানে চিরহরিৎ গভীর অরণ্য; ইহা নিরক্ষীয় অরণ্যেরই মত। যেখানে বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চি সেখানে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ উভয় জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। যেখানে বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি, সেখানে শুধু পর্ণমোচী বনভূমি এবং তৃণভূমি দেখা যায়। যে সকল স্থানে ২০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত সেখানে বাবলা প্রভৃতি কাঁটাগাছ জন্মে। (৩) **পার্বত্য অরণ্য**—হিমালয় প্রভৃতি উচ্চ পর্বতমালায় (৫,০০০ ফুট অবধি) শাল, দেওদার প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং তাহার উপরে পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। ১৪ হইতে ১৬ হাজার ফুট উচ্চে সাধারণত হিমরেখার অবস্থান। (৪) **সামুদ্রিক অরণ্য**—নদীর ব-দ্বীপে এই অরণ্য দেখা যায়। গঙ্গার ব-দ্বীপে সুন্দরবন। গোদাবরী, ইরাবতী প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপেও অরণ্য রহিয়াছে। (৫) **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি**—কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরল হ্রদ পর্যন্ত সমগ্র মহাদেশীয় অঞ্চল ব্যাপিয়া তৃণাঙ্কুরবিশিষ্ট ভূমি রহিয়াছে। বৃষ্টিপাত যেখানে খুব কম, সেখানে তৃণভূমি প্রায় নাই বলিলেই হয়; তথায় মরুপ্রায় অঞ্চল। (৬) **ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্য**—ভূমধ্যসাগরের তীরে পর্ণমোচী অরণ্যই অধিক। (৭) **সরলবর্গীয় অরণ্য**—সাইবেরিয়ায় অবস্থিত। পাইন, ফার প্রভৃতি কোমল কাষ্ঠের অরণ্য এখানে প্রচুর রহিয়াছে। ইহা এশিয়ার বৃহত্তম অরণ্য। (৮) **তুন্দ্রা**—তুন্দ্রা অঞ্চলে একপ্রকার শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া

তুরস্ক—এশিয়া মাইনরের মালভূমি, কুর্দিস্তান পর্বত, আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি এবং বসফরাস প্রণালীর অপর তীরে ইউরোপে অবস্থিত ইস্তাম্বুল শহরের চারিপাশে কতকটা জায়গা লইয়া বর্তমান তুরস্ক রাষ্ট্র। ইহার আয়তন ২,৯৬,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ।

পামীর পর্বতগ্রন্থির পশ্চিমদিকে যে দুইটি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি আছে তাহার পশ্চিমের মালভূমি তুরস্কের মালভূমি বা এশিয়া মাইনরের মালভূমি নামে পরিচিত। তাই তুরস্ক শুধু একটি রাষ্ট্রীয় অঞ্চলই নয়, ইহা এশিয়া মহাদেশের অন্যতম ভৌগোলিক অঞ্চলও বটে। নিম্নে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া হইল।

তুরস্কের অধিকাংশই মালভূমি। মধ্যভাগে এশিয়া মাইনরের মালভূমি অবস্থিত। মালভূমির মধ্যভাগে নিম্ন অংশে টুজগল হ্রদ অবস্থিত। চারিপার্শ্বের ভূমি এই হ্রদের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। মালভূমির উপরিভাগ অসমতল ও বন্ধুর। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি পাহাড় আছে। মোটামুটিভাবে মালভূমির গড়-উচ্চতা ২½ হাজার ফুট ধরা যাইতে পারে।

মালভূমির পূর্বদিকে আর্মেনিয়ার উচ্চভূমি, তুরস্কের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পর্বতগুলি এই উচ্চভূমিতে মিলিত হইয়াছে। এখানে সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চে ভ্যান হ্রদ অবস্থিত। এই অঞ্চলে এখনও অনেক আগ্নেয়গিরি দেখিতে পাইবে। আর্মেনিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট আরারাট (১৬,৯১৬ ফুট) একটি মৃত আগ্নেয়গিরি।

এশিয়া মাইনরের মালভূমির উত্তরদিকে ৮ হাজার হইতে ৯ হাজার ফুট উচ্চ পণ্টিক পর্বতমালা অবস্থিত। সমুদ্রের দিকে ইহা খুব খাড়াভাবে নামিয়া গিয়াছে, দক্ষিণদিকে ইহার ঢাল বেশী নহে। পণ্টিক পর্বতমালা পরস্পর সমান্তরাল কতকগুলি পর্বত লইয়া গঠিত। পণ্টিকের উত্তরে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে একটি অপ্রশস্ত নিম্ন উপকূলভূমি আছে।

কৃষ্ণ সাগর
বস্ফোরাস প্রণালী
মর্মরা সাগর
পন্টিক পর্বত
কিজিল ইর্মাক
সাকারিয়া
কানিক পঃ
ভ্যান হ্রদ
টোরাস
ইউফ্রেটিস
ভূমধ্য সাগর
সাইপ্রাস
তুরস্ক
(ভূ-প্রকৃতি)
স্কেল
মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০
৬০৫০ হইতে ১২০০০ ফুট
৩০০০ " ৬০০০ "
১২০০ " ৩০০০ "
০ " ১২০০ "
৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫

৭৫নং চিত্র

তুরস্ক
স্কেল
মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
আঙ্কারা
সিভাস
আমস্থন
জোঙ্গুলডাক
বন্দিরমা
আফিয়ন
কনিয়া
কাইসেরি
মালাটিয়া
আদানা
আনাতালিয়া
সাইপ্রাস
সিরিয়া
ইরাক
এর্জুরুম
ভ্যান হ্রদ
ইজমির
মর্মরা সাগর
সাকারিয়া
তাজ গোল

১৬নং চিত্র
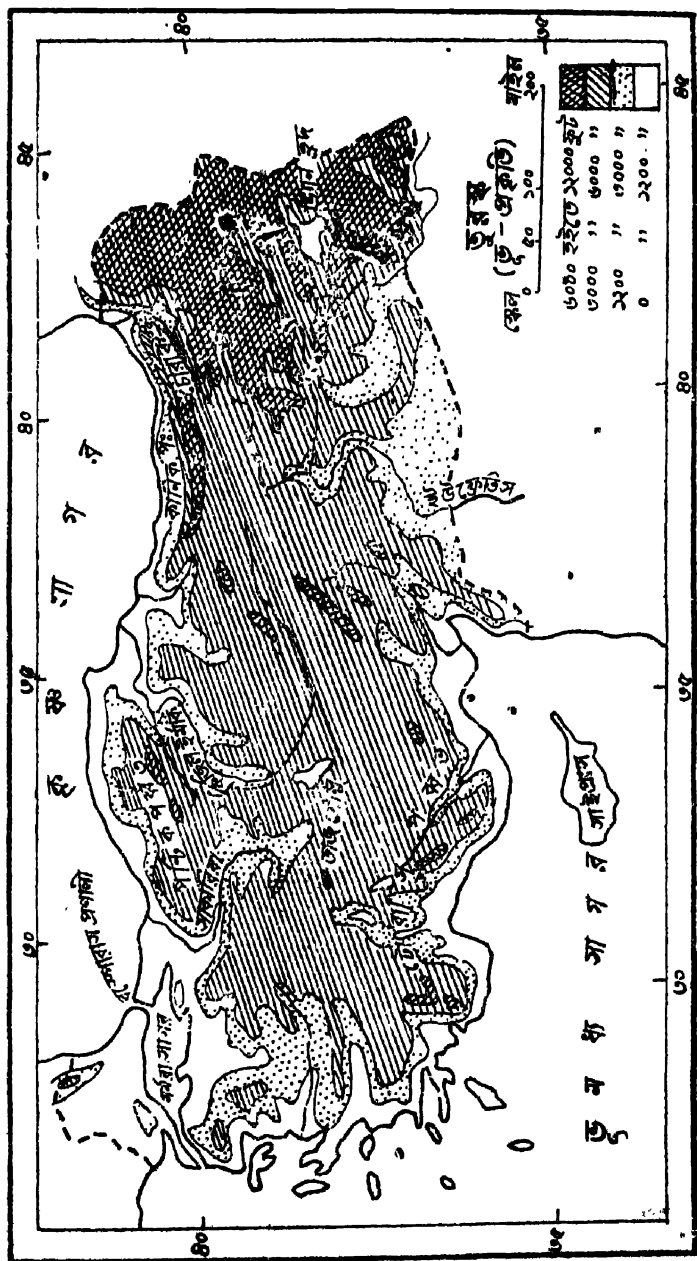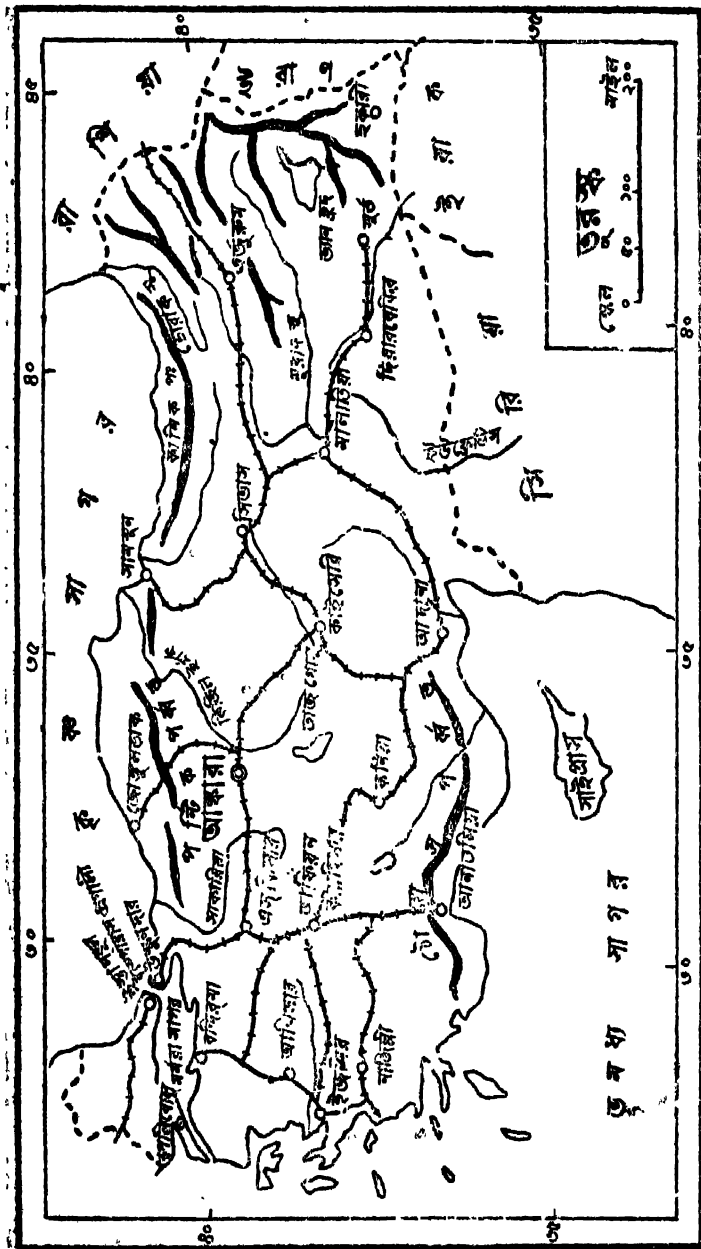
মালভূমির দক্ষিণে টরাস পর্বতশ্রেণী অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহার গড়-উচ্চতা ১০ হাজার হইতে ১১ হাজার ফুট। পাহাড়গুলি দক্ষিণে একেবারে ভূমধ্য-সাগরের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই কোন কোন স্থানে উপকূলের সমভূমি অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমদিকে পন্টিক ও টরাসের শাখাগুলি সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাই পশ্চিমদিকে অনেক উপসাগর ও খাড়ি আছে। তুরস্কে বিস্তৃত সমতলভূমি একেবারেই নাই। দক্ষিণ-পূর্বদিকে সিলিশিয়ার উর্বর সমতল ভূমি ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য সমতলক্ষেত্র এই দেশে নাই।

তুরস্ক পর্বতবেষ্টিত মালভূমি, তাই এখানকার জলবায়ু মধ্য এশিয়ার অন্যান্য মালভূমির মতই চরম। মালভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গড়-উত্তাপ ৯০° ফা.-এর অধিক হয়। শীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ুর প্রভাবে প্রচণ্ড শীত পড়ে। মালভূমির অধিকাংশ স্থান, বিশেষত পূর্বদিকের উচ্চভূমিতে শীতকালে অত্যন্ত বরফ জমে। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও খুব কম। কোথাও বৎসরে ১০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টিপাত শীতকালেই হয়। উপকূল-ভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু। তথায় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক, কেবল কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে সারা বৎসরই কিছু কিছু বারিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে ৩০ ইঞ্চি এবং কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অল্প এবং জলবায়ু চরম বলিয়া তৃণ ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদ জন্মে না। পন্টিক ও টরাস পর্বতের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলেই বৃক্ষ ও অরণ্য দেখা যায়।

পশুপালনই মালভূমির অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। অধিবাসীরা যাযাবর, ইহারা পশুপাল লইয়া তৃণের সন্ধানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অঞ্চলে প্রচুর চামড়া ও পশম উৎপন্ন হয়। তুর্কীরা এই পশম হইতে কাপড় ও কার্পেট তৈয়ারী করিয়া বিদেশে রপ্তানি করে। কৃষিকার্যের অধিকাংশ উপকূলের সমভূমিতে হয়। খাদ্যশস্যের মধ্যে গমই প্রধান ফসল। এ ছাড়া ধান, বার্লি, ভুট্টা, রাই, তুলা, তামাক, আঙুর, জলপাই, আফিম প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

তুরস্কের খনিজ সম্পদ প্রচুর। এখানে ক্রোমিয়াম, সোহাগা, লোহা, তামা, সীসা, সোনা, মেঙ্গানিজ ও কয়লার খনি আছে।

প্রধান নগর ঃ রাজধানী **আঙ্কারা** (লোকসংখ্যা দুই লক্ষ সাতাশি হাজার) মালভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানকার মেষের পশম বিখ্যাত। পশ্চিম উপকূলে **ইজমির** (পূর্বনাম স্মার্না) ভূমধ্যসাগর উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন শহর ও পোতাশ্রয়। **স্কুটারি** বস্‌ফরাস প্রণালীতে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। **ত্রাবজোন** (পূর্বনাম ত্রিবিজোন্দ) কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে বন্দর। **অর্জুরুম** বড় শহর।

ইরাণ বা পারস্য

পামির পর্বতগ্রন্থির পশ্চিমেই পর্বতবেষ্টিত বিশাল ইরাণের মালভূমি, এই মালভূমির পশ্চিম ভাগ পারস্য ও পূর্ব ভাগ আফগানিস্তান। পারস্যের মালভূমি আর্মেনিয়া হইতে পূর্বদিকে সিস্তানের নিম্নভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত; ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিন দিকই পাহাড়ে ঘেরা। উত্তরদিকে এলবুর্জ পর্বত প্রায় ৮ হাজার হইতে ১০ হাজার ফুট উচ্চ। ইহার অনেকগুলি উচ্চ শৃঙ্গ আছে। তন্মধ্যে দেমাভেন্দ্ (১৮ হাজার ৫ শত ৪৯ ফুট) শৃঙ্গই সর্বোচ্চ। এই পর্বতের পূর্বদিকে খোরসান পর্বত। দক্ষিণদিকে জাগ্রোস পর্বতমালা অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে ফার্সিস্তান ও মাকরানের পাহাড়। জাগ্রোস পর্বতমালা পশ্চিমদিকে প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচু, পূর্বদিকে পাহাড়গুলি ক্রমশ নীচু হইয়া গিয়াছে। মাকরানের পাহাড় মাত্র ২ হাজার ফুট উঁচু। এশিয়া মাইনরের মত এই মালভূমির মধ্যভাগও অত্যন্ত বন্ধুর। এখানে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত অনেকগুলি পাহাড় আছে। পূর্বদিকে বিশাল মরুভূমি, এই মরুভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে লবণাক্ত জলা জায়গা আছে। কাস্পিয়ান সাগর এবং পারস্য ও ওমান উপসাগরের উপকূলে সংকীর্ণ সমভূমি রহিয়াছে। ইরাণের পশ্চিম ভাগে উরুমিয়া হ্রদ অবস্থিত।

পারস্য চরম জলবায়ুর দেশ। মালভূমিতে জানুয়ারীর গড়-উত্তাপ হিমাঙ্কের কাছাকাছি নামে। দিনের বেলা অত্যন্ত গরম পড়ে, কিন্তু রাত্রে এত শীত

পড়ে যে তাপমাত্রা কখন কখন ০° ফা. পর্যন্ত নামিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল অত্যন্ত উষ্ণ। জুলাই মাসের গড়-উত্তাপ ৮৫° ফা. হইতে ৯০° ফা. হয়। সিস্তান অঞ্চলই সবচেয়ে বেশী উষ্ণ। তথায় গ্রীষ্মকালে প্রায় চারিমাস কাল অতি উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে দিবাভাগে কখন কখন
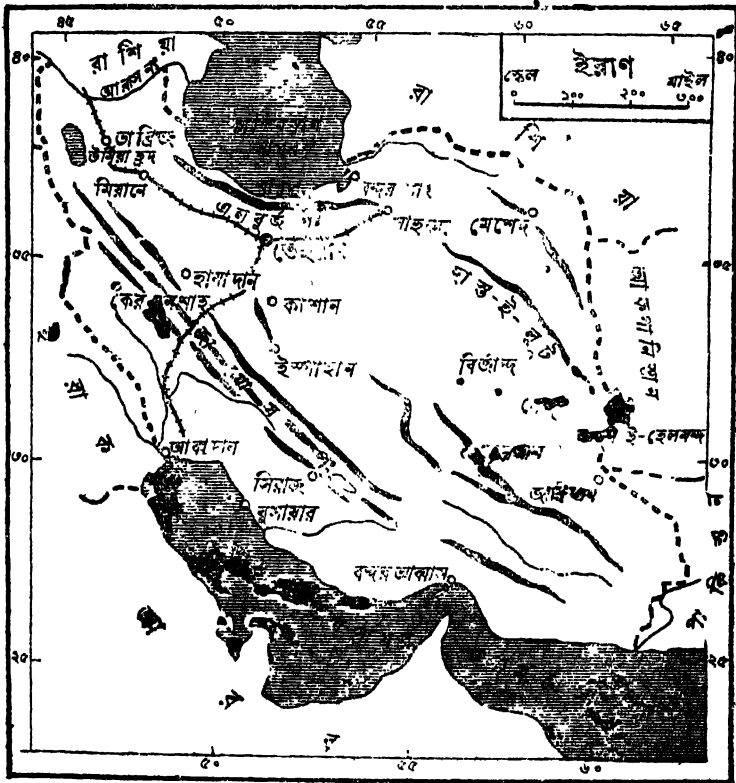
৭৭নং চিত্র

থার্মোমিটারের পারদ ১২৫° ফাঃ পর্যন্ত উঠিয়া যায়। মধ্যভাগেও বৃষ্টিপাত অল্প (১৩—১৪ ইঞ্চি), পূর্বভাগে আরও কম (৪—৫ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালেই বৃষ্টিপাত হয়। একমাত্র কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে ও এলবুর্জের

উত্তরদিকের ঢালে অত্যধিক বারিপাত হয়। শীতের শেষে যখন বরফ গলিতে আরম্ভ করে তখন অসংখ্য ছোট ছোট নদীর সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর ইহারা শুকাইয়া যায়।

· শুষ্ক জলবায়ু ও পার্বত্য ভূমির জন্য এখানে কৃষির চেয়ে মেষপালনই অধিক প্রচলিত। পারস্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর পশম উৎপন্ন হয়। ইরাণী শিল্পীরা এই পশম হইতে মূল্যবান কার্পেট প্রস্তুত করে। কাস্পিয়ান উপকূল ভিন্ন অন্য সকল স্থানেই জলসেচ ছাড়া কৃষিকার্য করা সম্ভব নয়। পারস্যের অনেক স্থানেই ক্যারেজের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয়। এখানে ধান, যব, গম, ইক্ষু, আঙুর, খেজুর, কমলালেবু ও তুলা উৎপন্ন হয়। খেজুরই দক্ষিণদিকের সর্বপ্রধান ফসল। পারস্য উপসাগরের তীরে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। বৎসরে প্রায় ১০ হাজার টন মৎস্য রপ্তানি করা হয়।

পরিবহণ ব্যবস্থা—পারস্যের পরিবহণ-ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। রেল লাইন ও সড়ক খুব কম আছে। রুশ সীমান্ত হইতে তাব্রিজ এবং কাস্পিয়ান হইতে তেহ্‌রান পর্যন্ত রেলপথ আছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় পারস্য উপসাগরের বন্দর শাহ্‌পুর হইতে কাস্পিয়ান তীরের বন্দর শাহ্‌ পর্যন্ত একটি রেল লাইন খোলা হইয়াছে

শিল্প ও বাণিজ্য—পারস্যের খনিজ সম্পদের মধ্যে পেট্রোলিয়মই প্রধান। জাগ্রোস্ পর্বতের পাদদেশেই পেট্রোলিয়মের খনিগুলি অবস্থিত। খনি অঞ্চল হইতে নলের সাহায্যে পেট্রোলিয়ম পারস্য উপসাগরের তীরে নীত হয়। সেখান হইতে জাহাজে করিয়া এই তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। পারস্য সরকারের রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ এই তৈলশিল্প হইতেই আসে।

প্রধান নগর—রাজধানী **তেহ্‌রান** মালভূমিতে অবস্থিত। ইহা পারস্যের সর্বপ্রধান শহর। **ইস্পাহান** প্রাচীন রাজধানী ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। **মেসেদ** খোরসান প্রদেশের রাজধানী। ইহা সিয়া মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান এবং কার্পেট, ভেলভেট ও রেশম-শিল্পের কেন্দ্র। **তাব্রিজ,** উরুমিয়া হ্রদের নিকটে একটি বাণিজ্যস্থান। **সিরাজ** মদ ও গোলাপী আতরের জন্য বিখ্যাত। ইহা মহাকবি হাফেজের জন্মস্থান। **আওয়াজ** ও **আবাদান**

খনিজ তৈল-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। আবাদানের তৈলশোধন কারখানা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ইহা তৈলরপ্তানীর বিখ্যাত বন্দর। **বুসারার, বন্দরসাহ্‌পুর, বন্দর আব্বাস** পারস্য উপসাগরের তীরে বিখ্যাত বন্দর।

আফগানিস্তান

ইরাণী মালভূমির পূর্বাংশই আফগানিস্তানের মালভূমি। প্রধানত এই মালভূমি লইয়াই আফগানিস্তান রাষ্ট্র। ইহার আয়তন প্রায় ২½ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায ১ কোটি ২০ লক্ষ। উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ মাইল। আবার পশ্চিমে হিরাট হইতে খাইবাব গিবিবর্ত্ম পর্যন্ত ইহা প্রায় ৬০০ মাইল লম্বা।

তুরস্ক ও ইরাণের মত আফগানিস্তানও একটি পর্বতবেষ্টিত মালভূমি। ইহাব উত্তরদিকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা মধ্য এশিয়ার নিম্নভূমি হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পূর্বদিকে সুলেমান, খিরথার্ .পর্বত এবং দক্ষিণে বেলুচিস্তানের ছাগাই পাহাড়। পশ্চিমদিকে হামুন-ই-হেলমন্দের নিম্নভূমি। আফগানিস্তানকে ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **আফগান তুর্কিস্তান** বা **বক্ত্রিয়া**—ইহা হিন্দুকুশের উত্তরে অবস্থিত। ইহা রুশিয়ার তুর্কিস্তান সমভূমিরই একটা অংশ। এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক, কৃষিকার্যের অনুপযোগী। তাই এখানে লোকবসতি কম। জলসেচের ব্যবস্থা করিলে এই অঞ্চল ভাল কৃষিভূমিতে পরিণত হইবে।

(২) **হিন্দুকুশের পার্বত্যভূমি**—আফগানিস্তানের সমগ্র উত্তর ভাগ ব্যাপিয়া হিন্দুকুশ পর্বত অবস্থিত। ইহা অতিক্রম করিয়া উত্তরে যাওয়া খুবই দুরূহ। এই পর্বতের গড়-উচ্চতা ১৫,০০০ ফুটের অধিক। কোন কোন অংশে ইহার উচ্চতা ১৮,০০০ ফুটেরও অধিক। ভূমির বন্ধুরতার জন্য এই অঞ্চলেও লোকবসতি অত্যন্ত কম।

(৩) **বাদাখশান**—হিন্দুকুশের উত্তরে ও বক্ত্রিয়ার পূর্বে বাদাখশানের পাহাড়িয়া অঞ্চল। এই অঞ্চলে বসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলের

পাহাড়গুলি জঙ্গলে ঢাকা। নিম্ন উপত্যকাভূমিতে তৃণক্ষেত্র আছে। এখানে মেষচারণই প্রধান কাজ বটে, তবে সামান্য কৃষিকার্যও হয়।

(৪) **কাবুলিস্তান**—কাবুল শহরের চতুর্দিকে এবং কাবুল উপত্যকায় ধাপে ধাপে অনেক সমতল ভূমি দেখা যায়। এই সকল সমতল ভূমি লইয়াই
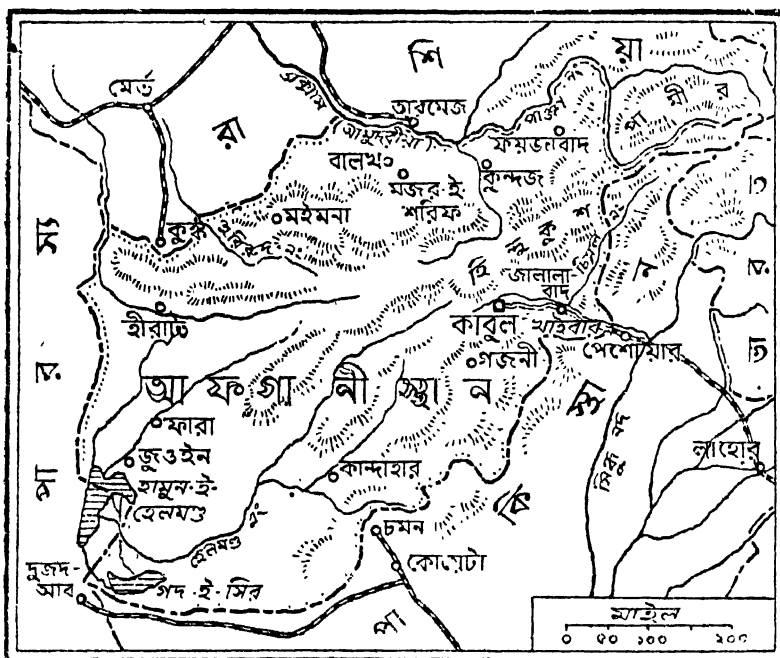
৭৮নং চিত্র—আফগানিস্তান

কাবুলিস্তান গঠিত। ইহার উচ্চতা ৪,০০০—৬,০০০ ফুট। কাবুল নদী ও ইহার উপনদীগুলির কল্যাণে এখানে জলের অভাব হয় না। তাই এই অঞ্চলে অনেক উর্বর কৃষিক্ষেত্র আছে। আফগানিস্তানের মধ্যে এই অঞ্চলের লোকবসতিই সর্বাপেক্ষা ঘন। এখানে প্রচুর গম, বার্লি, মিলেট এবং ফল উৎপন্ন হয়।

(৫) **হাজারা**—আফগানিস্তানের মধ্যভাগে প্রায় সমগ্র মধ্য আফগানিস্তান জুড়িয়া এই অঞ্চল। ইহার ভূমি অত্যন্ত বন্ধুর। এই অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, তবে সমতলভূমি না থাকায় চাষের কোন সুবিধা নাই। এখানে কোন কোন স্থানে তৃণভূমি আছে। এই সকল তৃণভূমিতে পশুচারণই একমাত্র উপজীবিকা। লোকবসতিও তাই কম। পাকিস্তান সীমান্তের নিকটে বসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। এই দিকে পাঠানদের বাস। এই দিকেই প্রাচীন কান্দাহার ও গজনী শহর অবস্থিত।

পশ্চিমের মরুভূমি অঞ্চল—এই মরু অঞ্চল সমগ্র আফগানিস্তানের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। এখানকার ভূমি ক্রমশ নিম্ন হইয়া আফগান-পারস্য সীমান্তের সিস্তানের নিম্নভূমিতে মিশিয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া হেলমন্দ নদী প্রবাহিত হইয়া সিস্তানে হামুন-ই-হেলমন্দ হ্রদে পড়িয়াছে। এই হেলমন্দ নদীর উভয় তীরে সরু ফালির মত উর্বর কৃষিক্ষেত্র আছে। ঊষর বালুকাময় মরুভূমির মধ্যভাগে এই সবুজ ফালিকে ভারী সুন্দর দেখায়। এই মরু অঞ্চলে যাযাবর বেলুচীরা বাস করে।

জলবায়ু—আফগানিস্তানের জলবায়ু চরম। শীত ও গ্রীষ্মের তাপের প্রখরতা এখানে অত্যন্ত বেশী। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে দিনের উত্তাপ ১১০° ফা.-এর চেয়েও বেশী হয়। আবার শীতকালে অধিকাংশ স্থানে বরফ পড়ে। বৃষ্টিপাত খুব সামান্যই হয়। শীতেই বৃষ্টিপাত হয়।

আফগানিস্তান শুষ্ক পার্বত্য রাজ্য। বৃষ্টিপাতও খুব সামান্যই হয়। তবে এখানে কাবুল, হেলমন্দ, হরিরুদ ও মুর্গাভ প্রভৃতি তুষারগলা জলে-পুষ্ট কয়েকটি নদী আছে। প্রধানত জলসেচের সাহায্যে নদী উপত্যকায় ও উচ্চ সমভূমিতে কৃষিকার্য হয়। মরুভূমিতে মরূদ্যান ভিন্ন আর কোথাও কৃষিকার্য হয় না। গম, ধান, বার্লি, মিলেট, তামাক, ভুট্টা ও বীটের চাষ হয়। আঙুর, বেদানা, আপেল প্রভৃতি ফলও এখানে জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলে মেষপালনই অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা। এই দেশ হইতে পশুচর্ম ও অনেক পশম বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

প্রধান নগর: রাজধানী **কাবুল** আফগানিস্তানের বৃহত্তম নগর এবং

সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের সহিত স্থলবাণিজ্য চলে। **হিরাট**—উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত সুরক্ষিত শহর। **কান্দাহার** দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও অতি প্রাচীন শহর। এখান হইতে বোলান গিরিপথের মধ্য দিয়া পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য চলে। **গজনী** শহরে সুলতান মামুদের রাজধানী ছিল। ইহাও অতি প্রাচীন শহর। **মাজার-ই-শরীফ**—মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান।

ভূমধ্যসাগরতীরের দেশ

তুরস্কের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরের **সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল** ও **জর্ডন** এই দেশ কয়টি লইয়া যে অঞ্চল তাহাকে আমরা ভূমধ্যসাগরতীরের দেশ নামে অভিহিত করিতে পারি।

ভূ-প্রকৃতি—এই অঞ্চলকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চারটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—

(১) **ভূমধ্যসাগর উপকূলের সমভূমি**—এই সমভূমির দক্ষিণদিক বেশ প্রশস্ত। উত্তরদিকে ইহা ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে। মাউণ্ট কারমেলের নিকটে ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তারপর আবার উত্তরদিকে ইহার পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ক্রমে তুরস্কের দক্ষিণে সিলিসিয়ার সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে উত্তরদিকের কোথাও ইহা বেশী প্রশস্ত নয়। এই উপকূল-ভাগের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয়। শীতগ্রীষ্মের তাপের প্রখরতা কম। আগস্ট মাসেই তাপ সবচেয়ে অধিক হয়, তবে আগস্টের তাপমাত্রা কখনও গড়ে ৮০° ফা.-এর বেশী হয় না। শীতকালের উত্তাপ ৪৫° ফা. হইতে ৫০° ফা.-এর মত হয়। বৃষ্টিপাত শীতকালেই হয়। তবে দক্ষিণদিক অপেক্ষা উত্তরদিকেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই উপকূলভাগের মৃত্তিকাও অত্যন্ত উর্বর। জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুকূল বলিয়া এই উপকূল-ভাগ কৃষিকার্যের অত্যন্ত উপযোগী। গমই এই অঞ্চলের প্রধান ফসল। তাছাড়া ভুট্টা, বার্লি, এবং জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, কমলা প্রভৃতি ফলও এখানে প্রচুর হয়।

(২) **মধ্যভাগের পার্বত্যভূমি**—উপকূল সমভূমি ও পূর্বদিকের গ্রস্ত উপত্যকার মধ্যভাগে এই পার্বত্যভূমি অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ইহা প্রায় ২৫ হইতে ৪০ মাইল প্রশস্ত। নিম্নভূমি, নদী উপত্যকা ও গিরিপথ এই পার্বত্য ভূমিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে, কারমেল শৃঙ্গের উত্তরে এসড্রেলন সমভূমি ইহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণের এই অংশ সামারিয়া ও জুডিয়া অঞ্চলের পার্বত্যভূমি লইয়া গঠিত। ইহা চুনাপাথর ও খড়িমাটি-জাতীয় শিলায় গঠিত। এই অংশের উচ্চতা ৫,০০০—৬,০০০ ফুট। ইহা অনুর্বর, তাই এখানে কৃষিকার্য হয় না। এখানকার জলবায়ুও উপকূল অপেক্ষা শীতল। শীতকালে বরফ পড়ে। সমভূমির উত্তরে গ্যালিলির উচ্চভূমি। ইহা লাভা-সৃষ্ট উচ্চভূমি, বৃষ্টিপাতও এখানে অধিক। এই লাভা উর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য ভূমিকে ওরনটিস নদী ও ত্রিপলি গিরিবর্ত্ম তিন খণ্ডে ভাগ করিয়াছে। উত্তরের অংশ আমানাস পাহাড়, মধ্যের অংশ আনসারিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণের অংশ লেবাননের পাহাড় নামে খ্যাত। এই অংশও চুনাপাথর-জাতীয় শিলায় গঠিত। উপত্যকা অঞ্চলেই বসতি বেশী।

(৩) **নিম্ন উপত্যকা ভূমি**—মধ্যভাগের পার্বত্য ভূমির পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অল্পপরিসর একটি নিম্ন উপত্যকা আছে। ইহাকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। দক্ষিণের অংশটি একটি গ্রস্ত উপত্যকা এবং ১০ মাইল হইতে ১৫ মাইল প্রশস্ত। পূর্বদিকে আরবের মালভূমি ও পশ্চিম-দিকের পার্বত্য ভূমি এখান হইতে খুব খাড়াভাবে হঠাৎ উঁচু হইয়া গিয়াছে। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া জর্ডন নদী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণদিকে মরুসাগরে পড়িয়াছে। এই নদী খ্রীষ্টানদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। এই উপত্যকা সমুদ্র-সমতল হইতেও নিম্ন। মরুসাগরের তটভূমি সমুদ্র-সমতল অপেক্ষা ১,২৯২ ফুট নিম্ন। এখানকার জলবায়ু উপকূল অপেক্ষা উষ্ণ ও চরম। বৃষ্টিপাত কম হয়। জর্ডন নদী হইতে সেচের ব্যবস্থা করিয়া এখানে গম, বার্লি ও তামাকের চাষ হইতেছে। ডুমুর, আঙুর প্রভৃতি ফলও এখানে উৎপন্ন হয়।

উত্তরের নিম্ন উপত্যকা দক্ষিণদিক হইতে অনেক উঁচু। ইহার কোন অংশই সমুদ্র-সমতল হইতে নীচু নয়। এখানকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র,

ভূমি উর্বর। উত্তরদিকে এন্টিয়কের উর্বর সমভূমি। এখানে গম, বার্লি প্রভৃতি জন্মে। এখানে গুটিপোকার জন্য তুঁত গাছের চাষও হয়। এই অঞ্চল রেশম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণদিকে ওরনটিস নদীর উপত্যকার মধ্যাংশে জলাভূমি। এই অঞ্চল অস্বাস্থ্যকর ও কৃষিকার্যের অনুপযোগী। তবে ওরনটিস নদীর উধ্ব প্রবাহের উপত্যকা উর্বর। সেখানে কৃষিকার্য হয়।

(৪) **পূর্বের পার্বত্য ভূমি**—কেবল উত্তরদিকেই পার্বত্য ভূমি আছে। জর্ডন উপত্যকার পূর্বদিকে এরূপ কোন পাহাড় নাই। এন্টি লেবাননের পাহাড়গুলি এখানেই অবস্থিত। এখানে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হয়। এই পাহাড়ের যে সকল অংশে সমভূমি আছে তথায় চাষ হয়। অন্যত্র পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা।

এই অঞ্চলে আরব অধিবাসীই অধিক। সিরিয়া, লেবানন এবং জর্ডন আরব রাষ্ট্র। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ইসরায়েল নূতন ইহুদী রাষ্ট্র। ১৯৪৮ অব্দের মে মাসে ইংরাজ প্যালেস্টাইন রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন আরব রাষ্ট্রসংঘ ও ইহুদীদের মধ্যে লড়াই বাধে। প্যালেস্টাইনের পশ্চিমাংশ লইয়া ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাংশে জর্ডন রাজ্য।

প্রধান নগর ঃ বীরুট—লেবাননের রাজধানী ও উৎকৃষ্ট বন্দর। **ত্রিপলি** ভূমধ্যসাগরতীরে তৈলরপ্তানির বন্দর। **আলেপ্পো**—বিখ্যাত রেলপথ-জংশন। এখান হইতে বসরা, মদিনা ও মিশর পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। **দামাস্কাস**—সিরিয়ার রাজধানী এবং প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **টেলআবিব**—ইসরায়েলের রাজধানী। **জাফা**—ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী অন্যতম প্রধান বন্দর। **হাইফা**—বন্দর হইতে তৈল রপ্তানি হয়। **আম্মান**—জর্ডনের রাজধানী। **ইরবিদ**—জর্ডনের অন্যতম প্রধান নগর। ইসরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে এখানের লোকসংখ্যা খুব বাড়িয়াছে।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস সমভূমি—টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী আনাতালিয়ার মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পার্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া ইউফ্রেটিস নদী সিরিয়ার স্তেপ অঞ্চলে সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর ইরাকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে অনেক দূর প্রবাহিত হইয়া বসরার নিকট

টাইগ্রিসের সহিত মিলিত হইয়াছে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের এই মিলিত প্রবাহের নাম সাট-এল-আরব। ইহা পারস্য উপসাগরে পতিত হইতেছে। ইরাকে ইউফ্রেটিস নদীর কোন উপনদী নাই, এজন্য বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নদীর জল বৃদ্ধি পায় না। এই নদী অত্যন্ত শুষ্ক অঞ্চলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। এ ছাড়া ইরাকের উর্ধ্বাংশ প্রবেশ্য শিলায় গঠিত। তাই বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল মাটির নীচে চলিয়া যায়। এই জল পরে ভূপৃষ্ঠের তল দিয়া প্রবাহিত হইয়া নদীতে পড়ে। নদীর দৈর্ঘ্যের তুলনায় নদীবক্ষের ঢাল বেশী। তাই নদীর স্রোত বেশী এবং স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালানো খুবই কষ্টকর। নদীর ক্ষয়কার্য এখনও বন্ধ হয় নাই, তাই বারোমাসই নদীর জল ঘোলাটে থাকে। এই নদী নিম্নপ্রবাহে স্বাভাবিক বাঁধ তৈয়ারী করায় নদীখাত পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে অনেকটা উঁচু হইয়া গিয়াছে। ইহাতে নিম্ন ইরাকে জলনিকাশের অসুবিধা ঘটিয়াছে। তাছাড়া নদীও মাঝে মাঝে বাঁধ ভাঙিয়া গতি পরিবর্তন করে। ইহাতে প্রবল বন্যা হয় এবং দেশের অনেক ক্ষতি হয়। ইউফ্রেটিস নদী অতীতে অনেক বার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। নদীর পরিত্যক্ত খাতের কোন কোনটি এখন সেচের খালরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

টাইগ্রিস নদী ইরাক ও তুর্কী সীমান্তের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীও দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ইউফ্রেটিসের সঙ্গে মিলিত হইয়া সাট-এল-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়িয়াছে। এই নদীর ঢাল ইউফ্রেটিসের চেয়েও বেশী, তাই ইহার স্রোতও অপেক্ষাকৃত বেশী। ইহা এখনও ক্ষয়ক্রিয়া বন্ধ করে নাই। এই নদী প্রচুর পলি বহন করিয়া লইয়া যায়। নদীর জল বারোমাসই ময়লা থাকে। এই নদীও নিম্নাংশে স্বাভাবিক বাঁধ সৃষ্টি করিয়াছে। টাইগ্রিস নদী জাগ্রোস পর্বতের পাদভূমির অতি নিকট দিয়া প্রবাহিত। জাগ্রোস পর্বতে বৃষ্টিপাতও অধিক হয়। তাই বৃষ্টির পর অসংখ্য জলধারা টাইগ্রিসে আসিয়া মিলিত হয়। টাইগ্রিসের উপনদীর মধ্যে বড় জাব, ছোট জাব, ডিয়ালা এবং করুন নদীই প্রধান। এই সকল কারণে বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাইগ্রিসে জলস্ফীতি ঘটে। এত অকস্মাৎ জলবৃদ্ধি হয় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০।১২ ফুট জলবৃদ্ধি হওয়া খুব অস্বাভাবিক

মনে হয় না। এই নদীকে গড়ান জলের (surface water) উপরই অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। তাই বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল কমিয়া যায়। ইউফ্রেটিসে কিন্তু তাহা হয় না। ইউফ্রেটিসে খুব ধীরে ধীরে জলের পরিমাণ কমিতে থাকে।

এই সমভূমির এক দিকে কুর্দিস্তান পাহাড় ও জাগ্রোস পর্বতের পাদভূমি, অন্য দিকে আরবের মালভূমি। সমভূমি হইতে এই উচ্চভূমি হঠাৎ উঁচু হইয়া গিয়াছে। এই সমভূমির উর্ধ্বভাগ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শিলায় গঠিত। ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহা সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। নিম্নাংশ ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস ও অন্যান্য নদীর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

জলবায়ু—এই সমভূমির জলবায়ু চরম। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে, দিনের বেলা তাপমাত্রা ১১০°—১১৫° ফা. পর্যন্ত উঠে। আবার শীতকালে শীতও কম পড়ে না। উর্ধ্বাংশে শীতকালে বরফ পড়ে। জানুয়ারীর গড়-উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। নিম্নাংশেও কখন কখন এত শীত পড়ে যে, কয়েকদিন পর্যন্ত বরফ জমিয়া থাকে। বৃষ্টিপাত শীতকালেই হয়। এই সমভূমির অধিকাংশ স্থানেই বৎসরে ৫ ইঞ্চির অধিক বারিপাত হয় না। কেবল উত্তর-দিকে টাইগ্রিসের উত্তরে ১৫ ইঞ্চির মত বৃষ্টি হয়।

এখানকার মৃত্তিকা উর্বর। কিন্তু জলের অভাবের জন্য কৃষিকার্যের ভীষণ অসুবিধা হয়। এই সমভূমির অধিকাংশ স্থান লইয়া ইরাক দেশ। ইরাক কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে খালের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। অতি প্রাচীনকালেও এখানে সেচব্যবস্থার প্রচলন ছিল। এই দেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। ব্যাবিলনের সভ্যতা এখানেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাবিলন ও নিনেভ নগরী এখানেই অবস্থিত। অতীতে আসিরীয় অঞ্চল অর্থাৎ উর্ধ্ব ইরাকের টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস-মধ্যবর্তী ও টাইগ্রিস ও কুর্দিস্তান পাদভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি অত্যন্ত ঘন ছিল। আজ সেই সকল অঞ্চলে বসতি খুব কম। যে দেশে এককালে প্রাচুর্য ছিল আজ তাহা অতি দরিদ্র। কৃষির অধঃপতনই ইহার

কারণ। যেদিন হইতে দেশ সেচখালের অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেইদিন হইতেই ইরাকের অবনতি শুরু হইয়াছে। সংস্কারের অভাবে পুরানো খালগুলি মজিয়া যায়। সেচের অসুবিধায় কৃষিকার্য অচল হইয়া পড়ে। সমৃদ্ধ দেশ দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। এখন আবার খালগুলির সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। নূতন নূতন খালও কাটা হইয়াছে। নদীতে বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া বারোমাস খালগুলিতে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্ন ইরাকে জলনিকাশের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী দুইটিই এই দেশের প্রাণ। তাই **ইরাককে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের দান বলা হয়।**

কৃষিজাত দ্রব্য—যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে কৃষিকার্যই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, অন্যত্র মেষপালনই প্রধান পেশা। খাদ্যশস্যের মধ্যে ইরাকে গম ও বার্লিই প্রধান। নিম্নাংশে ধানের চাষও আছে। তুলা ও তামাক সামান্য পরিমাণে এখানে উৎপন্ন হয়। ইরাকের সর্বপ্রধান ফসল খেজুর। পৃথিবীর আর কোথাও এত খেজুর উৎপন্ন হয় না। বিশ্বের বাজারে ইরাকই সবচেয়ে বেশী খেজুর আমদানি করে। এই দেশে অনেক মেষ ও ছাগল প্রতিপালিত হয়। এজন্য এখানে প্রচুর পশম ও মেষচর্ম পাওয়া যায়।

খনিজ দ্রব্য—এই অঞ্চলের খনিজ পদার্থের মধ্যে পেট্রোলিয়ামই প্রধান। নলের সাহায্যে এই তৈল ভূমধ্যসাগর-তীরের বন্দরগুলিতে প্রেরিত হয়।

বাগদাদ—টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা ইরাকের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **বসরা**—প্রধান বন্দর। সাট-এল-আরবের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে প্রচুর খেজুর রপ্তানি হয়। **মোসুল**—টাইগ্রিসের তীরে ঊর্ধ্ব ইরাকে অবস্থিত বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকটে **নিনেভ** প্রাচীন আসিরীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। **ব্যাবিলন**—ইউফ্রেটিস-তীরবর্তী প্রাচীন শহর।

আরব উপদ্বীপ—ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ। ইহার উত্তরে মেসোপটেমিয়ার সমভূমি, সিরিয়া এবং জর্ডন। অন্য তিন দিকে সমুদ্র। ইহার আয়তন প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটির চেয়ে অল্প বেশী।

এই মালভূমি প্রাচীন আগ্নেয় ও কেলাসিত শিলায় গঠিত। অধিকাংশ স্থানেই ভূমির উপরিভাগে আগ্নেয় শিলা দেখা যায়। উত্তরদিকে ভূমির উপরিভাগ নবীন চুনাপাথর ও বেলেপাথর-জাতীয় শিলায় আবৃত। এই মালভূমি অতি প্রাচীনযুগে সৃষ্ট হইয়াছে। তাই যুগযুগব্যাপী প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে ইহার উচ্চাবচতা (relief) অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। যেখানে অত্যন্ত কঠিন শিলা আছে সেখানেই কেবল পাহাড়-পর্বত দেখিতে পাইবে। পশ্চিমাংশে হেজাজের পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ৫,০০০ ফুট। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ইয়েমেনের পর্বত আরও উচ্চ, প্রায় ৮,০০০ ফুট। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ওমানের পাহাড়ও বেশ উঁচু। মালভূমি উত্তর ও পূর্ব দিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। উত্তরদিকে ইহা মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে ইহা পারস্য উপসাগর-তীরের সমভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মালভূমি অংশের গড়-উচ্চতা ৩,৫০০ ফুট হইতে ৪,৫০০ ফুট ধরা যাইতে পারে। আরব ও লোহিত সাগরের উপকূলে একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমি আছে। এই উপকূলভূমিতে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

আরব উপদ্বীপ এত শুষ্ক যে এখানে একটিও স্থায়ী নদী নাই। বৃষ্টিপাতের পর ছোট ছোট জলধারার সৃষ্টি হয়। কিছু সময় পর ইহারা শুকাইয়া যায়।

জলবায়ু—এখানকার জলবায়ু চরম ও শুষ্ক। গ্রীষ্মকালে তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, শীতকালে তাপ অনেক কম থাকে, তবে উচ্চ পাহাড় ভিন্ন অন্য কোথাও শীতকালে সাধারণত বরফ পড়ে না। বৃষ্টিপাত খুব সামান্যই হয়। উপকূলভাগে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হয়। আরবের প্রায় সবটুকুই উষ্ণ মরুভূমি। এখানে কৃষিকার্য মোটেই হয় না। কেবল মরূদ্যানগুলিতেই কিছুটা চাষ-আবাদ আছে। এই সকল মরূদ্যানেই স্থায়ী বসতি দেখা যায়। মরুভূমির অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা যাযাবর। বৃষ্টিপাতের পর অল্পস্থায়ী একপ্রকার তৃণ জন্মায়। আরব যাযাবরদের 'বেদুইন' বলা হয়। এই বেদুইনরা তখন অশ্ব, মেষ, উট প্রভৃতি পশুপাল লইয়া তৃণের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা উটের দুগ্ধ পান করে, মাংস ভক্ষণ করে, এবং চামড়া দিয়া তাঁবুর

আচ্ছাদন তৈয়ারী করে। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ জাতি। ইহারা মরুভূমিতে খুন-জখম এবং ডাকাতি করিতেও দ্বিধা করে না। দলে দলে লড়াই প্রায় লাগিয়াই আছে। ডাকাতি ইহাদের পেশা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কৃষিজাত দ্রব্য—মরূদ্যান ও উপকূলের সমভূমি ভিন্ন আর কোথাও কৃষি-কার্য হয় না। মরূদ্যানগুলিতে গম, বার্লি এবং খেজুরই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এছাড়া ভুট্টা, যব প্রভৃতিও কিছু কিছু জন্মে। ইয়েমেনের উপকূলে উৎকৃষ্ট কফি জন্মে। আরবের খেজুর ও মোচা-কফি বিখ্যাত।

খনিজ দ্রব্য—পারস্য উপসাগর-উপকূলে পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখান হইতে নলের সাহায্যে ভূমধ্যসাগর-তীরে তৈল প্রেরণ করা হয়। এছাড়া আরব উপদ্বীপে উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ নাই।

স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাষ্ট্র—এখানে স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন ৮টি রাষ্ট্র বর্তমান আছে। **নেজ** (Nejd) ও **হেজাজ** (Hajaz) লইয়া গঠিত **সৌদি আরব** তাহার মধ্যে প্রধান। হেজাজ অতিশয় উষ্ণ ও অনুর্বর; রাজধানী **মক্কা** ইস্‌লামধর্মের প্রচারক হজরত মহম্মদের জন্মস্থান; ইহা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ। **জেদ্দা** (Jedda) লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দর। **মদিনা** হজরত মহম্মদের সমাধিস্থান; ইহাও মুসলমানদের অন্যতম প্রধান তীর্থ।

দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত **ইয়েমেন** (Yemen) রাজ্য নাতিশীতোষ্ণ বৃষ্টিপাতের ফলে উর্বর। এখানে উৎকৃষ্ট কফি উৎপন্ন হয়; প্রধানত মোচা (Mocha) বন্দর হইতে রপ্তানি হয় বলিয়া উহা মোচা-কফি নামে প্রসিদ্ধ। রাজধানী **সানা** প্রাচীরবেষ্টিত শহর; উহার ৮টি দরজা আছে।

দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত **ওমান** (Oman) রাজ্যের রাজধানী **মস্কট** (Mascat); ইহার অধীবাসীদের অধিকাংশ ভারতীয়, পাকিস্তানী ও নিগ্রো। ওমান হইতে প্রচুর খেজুর ও বেদানা রপ্তানি হয়। উত্তর-পূর্বে **কুওয়াইট** (Kuwait) রাজ্যের প্রধান শহর **কুওয়াইট** হইতে উপসাগরের মুক্তা রপ্তানি হয়। এসব ছাড়া দক্ষিণ আরবের বৃটিশ-প্রভাবিত কতকগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য আছে। পারস্য উপসাগরের **বাহরীন** দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ-প্রভাবিত রাজ্য। রাজধানী **মানামায়** ঝিনুক তোলা ও মুক্তাসংগ্রহের ব্যবসা আছে।

আরবের দক্ষিণে **এডেন** উপদ্বীপ এবং **পেরিম, সকুকাত্রা, রিয়া-মুরিয়া** ইত্যাদি দ্বীপসমূহ বৃটিশের অধিকারভুক্ত। **এডেন**—বিখ্যাত বন্দর ও পোতাশ্রয়। ইহা লোহিত সাগরের দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাই ইহার সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী।

মধ্য এশিয়া

এশিয়ার মধ্যভাগে কতকগুলি পর্বতবেষ্টিত উচ্চ মালভূমি আছে। ইহা তোমাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এশিয়ার পর্বতগুলি পামির গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়াছে একথাও তোমরা জান। এই মালভূমিগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

তিব্বত—পামির হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে হিমালয় পর্বত বাহির হইয়াছে এবং পূর্বদিকে বাহির হইয়াছে কিউনলুন পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যভাগেই সু-উচ্চ তিব্বতের মালভূমি। এত উঁচু অথচ এত বিশাল মালভূমি পৃথিবীতে আর নাই। এই মালভূমির গড়-উচ্চতা ১২,০০০ ফুট, দুই পার্শ্বের পাহাড়গুলি আরও উঁচু। মালভূমির উপরিভাগ একেবারে সমতল নয়। অনেকটা বন্ধুর।

জলবায়ু—এই মালভূমির জলবায়ু চরম। বৃষ্টিপাত এখানে খুব কমই হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় এখানে শীতের প্রাবল্য থাকে। তাছাড়া বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে। শীতকালে বহু স্থান বরফে ঢাকা।

এত শীতের দেশে গাছপালা বেশী থাকিতে পারে না। তাই তৃণই অধিকাংশ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। দক্ষিণদিকে উচ্চতা কিছুটা কম। সেখানে মোচাকৃতি বৃক্ষ দেখা যায়।

ভু-প্রকৃতি—তিব্বতকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **উত্তরের উচ্চ মালভূমি**--ইহা ভারতের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহাকে তিব্বতীরা চ্যাংট্যাং বলে। এই

অঞ্চলের গড়-উচ্চতা প্রায় ১৬,০০০ ফুট। তাই এখানে শীত খুব বেশী। এত শীতে কোন গাছপালা টিকিয়া থাকিতে পারে না। একমাত্র তৃণই এখানে জন্মিতে পারে। খাদ্যশস্যের চাষও এত শীতে সম্ভব নয়। তাই এখানে বসতি খুব কম। এই তৃণভূমিতে পশুপালন ছাড়া আর কোন কিছু করা চলে না। এখানে তিব্বতীরা ইয়াক, গাধা, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু পালন করে। এই সকল তিব্বতী অনেকটা যাযাবর প্রকৃতির। এক স্থানের তৃণ শেষ হইলে তাহাদিগকে পশুপাল লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইতে হয়। এইভাবেই এখানকার অধিবাসীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তিব্বতীরা ইয়াকের মাংস খায়, চর্বি তেলের মত ব্যবহার করে। পশম এবং পশুচর্মই এই অঞ্চলের একমাত্র ব্যবসায়ের জিনিস। ইহারা এই সবের পরিবর্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে। এই উচ্চ মালভূমির দক্ষিণেই তিব্বতের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চল।

(২) **দক্ষিণ তিব্বত**—চ্যাংট্যাং মালভূমির দক্ষিণ হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি উত্তরের মালভূমির মতই, তবে এখানকার উচ্চতা অনেক কম। এখানকার গড় উচ্চতা প্রায় ১২,০০০ ফুট। এই অঞ্চলেই ভারতের তিনটি বড় বড় নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইখানেই বিখ্যাত মানস সরোবর অবস্থিত। মানস সরোবরের পশ্চিম-দিকের অঞ্চল হইতে শতদ্রু ও সিন্ধু নদ উৎপন্ন হইয়াছে। মানস সরোবরের পূর্বদিকের অঞ্চল হইতে সাংপো নদী উৎপন্ন হইয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাই পরে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে। সাংপো নদী তিব্বতে প্রায় ৪০০ মাইল পর্যন্ত নৌ-চলাচলের উপযোগী। তিব্বতীরা ছোট ছোট নৌকায় মালপত্র ও লোকজন লইয়া এই নদী দিয়া যাতায়াত করে। এই দক্ষিণ অঞ্চলেই তিব্বতের প্রায় সব লোক বাস করে। তিব্বতে যা সামান্য কৃষিকার্য হয় তা এই দক্ষিণ অঞ্চলেই হয়। কৃষির মধ্যে গম এবং বার্লিই প্রধান। এখানকার জমি উর্বর নয়। তাই ফসল ভাল হয় না। মিলেট এবং ভুট্টাও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়।

শিল্প, বাণিজ্য সব দিক দিয়াই তিব্বতের মধ্যে এই দক্ষিণ অঞ্চলই সবচেয়ে

উন্নত। তিব্বতে খুব অল্পই শহর আছে। শহরগুলির সব কয়টাই এই অঞ্চলে অবস্থিত। তিব্বতের রাজধানী **লাসা** সাংপো নদীর উত্তরে অবস্থিত। ইহা তিব্বতী বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। এখানে ধর্মীয় শাসক দলাই লামা বাস করেন। দলাই লামার প্রাসাদের কারুকার্য চমৎকার। লাসা তিব্বতের বৃহত্তম শহর। এখানে শহরের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র আছে। এ অঞ্চলে অনেক বাণিজ্যপথ আছে। সবগুলি বাণিজ্যপথই লাসাতে আসিয়া মিলিয়াছে। লাসা হইতে সিগোৎসি ও লেহ্ হইয়া শ্রীনগর পর্যন্ত একটি পথ আছে। দার্জিলিং জেলার কালিম্পং হইতে জালাপমলা নামক গিরিবর্ত্ম হইয়া লাসা পর্যন্ত একটি পথ গিয়াছে। লাসা হইতে আর-একটি বাণিজ্যপথ আসামের দিকে গিয়াছে। এই সকল পথে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলে। তিব্বতীরা একপাল ভেড়া, ছাগল ও গাধার পিঠে ছোট ছোট মোট চাপাইয়া পণ্যসামগ্রী নিয়া ভারতে আসে। এই সবের বিনিময়ে ভারত হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে। পশুপালের পিঠে আবার এইগুলি চাপাইয়া ইহারা দেশে ফিরিয়া যায়। এইভাবেই এই দেশের বাণিজ্য চলে। তিব্বতের অন্যান্য শহর **সিগাৎসী, গ্যাংৎসী, সিটাং** (Tsetang) এখানেই অবস্থিত। এই সবকয়টিই একাধিক বাণিজ্য-পথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র।

(৩) **পূর্ব তিব্বতের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চল**—তিব্বতের পূর্ব ভাগ হইতে এশিয়ার অনেকগুলি বড় নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল নদী ও উহাদের উপনদীর উৎপত্তিস্থল লইয়া এই অঞ্চল। নদীগুলি এখানে গভীর উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই এখানকার ভূমি অত্যন্ত বন্ধুর। গভীর নদীখাত ও খাড়াই পাহাড় এখানকার ভূপ্রকৃতির বিশেষত্ব। এই অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে পশু চরানো হয়। কোন কোন নদীর উপত্যকায় সঙ্কীর্ণ সমভূমিতে চাষও হয়। এ অঞ্চলে অনেক খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা আছে।

সাইডাম মালভূমি—তিব্বত মালভূমির উত্তর-পূর্ব দিকে সাইডামের মালভূমি। দক্ষিণদিকে কিউনলুন পর্বত ইহাকে তিব্বত হইতে পৃথক করিয়াছে। উত্তরদিকে আলতিনতাঘ পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যে

সাইডামের উচ্চ মালভূমি। ইহার পূর্বাংশে বিখ্যাত কোকনর হ্রদ অবস্থিত। পশ্চিমার্ধের মধ্যভাগ নীচু, চারিপার্শ্ব ক্রমশ উঁচু হইয়া গিয়াছে। চারিদিকের বরফগলা জল তাই বাহির হইবার পথ পায় না। এজন্য মধ্যভাগে এক বিশাল জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সাইডাম জলাভূমি (Tsaidam Swamp) নামে খ্যাত। পশুচারণই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কৃষি অতি সামান্যই হয়। কৃষিকার্য কোকনর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

তারিম উপত্যকার মালভূমি—তিব্বতের উত্তরে ইহা অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে কিউনলুন ও আলতিনতাঘ পর্বত এবং উত্তরে তিয়েনশান পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যভাগে তারিমের মালভূমি। এই মালভূমি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৯০০ মাইল লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মাইল চওড়া। ইহাকে চীনা তুর্কিস্তানও বলা হয়। ইহার প্রায় সবটুকুই বর্তমান চীন দেশের সিনকিয়াং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই মালভূমির মধ্যভাগে তিয়েনশানের নিকট দিয়া তারিম নদী প্রবাহিত। তারিম পশ্চিম দিকের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই শুষ্ক মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে লবনর হ্রদে পড়িয়াছে। এই অঞ্চলের প্রায় সবটুকুই মরুভূমি। দক্ষিণের পর্বত হইতে তারিম নদী পর্যন্ত মরুভূমির যে অংশ তাহা টাকলামাকান মরুভূমি নামে পরিচিত। এই তারিম উপত্যকা অত্যন্ত শুষ্ক এবং প্রবেশ্য শিলায় গঠিত। দুই দিকে পাহাড় হইতে যে নদীগুলি উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা তাই তারিম নদী পর্যন্ত পৌছিতে পারে না।

এই অঞ্চলের জলবায়ু যে চরম হইবে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছ। এই অঞ্চলে শীতকালে অত্যধিক শীত পড়ে, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নামে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য সাহারা অঞ্চলের মত এতটা উষ্ণ হয় না। তথাপি গ্রীষ্মকাল এখানে বেশ উষ্ণ। দিনের বেলা অত্যন্ত গরম হয়, রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। বৃষ্টিপাত এখানে হয় না বলিলেই চলে। এই তারিম উপত্যকার কোথাও বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪ ইঞ্চির অধিক নয়।

এই রকম শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিকার্য সম্ভব নয়। তবে উত্তর ও দক্ষিণ উভয়

দিকেই পাহাড়ের পাদদেশে অনেকগুলি মরূদ্যান আছে। এই মরূদ্যানগুলিতে চাষ হয় এবং সকল মরূদ্যানেই স্থায়ী বসতি দেখা যায়। মরূদ্যানে গম, ভুট্টা এবং বার্লিই প্রধান ফসল। কার্পাসও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। এছাড়া যে সকল স্থানে জল বেশী পাওয়া যায় তথায় কখন কখন ধানের চাষও হয়।

অন্যান্য স্থানে পশুপালনই প্রধান উপজীবিকা।

এই মরূদ্যানগুলির উপর দিয়াই প্রাচীন বাণিজ্যপথ ছিল। এই পথে চীন দেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য চলিত। এই অঞ্চলে অনেক প্রাচীন শহর আছে। শহরগুলি সবই এই মরূদ্যান অঞ্চলে অবস্থিত। **তিহ্‌ওয়া** (পূর্বনাম উরুমচি) এই অঞ্চলে প্রধান শহর। ইহা সিনকিয়াং-এর রাজধানী। মরূদ্যান শহরের মধ্যে **কাশগড়, ইয়ারকন্দ** এবং **খোটান**ই প্রধান।

জুঙ্গেরিয়ান নিম্নভূমি—তারিম মালভূমির উত্তরে জুঙ্গেরিয়ান নিম্নভূমি। ইহার উত্তরে আলতাই পর্বত ও দক্ষিণে তিয়েনশান পর্বত। পশ্চিমদিকে আলাই ও ট্রান্স-আলাই পাহাড়। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া বলখাস অঞ্চলে রাশিয়ার তুর্কিস্তানে যাওয়ার পথ আছে। এই অল্পপরিসর নিম্নভূমির উপর দিয়া চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার তুকিস্তানের বাণিজ্য চলিত। এই পথের যে অংশই আলাই পাহাড় অতিক্রম করিয়াছে উহা জুঙ্গেরিয়ান দ্বার নামে অভিহিত হয়।

এখানকার জলবায়ু তারিম উপত্যকার মতই, তবে ইহা গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়। ফসলের মধ্যে গম এবং বার্লিই প্রধান। খুব কম লোকই কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। পশুপালনই বেশীরভাগ লোকের প্রধান বৃত্তি। তারিম উপত্যকা ও এই অঞ্চলে তাতার জাতীয় মুসলমানরা বাস করে। ইহারা মঙ্গোলজাতীয় মুসলমান। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, পশুপালন লইয়া ইহারা যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

মঙ্গোলিয়া—মধ্য-এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব ভাগ ব্যাপিয়া ইহা অবস্থিত। ইহা সাইবেরিয়া হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। গোবি বা শামো মরুভূমি ইহার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানকার জলবায়ু চরম। শীতে অত্যন্ত শীত ; গ্রীষ্মে গরমও বেশ পড়ে। বৃষ্টিপাত অতি

সামান্য হয়। মরূদ্যান ছাড়া কোথাও কৃষিকার্য সম্ভব নয়। গাছপালা কিছুই এ অঞ্চলে বিশেষ দেখা যায় না, মরূদ্যানেই যা গাছপালা আছে। অন্য স্থানে কোথাও কোথাও তৃণভূমি আছে। এই সকল তৃণভূমিতে পশুপালন করা হয়। পশুপালনই মঙ্গোলীয়দের প্রধান উপজীবিকা। তাই অধিবাসীদের অধিকাংশই যাযাবর। ইহারা উট, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি পশুপাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

প্রধান নগর—উলানবেটর (পূর্ব নাম উর্গা)—এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রের রাজধানী। উলানবেটবে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **কলগান**—অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

চীনের উত্তরে এক ক্ষুদ্র অংশ অন্তর্মঙ্গোলিয়া (Inner Mongolia) নামে আখ্যাত। ইহা চীনরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia) মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত। ইহা স্বাধীন দেশ। তবে ইহা সোভিয়েট রাশিয়াব প্রভাবান্বিত। মঙ্গোলীয় দস্যুদের ভয়ে প্রাচীনকালে খাস চীন এবং মঙ্গোলিয়ার মধ্যে চীনের মহাপ্রাচীর তৈয়ার হইয়াছিল। এই প্রাচীর ১,৫০০ মাইল লম্বা, ২০ হইতে ৩০ ফুট উঁচু এবং ১৫ হইতে ২৫ ফুট চওড়া।

পূর্ব এশিয়া

মাঞ্চুরিয়াঃ অবস্থান ও আয়তন—খাস চীনের উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া। মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পার্বত্যভূমি। এই পার্বত্যভূমির মধ্যভাগে সমভূমি। এই সমভূমি অঞ্চলই মাঞ্চুরিয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল।

ইহার আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে-চার কোটি। পূর্বে ইহা জাপানী তাঁবেদার রাষ্ট্র ছিল। বর্তমানে ইহা চীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

মাঞ্চুরিয়ায় শীতকালে অত্যন্ত শীত পড়ে। নদীগুলি বরফে জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকাল মন্দোষ্ণ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। তবে অধিকাংশ স্থানেই বৎসরে ২০ ইঞ্চির মত বারিপাত হয়।

খনিজ দ্রব্য—এই অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ এবং কয়লাই প্রধান।

কৃষিজাত দ্রব্য—ভূমি খুব উর্বরা। কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা এবং সোয়াবিনই প্রধান। মাঞ্চুরিয়া হইতে অনেক কাঠ, খাদ্যশস্য ও খনিজ দ্রব্য রপ্তানি হয়।

প্রধান নগর—**সিনকিং** রাজধানী। **হারবিন** নগরের সহিত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ের সংযোগ আছে। পুরাতন রাজধানী **মুকডেন**—শিল্পকেন্দ্র ও রেলওয়ে জংশন। **দাইরেন**-এ সয়াবিন তেলের কল ও ইস্পাতের কারখানা আছে। **পোর্ট আর্থার** আগে রাশিয়ার অধিকারে ছিল, পরে জাপানী রণতরীর আড্ডা হইয়াছিল।

কোরিয়া—কোরিয়ার উত্তর ভাগে পার্বত্যভূমি। দক্ষিণের উপদ্বীপের মধ্যভাগেও একটি পাহাড় আছে। পাহাড়ের দুই পার্শ্বে উপকূলের দিকে সমভূমি আছে।

এখানকার জলবায়ু শীতপ্রধান, তবে সমুদ্রের সান্নিধ্যহেতু শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই কিছুটা মন্দীভূত হইয়া থাকে।

কৃষিজাত দ্রব্য—ধান, গম, তুলা ও সোয়াবিন এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রধান নগর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে কোরিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ৩৮° উ. দ্রাঘিমা দুই রাষ্ট্রের সীমা। উত্তর কোরিয়ার নাম হইয়াছে Korean People's Democratic Republic। **পিয়াংইয়াং** ইহার রাজধানী। দক্ষিণাংশের নাম Democratic Republic of Korea। **কীজো** (পূর্ব নাম **শিউল**) ইহার রাজধানী; **ফুজান** প্রধান বন্দর। কোরিয়ার অবস্থা খুবই অনুন্নত; এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলে উন্নতির কোন লক্ষণও দেখা যায় না।

খাস চীন

চীনদেশ আয়তনে বিশাল, জনসংখ্যায় অদ্বিতীয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদে অসাধারণ সমৃদ্ধিশালী। তাহা সত্ত্বেও চীনের প্রায় ৫০ কোটি অধিবাসী অত্যন্ত

দরিদ্র। নদী, উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে লোকবসতি এত ঘন যে, অনেকে স্থানাভাবে নৌকায় বাস করে।

১৯১২ অব্দে প্রাচীন চীন সাম্রাজ্য গণতন্ত্রে পরিণত হয়। তখন মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, সিং-কিয়াং (পূর্ব-তুর্কিস্তান) এই চারিটি দেশ ও খাস চীন ছিল উহার অন্তর্ভুক্ত। বহির্মঙ্গোলিয়া বর্তমানে চীন গণতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন। কিছুকাল পূর্বে চীনা কম্যুনিস্টরা মাও সৈ তুং-এর নেতৃত্বে কুয়োমিংটাং জাতীয়তাবাদীদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া নূতন সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমানে প্রাক্তন খাস চীন, মাঞ্চুরিয়া ও অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় চীন জনসাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। তিব্বত দেশকেও কতকটা এই চীন সাধারণতন্ত্রের অধীনে আনা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতকে চীন সাধারণতন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

ভূপ্রকৃতি—ভূ-প্রকৃতির দিক দিয়া খাস চীনকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **দক্ষিণ চীনের প্রাচীন পার্বত্য অঞ্চল**—এই অঞ্চল ইউনান হইতে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পাহাড়গুলি ছোট, উহাদের মধ্যে অসংখ্য ধানক্ষেত রহিয়াছে।

(২) **পশ্চিম চীনের উচ্চ মালভূমি**—সিন-লিং শান প্রভৃতি উচ্চ পর্বত এই অংশটিকে যাতায়াতের অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে। এই চীনের সকল প্রধান নদীর উৎপত্তি এই অঞ্চলে।

(৩) **লোহিত পর্যঙ্ক**—পশ্চিম চীনের পার্বত্য রুক্ষতার মধ্যে লোহিত পর্যঙ্ক একটি অসাধারণ উর্বর ও ঘনবসতিসম্পন্ন স্থান। ইহা কয়লাসম্পদে পূর্ণ।

(৪) **হোয়াংহো-ইয়াংসি উপত্যকার সমতল ও চীনের বিশাল সমভূমি**—হোয়াংহো নদী চীনের উত্তর ভাগে প্রবাহিত। এই অঞ্চলের মাটি বায়ুতাড়িত সূক্ষ্ম বালুকণা। ইহাই হলদে **লোয়েস মাটি**—অসাধারণ উর্বরতাসম্পন্ন। কিন্তু মাটি আলগা বলিয়া নদী খাত পরিবর্তন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি করে। মধ্যভাগে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে **ইয়াংসি-কিয়াং** নদী প্রবাহিত। ইহা পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। এই নদীপথে

সমুদ্র হইতে ৭০০ মাইল অভ্যন্তরে হ্যাংকো বন্দর পর্যন্ত বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজ যাতায়াত করে। তাহার পরেও বহুদূরে **ইচাং** পর্যন্ত বড় বড় স্টিমার যাতায়াত করিতে পারে। দুই তীরের সমভূমি উর্বর এবং ঘনবসতি-যুক্ত। **সি কিয়াং** চীনের দক্ষিণ ভাগের প্রধান নদী। এই নদীর দুই পাশে প্রচুর ধান জন্মে। লোকবসতিও খুব ঘন। চীনের মধ্যভাগে এক বিশাল সমভূমি রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি বৃহৎ হ্রদ এবং শত শত মাইল সুনাব্য খাল রহিয়াছে। এই অঞ্চলও খুব উর্বর।

(৫) **শানটুং**—চীনের উত্তর-পূর্ব দিকে শানটুং উপদ্বীপ। ইহা পার্বত্য এবং রুক্ষ হইলেও ঘনবসতিযুক্ত।

চীনের তটরেখা ভগ্ন বলিয়া সর্বত্রই প্রাকৃতিক বন্দর দেখা যায়।

জলবায়ু—চীনের জলবায়ু মৌসুমী-ভাবাপন্ন। শীতকালে মধ্য এশিয়ার হিমশীতল বায়ু অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় ইহার উত্তর ভাগে অত্যন্ত শীত পড়ে। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অধিক; ঐ অঞ্চলেই মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ চীনের পর্বতগুলিতে প্রথম বাধা পায়। উত্তর-পশ্চিম চীন মরুপ্রায়। শীতকালে চীনদেশে বৃষ্টি হয় না।

উৎপন্ন দ্রব্য—কৃষিজ উৎপাদনের দিক হইতে চীনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণতা উভয়ই অধিক হওয়ায় উপযুক্ত সমভূমির অভাব সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে ধানের চাষ বেশী হয়। দক্ষিণের চীনাদের ধানই একমাত্র খাদ্য। তাহা ছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। রেশম উৎপাদনেও এই অঞ্চল অগ্রগণ্য।

ইয়াংসি নদীর উত্তরে বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চিরও কম এবং শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক। ঐ অঞ্চলে প্রচুর গম, যব এবং তুলা উৎপন্ন হয়। শুষ্কতর অঞ্চলে মিলেট ও সয়াবিনের চাষ। পর্যঙ্কেও প্রচুর ধান জন্মে। চীনদেশের বিপুল কৃষিজ সম্পদের প্রায় সবটাই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। সামান্য চা, তুলা ও রেশম রপ্তানি হয়। মাথা-পিছু কৃষিজমি মাত্র এক বিঘা। খনিজ সম্পদে চীন সমৃদ্ধ, ঐ সম্পদের প্রায় সবটাই অব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়াছে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই সর্বপ্রধান। কয়লাসম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের পরেই; কিন্তু কয়লাউৎপাদন

ভারত অপেক্ষাও কম। শানশি, সেজোয়ান, সেনশি প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কয়লার ভাণ্ডার রহিয়াছে। লৌহসম্পদে চীন সমৃদ্ধ না হইলেও মধ্যচীনে লৌহের অবস্থানের ফলে হ্যাংকোর নিকট লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউনানে তামা, টিন, ট্যাংস্টেন, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য—শিল্প ও বাণিজ্যে চীন পশ্চাৎপদ। যে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে তাহার মালিক অধিকাংশই বিদেশী। ইস্পাতের
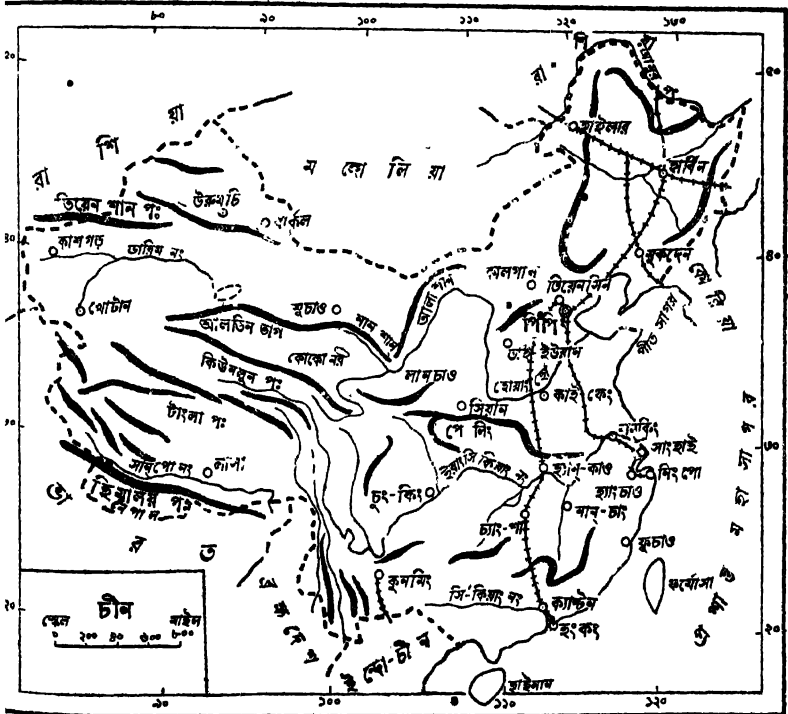
২৯নং চিত্র—খাস চীন

উৎপাদন নগণ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খুবই কম। পরিবহণ-ব্যবস্থা অনুন্নত। প্রধান রেলপথ বর্তমান রাজধানী পিকিং হইতে নানকিং হইয়া সাংহাই—ও অপর একপথে হ্যাংকাউ হইয়া ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তৃত

প্রধান নগর—পিপিং বর্তমানে রাজধানী। **নানকিং** (Nanking) পূর্ব রাজধানী। গতযুদ্ধে জাপান ইহা দখল করায় **হ্যাঙ্কো** (Hankow) এবং পরে **চুংকিং** নগরে রাজধানী সরাইয়া লওয়া হয়। **টিয়েণ্টসিন** পিকিং অঞ্চলের প্রধান বন্দর। **সাংহাই** ইয়াংসি নদীর মোহনায় অবস্থিত চীনের নগর ও বন্দর। উহার দক্ষিণে **এময়** বন্দর। **ক্যাণ্টন** চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান বন্দর।

হংকং—সি নদীর মোহানায় খাস চীনের সামান্য অংশ এবং কতকগুলি দ্বীপ বৃটিশ-অধিকারভুক্ত। ইহার মধ্যে প্রধান দ্বীপ হংকং ; উহা বৃহৎ বন্দর ও পোতাশ্রয়। সকল দেশের জাহাজ এখানে চলাচল করে। এখান হইতে দক্ষিণ চীনের অধিকাংশ বাণিজ্য নির্বাহ হয়। রাজধানী **ভিক্টোরিয়া**।

জাপান (নিপ্পন)

এশিয়ার পূর্বপ্রান্তে জাপান বা নিপ্পন। চৈনিক ভাষায় ইহার অর্থ **সূর্যোদয়ের দেশ** (Land of the Rising Sun)। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের অনতিদূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে চারিটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং শত শত পর্বতসঙ্কুল ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া দেশটি গঠিত। প্রধান দ্বীপ চারিটির নাম উত্তর হইতে যথাক্রমে **হোক্কাইডো, হনসু, কিউস্যু** ও **সিকোকু**। তাহা ছাড়া দক্ষিণের **রিউকিউ (লুচু)** দ্বীপপুঞ্জও জাপানের অন্তর্গত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে উত্তরের সাখালীন দ্বীপের দক্ষিণ-অর্ধ এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মাঞ্চুরিয়া, ফরমোসা এবং কোরিয়াও ছিল জাপানের অধীন। মহাযুদ্ধে হারিয়া গিয়া জাপানের সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জাপান এখন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অবস্থান হিসাবে জাপানের সঙ্গে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের তুলনা চলিতে পারে। প্রথমত উভয়ই বৃহৎ মহাদেশের প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে উভয় দেশই নাতিশীতল, উভয় জাতিই উন্নতিশীল ও নৌ-দক্ষ। উপকূল ভগ্ন হওয়াই ইহার কারণ। কিন্তু বৃটেনের মত জাপান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। জাপানের মত বৃটেনে ভূমিকম্প হয় না। আগ্নেয়গিরিও নাই।

ভূপ্রকৃতি—জাপানের প্রধান দ্বীপগুলির পূর্ব- ও পশ্চিম-প্রান্ত ঘেঁসিয়া দুইটি পর্বতমালা উত্তর-পূর্ব হইতে ধনুকের মতো প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বাঁকিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। এই দুই পর্বতমালা মাত্র একস্থানে হনসু দ্বীপের মধ্যস্থলে মিশিয়াছে। সেখানে বড় বড় আগ্নেয়পর্বত প্রভৃত লাভা উদ্গীরণ করে। ইহাদের মধ্যে **ফুজিয়ামা** (১২,০০০ ফুট) বৃহত্তম। জাপানে প্রায় প্রতিদিনই ভূমিকম্প হয়। জাপানের সমভূমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর উপত্যকা ও ব-দ্বীপ। নদীগুলি নাতিদীর্ঘ ও বেগবতী—নৌ-বাহনের অযোগ্য হইলেও জলসেচ এবং বিশেষত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগে। কেবলমাত্র টোকিওর নিকট **কোয়েণ্টো** সমভূমি বিস্তৃত। দক্ষিণভাগে কিউসু, সিকোকু ও হনসু-র মাঝের ভূমি বসিয়া গিয়া সাগরে পরিণত হইয়াছে। ইহার তীরে জাপানের বহু স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রহিয়াছে।

জলবায়ু—জাপানের জলবায়ু মৌসুমী-প্রভাবিত হইলেও নাতিশীতোষ্ণ। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত হওয়ায় হিমশীতল হোকাইডোর সঙ্গে সূর্যকরোজ্জ্বল দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর পার্থক্য যথেষ্ট। জাপানে বারো মাস প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমীবায়ু দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আসিয়া জাপানের পর্বতমালায় প্রতিহত হইয়া প্রধানত প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে প্রবল বারিপাত ঘটায়। পর্বতমালা উঁচু না হওয়ায় জাপান সাগরের তটেও বৃষ্টি হয়। শীতকালে এশিয়া মহাদেশীয় হিমশীতল বায়ু জাপান সাগর হইতে কিছু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম জাপানে অধিক এবং জাপানে সামান্য বৃষ্টি অথবা তুষারপাত ঘটায়। দক্ষিণ হইতে টাইফুনও মাঝে মাঝে বারিবর্ষণ করিয়া যায়। কুয়ো-শিয়া নামক উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে জাপান অধিক শৈত্যের হাত হইতে রক্ষা পায়। বন্দরগুলিও বরফমুক্ত থাকে।

উদ্ভিজ্জ—জাপানের দক্ষিণদিকে উষ্ণ হাওয়ায় কর্পূর, বাঁশ, কলাগাছ প্রভৃতি জন্মে। উত্তরে হোক্কাইডো প্রভৃতি স্থানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য রহিয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—জাপান পার্বত্য দেশ। সেখানে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ জমি কর্ষণযোগ্য; ধানই জাপানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। মোট জমির শতকরা ৫৫ ভাগেরও অধিক জমিতে ধান চাষ হয়। এমন কি উত্তরের শীতপ্রধান

হোক্কাইডোতেও জাপানীরা একপ্রকার দ্রুতফলনক্ষম ধানের চাষ করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে গম, সয়াবিন ও যবের চাষ হয়। তুষারপাত-যুক্ত অঞ্চলে কিছু জইয়ের চাষও হয়। রেশম উৎপাদনে চীনের পরেই জাপানের স্থান। তাহা ছাড়া চা এবং নানা প্রকার ফল জন্মে। জাপান খাদ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী নহে, তাহার প্রধান কারণ জাপানের ঘনবসতি। লোকসংখ্যা ৭ কোটি।
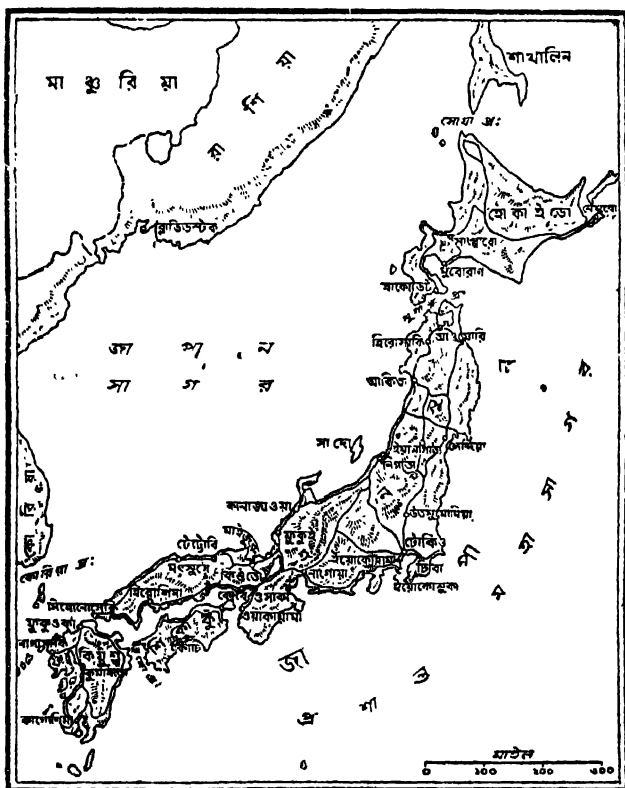
৮০নং চিত্র—জাপান

হোক্কাইডো এবং নাগাসাকি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় চার কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়—তবু উহা জাপানের শ্রমশিল্পের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

হনস্থর উত্তরে একটি ছোট খনি ভিন্ন জাপানে উচ্চশ্রেণীর লৌহ নাই। হোক্কাইডোর লৌহ নিকৃষ্ট শ্রেণীর। স্থতরাং জাপান প্রধানত মালয় হইতে আকরিক লৌহ আমদানি করে। তাম্র উৎপাদনে জাপান স্বাবলম্বী। জাপানে প্রচুর গন্ধক এবং সামান্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য—শিল্পের দিক দিয়া জাপান অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হারিয়া জাপানের আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন ধীরে ধীরে পুনরায় উহার বিস্তৃতি ঘটিতেছে। **কার্পাস, রেশম, লোহা, চিনামাটি, কাচ** প্রভৃতির কারখানা দেশের বহুস্থানে অবস্থিত। **দিয়াশলাই** এবং নানাবিধ **খেলনার** জন্যও জাপানের প্রসিদ্ধি আছে। নানাপ্রকার **যন্ত্রপাতিও** তৈয়ারী হয়। উপকূলভাগে মৎস্যশিকার ও মাছের ব্যবসা করিয়া বহু লোক জীবিকানির্বাহ করে। **কৃত্রিম মুক্তার** ব্যবসায়েও জাপানের প্রভূত অর্থাগম হয়।

জাপানের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে বিপুল জলবিদ্যুৎ-সম্পদ। নদীগুলি ক্ষুদ্র হইলেও খরস্রোতা এবং বারো মাস প্রবহমানা। প্রায় ৬০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।—ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি জাপানের গ্রামাঞ্চলে প্রতি গৃহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আধুনিকতম কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধান করিয়াছে। জাপানের পরিবহন-ব্যবস্থা খুবই উন্নত। রেল লাইনের ঘন জাল দেশটিকে ছাইয়া আছে। তটরেখা ভগ্ন হওয়ায় জাপানীরা স্থদক্ষ নাবিক। ইহাদের বিশাল বাণিজ্য-নৌবহর সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করে। যুদ্ধ-পূর্ব জাপানের ৬০ লক্ষ টন বাণিজ্য-জাহাজ ছিল।

জাপানের প্রধান আমদানি—তুলা, আকরিক লৌহ, লৌহের টুকরা, কয়লা, খনিজ তৈল ও খাদ্যশস্য। প্রধান রপ্তানি—কার্পাস বস্ত্র, কাঁচা ও শিল্পিত রেশম, নানা প্রকার শিল্পিত পণ্য, সবুজ চা ও কর্পূর।

প্রধান নগর—রাজধানী **টোকিও** (Tokyo) এশিয়ার সর্ববৃহৎ নগর এবং শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। টোকিওর নিকটে **ইয়োকোহামা** (Yokohama) প্রধান বন্দর। **ওসাকা** (Osaka) জাপানের দ্বিতীয় নগর; বস্ত্রশিল্পের জন্য ইহা জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার নামে খ্যাত। **কোবে** (Kobe) জাপানের দ্বিতীয়

বন্দর। এখানে দিয়াশলাই, রেশম ও রবারের কারখানা আছে। **নাগাসাকি** পোতনির্মাণের স্থান। **নাগোয়া, হাকোডাটে, কিয়োটো** অন্যান্য নগর। নাগোয়া চীনামাটির কাজের জন্য বিখ্যাত।

.**ফরমোসা** (Formosa) বা **তাইওয়ান** দ্বীপ পূর্বে জাপানের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা চীনা জাতীয়তাবাদীদের মূল ঘাঁটি। আয়তনে প্রায় ১৩,০০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। **তাইহকু, তাইনান** ও **কিলুং** প্রধান শহর ও বন্দর। পৃথিবীর অধিকাংশ কর্পূর এখান হইতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য—আফিং, ইক্ষু, চা ও ধান। এখানে সোনা, তামা, কয়লার খনি এবং মৎস্যের ব্যবসায় আছে।

সোভিয়েট এশিয়া

অবস্থান ও আয়তন—এশিয়া মহাদেশের সমগ্র উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া একটি বিশাল অঞ্চল সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইহা সোভিয়েট এশিয়া নামে পরিচিত। ইহাকে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের উত্তর ও পূর্বভাগ সাইবেরিয়া নামে আখ্যাত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ সোভিয়েট মধ্য এশিয়া নামে পরিচিত। সোভিয়েট এশিয়া পশ্চিমে ইউরাল পর্বত হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে উত্তর মহাসাগরই ইহার সীমা। মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতমালা অধিকাংশ স্থানে ইহার দক্ষিণ সীমা রচনা করিয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে সোভিয়েট এশিয়াকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: যথা—(১) পশ্চিম সাইবেরিয়ার সমভূমি, (২) মধ্য সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি, (৩) দক্ষিণ ও পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল এবং (৪) তুরানের নিম্নভূমি।

(১) **পশ্চিম সাইবেরিয়ার সমভূমি**—অব ও ইনিসি নদীর অববাহিকা লইয়া ইহা গঠিত। দক্ষিণের পার্বত্য ভূমি হইতে ইহা অতি ধীরে ধীরে উত্তর মহাসাগরের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এই সমভূমির উচ্চতা কোথাও ৫০০ ফুটের অধিক নয়। কোন কোন স্থানে ভূমির ঢাল এত কম যে ভালভাবে জলনিকাশও হইয়া উঠে না। তাই কোন কোন স্থানে জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ইরিত্তিস নদী যেখানে অব নদীতে পড়িয়াছে তাহার নিকটে ভাস্যুগান নামক নিম্নভূমিতে এরূপ একটি বিশাল জলাভূমি আছে।

(২) **মধ্য সাইবেরিয়ার উচ্চভূমি**—ইহা ইনিসি নদীর পূর্বদিক হইতে লেনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উচ্চভূমি পৃথিবীর স্থলভাগের অতি পুরাতন অংশ। ইহা প্রাচীন আগ্নেয়শিলায় গঠিত। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ক্ষয়ীভবনের ফলে ইহার ভূমি প্রায় সমতল হইয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা অধিকাংশ স্থানেই ১,০০০ ফুটের মত। এই উচ্চভূমিও উত্তরদিকে ক্রমশঃ নীচু হইয়া উত্তর মহাসাগরের উপকূলের সমভূমিতে মিশিয়াছে।

(৩) **দক্ষিণ-ও পূর্ব-দিকের পার্বত্য অঞ্চল**—দক্ষিণদিকে মধ্য এশিয়ার ভঙ্গিল পর্বতমালার কোন কোন অংশ ও উহাদের শাখা-প্রশাখা সোভিয়েট এশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্বদিকে ইয়াব্লোনয়, স্তানোভয়, কলিমা, সিখাটো, এলিন প্রভৃতি পর্বত ও ইহাদের শাখা-প্রশাখা লইয়া পূর্বদিকের পার্বত্য ভূমি গঠিত। ইহার বেশীর ভাগ অংশ ৫,০০০ ফুট অপেক্ষা উচ্চ। এই পার্বত্য ভূমি প্রশান্ত ও উত্তর মহাসাগরের মধ্যে জলবিভাজিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এই পার্বত্য ভূমি হইতে অনেকগুলি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তরদিকের নদীগুলি পর্বত ক্ষয় করিয়া উত্তর মহাসাগরের তীরে একটি সমভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরেও একটি সঙ্কীর্ণ সমভূমি আছে। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে আমুর উপত্যকার সমভূমিও উল্লেখযোগ্য।

(৪) **তুরানের নিম্নভূমি**—সোভিয়েট এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ তুরানের নিম্নভূমি নামে পরিচিত। এখানে আরল ও কাস্পিয়ান হ্রদ অঞ্চলের ভূমি নিম্ন। কোন কোন স্থানে উহা সমুদ্র-সমতল হইতেও নীচু। মধ্যভাগের এই নিম্নভূমি হইতে চারিদিকের ভূমি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া গিয়াছে। তাই
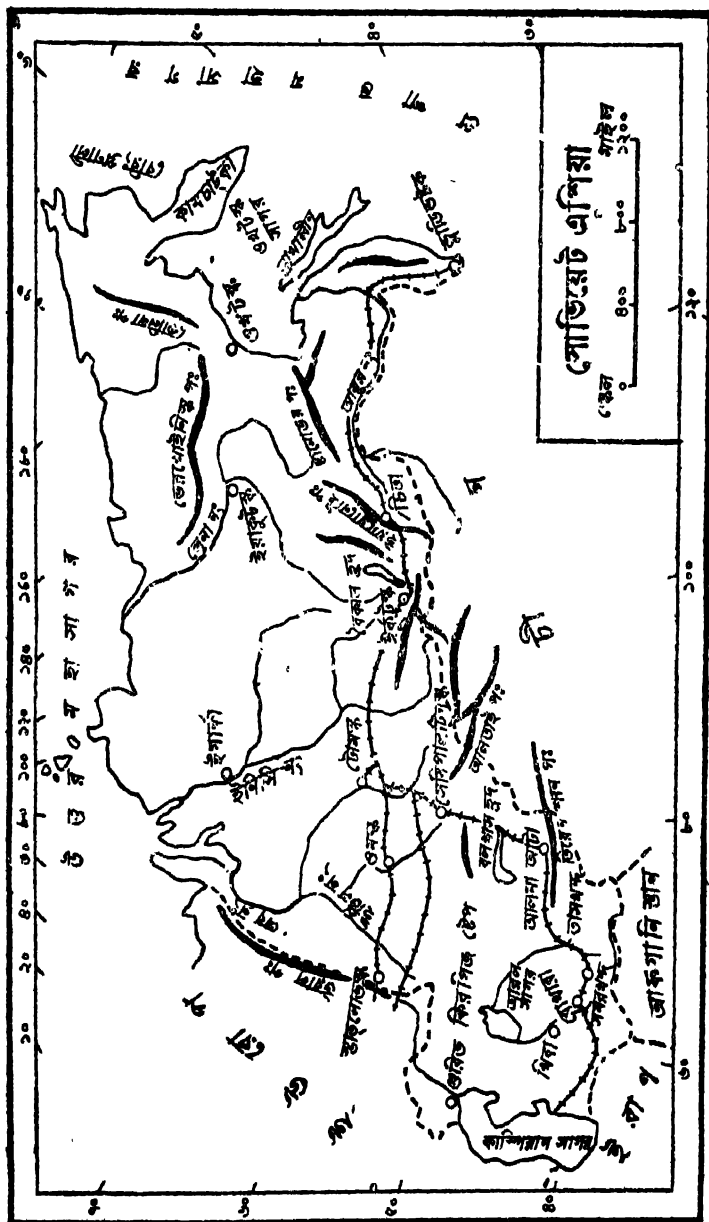
৮১নং চিত্র – সোভিয়েট এশিয়া

এখানকার নদীগুলি অন্তর্বাহিনী। সিরদরিয়া, আমুদরিয়া প্রভৃতি নদীগুলি আরল হ্রদে পড়িয়াছে।

জলবায়ু—এই বিশাল অঞ্চলের জলবায়ু সর্বত্র একরূপ নহে। বিভিন্ন অংশের জলবায়ু বিভিন্ন।

উত্তর মহাসাগরের উপকূলে তুন্দ্রা অঞ্চল। ৫০° ফা. জুলাই সমোষ্ণরেখা এই অঞ্চলের দক্ষিণ সীমা। তুন্দ্রা অঞ্চলে শীতের প্রাধান্যই বেশী। এখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শীত বেশী থাকে। শীতের প্রকোপ পূর্বদিকে বাড়িতে থাকে। লেনা নদীর মুখে জানুয়ারীর গড়-উত্তাপ—৪০° ফা.। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে দিনের পরিমাণ বেশী থাকে," তাই গ্রীষ্মকালে কোন কোন উপত্যকায় কখন কখন দিনের তাপ ৭০° ফা. অপেক্ষাও অধিক হয়। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ ইঞ্চির অধিক হয় না। শীতের আরম্ভ হইতেই সর্বত্র বরফ পড়িতে আরম্ভ করে।

এই তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণেই মোচাকৃতি বৃক্ষের অরণ্যভূমি। এই অঞ্চলও শীতপ্রধান। এখানে গ্রীষ্মের গড়-উত্তাপ ৫৫° ফা.—৭০° ফা.-এর বেশী হয় না। শীতকালে যতই পূর্বে যাওয়া যায় শীত ততই বাড়িতে থাকে। জানুয়ারীর গড়-উত্তাপ টোবলস্কে—২° ফা., ইয়াকুটস্কে—৪৬° ফা. এবং ভারখায়ানোস্কে—৬০° ফা.। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই অধিক হয়। বৃষ্টির পরিমাণও পূর্বদিকে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। পশ্চিমদিকে বারিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০ ইঞ্চি কিন্তু পূর্বদিকে মাত্র ১২ ইঞ্চি। এই মোচাকৃতি অরণ্য অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে সমুদ্রের প্রভাবহেতু জলবায়ু অন্যরূপ।

দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে স্তেপ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে জুলাই-এর গড়-উত্তাপ ৭০ ফা. অপেক্ষা অধিক হয়। শীতকালে শীত বেশী। তাও আবার পূর্বদিকে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী নহে।

এই স্তেপ অঞ্চলের দক্ষিণেই তুরান। ইহার জলবায়ু মরুভূমির অনুরূপ। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চল বেশ উষ্ণ হয়। গ্রীষ্মের গড়-উত্তাপ ৮০° ফা. অপেক্ষাও বেশী। শীতকালে শীতও বেশী পড়ে। তাপ হিমাঙ্কের নীচে নামে। তবে

০° ফা. অপেক্ষা নীচে নামে না। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। মাত্র ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি।

সোভিয়েট এশিয়াকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যেমন—

(১) **তুন্দ্রাভূমি**—এই অঞ্চলের জলবায়ু কৃষিকার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই এখানে চাষ-আবাদ নাই। বর্তমানে রুশ সরকার এই অঞ্চলে কৃষিকার্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায় যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এখানে গম ও বার্লি-জাতীয় ফসল উৎপন্ন করা যাইবে।

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২) **মোচাকৃতি বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল**—যাতায়াত-ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য এই অঞ্চলের উন্নতি হয় নাই। আজকাল যাতায়াত-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নতিও ঘটিতেছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমদিকের সমভূমি-অঞ্চলের অরণ্য পরিষ্কার করিয়া এবং জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত করিয়া ভাল কৃষিভূমি তৈয়ারী করা হইয়াছে। আজ পশ্চিম সাইবেরিয়া রাশিয়ার অন্যতম প্রধান কৃষি অঞ্চল। এখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। বনভূমি হইতে প্রচুর কাঠ কাটা হয়। এই কাঠ বাহিরে চালান করিবার জন্য ইনিসি নদীর তীরে ইগার্কা বন্দর তৈয়ারী করা হইয়াছে। বনভূমিতে অনেক লোমশ পশু শিকার করা হয়। এই লোমশ চর্ম বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নরম কাঠ হইতে এখানে প্রচুর কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারী করা সম্ভব। তাই এই অঞ্চলে কাগজ ও সেলুলয়েড শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বাংশে প্রচুর খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। খনিজ সম্পদের মধ্যে স্বর্ণই প্রধান। আলডান (Aldan) অঞ্চলে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় রাশিয়ার স্বর্ণ উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে স্বর্ণ উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রৌপ্য, সীসা, লবণ, লৌহ এবং কয়লাই প্রধান। লেনা ও ইনিসি নদীর নিম্নপ্রবাহে অনেক কয়লার খনি আছে। শিল্পের মধ্যে কাষ্ঠ-চেরাই ও কাগজশিল্পই প্রধান।

কাঠ ও কাগজের কারখানাগুলি ইগার্কা এবং ক্রাসনোইয়ার্স্ক শহরে অবস্থিত।

প্রধান নগর ঃ ইর্কুটস্ক—এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা বৈকাল হ্রদের পশ্চিমে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর অবস্থিত। **ইয়াকুটস্ক**—ইয়াকুটস্ক রাজ্যের রাজধানী এবং পূর্ব সাইবেরিয়ার অন্যতম প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র। **ওমস্ক** পশ্চিম সাইবেরিয়ার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **টোমস্ক**—অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। **ক্রাসনোইয়ার্স্ক**—বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থান। **ইগার্কা**—ইনিসি নদীর তীরে অবস্থিত কাষ্ঠ রপ্তানির বন্দর। এই শহরে অনেক কাঠের কারখানা আছে। এখানে কাগজ তৈয়ারীর কলও আছে। **চিতা**—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের উপর অবস্থিত বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র।

(৩) **দক্ষিণ-পূর্ব সাইবেরিয়া**—সাইবেরিয়ার মধ্যে এই অঞ্চলই শিল্পে সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। কৃষিও এখানে খুব উন্নত। এখানে আমুর উপত্যকায় গম, বার্লি, সোয়াবিন এবং যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অরণ্যে প্রচুর কাষ্ঠ পাওয়া যায়। এখানে খনিজ সম্পদও প্রচুর। এখানে তামা, লৌহ, কয়লা এবং ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়।

প্রধান নগর ও বন্দর ঃ ভ্লাডিভোস্টক—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত প্রধান বন্দর এবং এই অঞ্চলের বৃহত্তম নগর। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ এখান পর্যন্ত গিয়াছে। এখানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, জাহাজ-নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা এবং কাপড়ের কল আছে। এই বন্দরের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। অন্যান্য শহরের মধ্যে **খাভারোভস্ক, কমোসোমলস্ক, নিকোলেইভস্ক** প্রধান।

(৪) **মধ্য এশিয়ার পার্বত্যভূমি অঞ্চল**—কাজাকের উচ্চভূমি হইতে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলের পার্বত্যভূমি পর্যন্ত সাইবেরিয়া সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এখানে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানেই বিখ্যাত কুজনেৎস্ক কয়লাখনি অবস্থিত। ইহা সোভিয়েট রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা-

উৎপাদন অঞ্চল। এই কয়লার উপরে ভিত্তি করিয়াই কুজাবাজ অঞ্চলে বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রচুর আকরিক লৌহও পাওয়া যায়। এ ছাড়া এখানে টিন, দস্তা, স্বর্ণ, টাংস্টেন এবং নীসাও পাওয়া যায়।

প্রধান নগর ও বন্দর: **কুজনেৎজ**—বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এখানে লৌহ ও ইস্পাতের বিরাট কারখানা আছে। **স্ট্যালিনস্ক**—এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শহর এবং বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **নভোসিবিরস্ক**—অন্যতম প্রধান শহর। **কেমেরোভো**—শিল্পকেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থান। **পেট্রোভস্ক**—লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৫) **রুশীয় তুর্কিস্তান**—এই অঞ্চল উষ্ণ মরুভূমির মত দেশ। এখানে তৃণভূমি অঞ্চলে কাজাক, কিরঘিজ প্রভৃতি যাযাবর জাতি বাস করে। মরূদ্যানেই কৃষিকার্য হয়। আজকাল জলসেচের সুবিধা করিয়া এইখানে কৃষিকার্য হইতেছে। খনিজসম্পদও এখানে প্রচুর আছে। তবে এখনও খনিজ শিল্প বা অন্য শিল্প গড়িয়া উঠে নাই।

কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিয়া এবং **তাজিকিস্তান**—এই পাঁচটি গণতন্ত্র এই অঞ্চলে পড়িয়াছে। ইহা সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে মহাচীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা প্রধানত কাজাক, তুর্ক, উজবেক, কিরঘিজ ও তাজিক জাতীয়। ইহাদের অধিকাংশই পূর্বে যাযাবর ছিল।

নদী ও হ্রদ: প্রধান নদী **আমু** (অক্সাস) ও **শির** আরল হ্রদে এবং **ইলি** ও অপর কয়েকটি নদী বলখাস হ্রদে পড়িয়াছে। **আরল** ও **বলখাস** লবণাক্ত হ্রদ। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক; শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই এখানে প্রবল। জলসেচ করিয়া স্থানে স্থানে কৃষিকার্য হয়। ফারগানার কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলা জন্মে। **কারাগণ্ডার** কয়লাখনি সমগ্র সোভিয়েট এলাকার মধ্যে তৃতীয়স্থানীয়।

প্রধান নগর ও বন্দর : আলমা-আটা (Alma-Ata) কাজাকিস্তানের রাজধানী। **আশ্‌কাবাদ** (Ashkabad) তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী। **তাশখন্দ** (Tashkent) উজবেকিস্তানের রাজধানী। **ফ্রানজ** কিরঘিজিয়ার রাজধানী। **স্ট্যালিনাবাদ** তাজাকিস্তানের রাজধানী। **খিবা** (Khiba), **বোখারা** (Bokhara) ও **সমরখন্দ** (Samarkand) উজবেকিস্তানের অন্যান্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সমরখন্দে ভারত-ইতিহাসখ্যাত তৈমুরলঙ্গের সমাধি আছে।

(৬) **ককেসীয় অঞ্চল**—কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী অংশে ককেশাস ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সোভিয়েট এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসাবে ধরা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার **আর্মেনিয়া, জর্জিয়া** ও **আজেরবাইজান**—এই তিনটি গণতন্ত্র এখানে অবস্থিত।

এই অঞ্চলের মধ্যভাগে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ককেসাস পর্বত অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বে উপত্যকাভূমি। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ভূমিও অত্যন্ত উর্বর। আর্মেনিয়া মালভূমি এবং ককেশাস পর্বতের মাঝে জর্জিয়া ও আজেরবাইজান। ককেশাস উপত্যকায় বেশ বৃষ্টি হয় বলিয়া কৃষিকার্যের বড় সুবিধা। এই অঞ্চলে গম, ধান, তূলা, তামাক, আখ, কমলালেবু, আঙুর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। জর্জিয়ায় লৌহ, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা ও লবণের খনি আছে, জর্জিয়ার রাজধানী **তিবিলিসি** (পূর্ব নাম—তিফলিস) বাণিজ্যস্থান। আজেরবাইজানের রাজধানী **বাকু** (Baku) কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত। এখানকার খনিজ তৈলকূপ প্রসিদ্ধ। ঐ তৈল নলের ভিতর দিয়া ৬০০ মাইল দূরে কৃষ্ণসাগরতীরবর্তী **বাটুম** (Batum) বন্দরে লইয়া যাওয়া হয়। **এরিভ্যান**—আর্মেনিয়ার রাজধানী। রেলপথে ইহা ইউরোপীয় রাশিয়া ও ইরাণের সহিত সংযুক্ত।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ব্রহ্মদেশ বা ব্রহ্ম যুক্তরাষ্ট্র

ব্রহ্মদেশ ভারতের নিকট প্রতিবেশী। পূর্বে ইহা ভারত সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত ছিল। ১৯৩৭ অব্দে ইহাকে পৃথক করা হয়। এখন ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ব্রহ্মের সহিত পাক-ভারতের স্থলপথে সামান্য যোগাযোগ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইম্ফল হইতে টামু, হুকং উপত্যকা প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া কয়েকটি রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চল অরণ্য-পর্বতসঙ্কুল, অস্বাস্থ্যকর ও জনবিরল। উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত কতকগুলি পর্বতমালা ও মধ্যবর্তী উপত্যকায় এই দেশ গঠিত। পর্বতগুলি হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছে।

অবস্থান ও আয়তন—ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগে পার্বত্যভূমি। পশ্চিমদিকে উপকূলের সহিত সমান্তরালভাবে **আরাকান য়োমা** পাহাড় অবস্থিত। সর্বদক্ষিণে **টেনাসেরিম য়োমা** পাহাড়। পূর্বদিকে **শান মালভূমি**। আরাকান য়োমা ও শান মালভূমির মধ্যভাগে **ইরাবতী** ও **সিতাং উপত্যকা**। এই দুই উপত্যকার মধ্যভাগে **পেগুয়োমা** পাহাড়। ব্রহ্মদেশের নদীগুলির মধ্যে **ইরাবতী, সালুইন, সিটাং** এবং ইরাবতীর উপনদী **চিন্দুইন** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু—জলবায়ুর দিক দিয়া ব্রহ্মদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) উপকূলের অতি-বৃষ্টিপাতযুক্ত অরণ্যাচ্ছাদিত অঞ্চল, এবং (২) মধ্য দেশের অল্পবৃষ্টি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল।

ভূপ্রকৃতি—ব্রহ্মদেশকে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি**—আরাকান পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র সমভূমি দেখা যায়। এই অঞ্চলের মাটি সাধারণত উর্বর এবং বৃষ্টিপাত অধিক। এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়।

(২) **আরাকান পর্বত ও তাহার উত্তরের মালভূমি**—এই অঞ্চলে মৌসুমীবায়ু প্রতিহত হয় বলিয়া এখানে প্রবল বারিপাত হয়। পর্বতগাত্র

ঘন জঙ্গলে ঢাকা; কিন্তু মূল্যবান কাঠ খুব কম পাওয়া যায়। পার্বত্য বহু উপজাতি এই অঞ্চলে বাস করে। উপকূল ও দেশের মধ্যভাগের মধ্যে **আরাকান** পর্বত একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে।

(৩) **ইরাবতী ব-দ্বীপ**—এই অঞ্চল নবসৃষ্ট ব-দ্বীপ বলিয়া স্যাঁতসেঁতে ও অরণ্যময়। জঙ্গল কাটিয়া এখানে ধানের চাষ করা হইয়াছে।

(৪) **ইরাবতী উপত্যকা**—ব্রহ্মদেশের সমগ্র মধ্যভাগ জুড়িয়া প্রশস্ত ইরাবতী উপত্যকা। এখানে প্রচুর ধান হয়। উত্তরভাগে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া সেখানে তুলা, গম, জোয়ার প্রভৃতির চাষ হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর মূল্যবান সেগুনকাঠ পাওয়া যায়। উপত্যকার উত্তর- ও মধ্য-ভাগে প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। এখানে কিছু কয়লাও রহিয়াছে।

(৫) **শান মালভূমি**—ইরাবতী উপত্যকার পূর্বদিকে এই প্রাচীন মালভূমি অবস্থিত। কৃষিজ সম্পদে তেমন উন্নত না হইলেও ইহা খনিজ সম্পদে পূর্ণ। বডুইন, মোগক প্রভৃতি স্থানে রৌপ্য, তাম্র, সীসা ও নিকেল পাওয়া যায়। মূল্যবান প্রস্তরও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সালুইন নদীর খাতের দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্যে মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। পেগু পর্বত ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

(৬) **টেনাসেরিম মালভূমি**—ইহা ব্রহ্মদেশের দক্ষিণপ্রান্ত। অরণ্যাচ্ছাদিত হইলেও এই স্থানটির গুরুত্ব কম নহে। এখানে প্রচুর টিন ও টাংস্টেন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া জাপানী আমলে নির্মিত ব্রহ্ম-শ্যাম রেলপথ গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ কৃষিপ্রধান। লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক দেড় কোটি। লোকসংখ্যার অল্পতা ও জলবায়ুর আনুকূল্যহেতু যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান-রপ্তানিকারক দেশ ছিল। প্রধান মিটারগেজ রেলপথ রেঙ্গুনের সহিত মান্দালয়, মিচিনা, প্রোম ও পেগুর সংযোগস্থাপন করিয়াছে। ইরাবতী, চিন্দুইন প্রভৃতি নদীতে বারো মাস স্টীমার চলাচল করে।

প্রধান নগর ও বন্দরঃ ইরাবতী নদীর এক শাখার (রেঙ্গুন নদী) তীরে অবস্থিত **রেঙ্গুন** (Rangoon) রাজধানী ও প্রধান বন্দর। এখানে চাউলের

কল, করাত কল, খনিজ তৈলশোধনের কারখানা ও চুরুটের কারখানা আছে। এখান হইতে চাউল, সেগুনকাঠ ও পেট্রোলিয়াম রপ্তানি হয়। **বেসিন** ইরাবতীর ব-দ্বীপে অবস্থিত বন্দর। **আকিয়াব** আরাকান উপকূলে অবস্থিত বন্দর। **মৌলমিন** সালুইন নদীর মোহানায় অবস্থিত বন্দর। **মান্দালয়** ইরাবতী নদীর তীরে দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত ; ইহা পুরাতন রাজধানী ও একটি বন্দর ; **ট্যাভয়** ও **মার্গুই** টেনাসেরিম উপকূলে অবস্থিত দুইটি ছোট বন্দর। **ভামো** চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের বাণিজ্যস্থান। **মাইমো** স্বাস্থ্যকর গ্রীষ্মাবাস।

ইন্দোচীন

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে ইহা অবস্থিত। **কোচিন-চীন, টংকিং, আনাম, কাম্বোডিয়া** ও দেশীয় রাজ্য **লেয়স** লইয়া গঠিত। কোচিন-চীন, টংকিং ও আনামের মিলিত নাম **ভিয়েটনাম**। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই রাজনৈতিক পরিবর্তন হইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফরাসীর অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এখানে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের জন্যও নিজেদের মধ্যে আদর্শগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের জেনেভা চুক্তির ফলে এখানে যুদ্ধবিরতি হইয়াছে। ১৭° উ. অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েটনামকে অস্থায়িভাবে দুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে। উত্তর ভাগ উত্তর ভিয়েটনাম এবং দক্ষিণ ভাগ দক্ষিণ ভিয়েটনাম।

প্রধান নগর ও বন্দর : ইন্দোচীনের উত্তরভাগ পার্বত্য অঞ্চল ; দক্ষিণভাগে মেকং নদীর ব-দ্বীপ। ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচুর ধান, আখ, তুলা ও মশলা উৎপন্ন হয়। কয়লা, টিন ও দস্তা এখানকার প্রধান খনিজ দ্রব্য। **হ্যানয়** (Hanoi) টংকিং-এর রাজধানী। **হাইফং** একটি বন্দর। **হুয়ে** (Hue) আনামের রাজধানী। কোচিন-চীনের রাজধানী **সাইগন** (Saigon)। কাম্বোডিয়া ও লেয়সের রাজধানী যথাক্রমে **প্নমপেন** (Pnompen) ও **ভিয়েন-টিয়ান** (Vientian)।

শ্যাম (Siam)

ইহার উত্তর ভাগ পার্বত্য ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ঐ অঞ্চল হইতে প্রচুর সেগুনকাঠ, লাক্ষা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। দক্ষিণে মেনাম নদীর উর্বর অববাহিকা। এখানে ধান, তামাক, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে
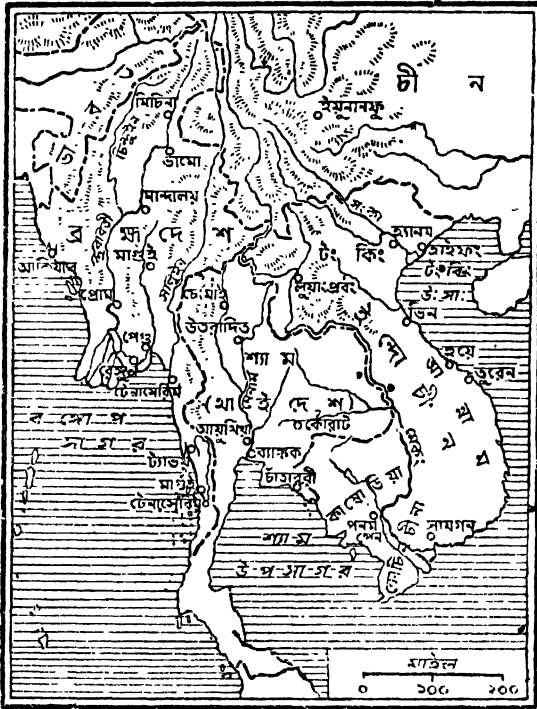
৮২নং চিত্র—ইন্দোচীন উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশ

জন্মে। **ব্যাঙ্কক** রাজধানী ও বন্দর; এখান হইতে প্রচুর চাল রপ্তানি হয়; ব্যাঙ্কক হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের সঙ্কীর্ণ অংশে টিন ও উলফ্রামের খনি আছে।

মালয় উপদ্বীপ (Malaya Peninsula)

এই উপদ্বীপের মধ্যভাগে মালভূমি, দুই উপকূলে সমভূমি। মালভূমির উপরে নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া **রবারের** চাষ হইতেছে। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **টিন** প্রধান। পৃথিবীর অর্ধেক রবার এবং এক-তৃতীয়াংশ টিন মালয়ে উৎপন্ন হয়। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে তামাক, চা, কর্পূর, মশলা, সাগু, আম, নারিকেল ইত্যাদি প্রধান।

মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশ ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ অংশ দুই রাজনৈতিক বিভাগে ভাগ হইয়াছে :

(১) বৃটিশ উপনিবেশ, পেনাং ও মালাক্কা এবং নয়টি দেশীয় সুলতানের রাজ্য (জোহর, পাহাং, পেরাক ইত্যাদি) লইয়া মালয় ফেডারেশন (ফেডারেটেড ও নন-ফেডারেটেড) রাজ্য গঠিত। ইহা ইংরেজ-প্রভাবিত। ফেডারেশনের রাজধানী **কুয়ালালমপুর**। পেনাং-এর প্রধান শহর **জর্জ টাউন**। **পেনাং** বৃটিশ-অধিকৃত বন্দর।

(২) উপকূলের দক্ষিণে সিঙ্গাপুর উপনিবেশ। অনেকগুলি দ্বীপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রধান দ্বীপ সিঙ্গাপুরের আয়তন ২২০ বর্গমাইল। **সিঙ্গাপুর** শহর পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বন্দর, পোতাশ্রয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র। চীন জাপান ও অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারত-পাকিস্তান, ইউরোপ ও আফ্রিকায় যাতায়াত করিবার সময় মালাক্কা প্রণালীর মুখে অবস্থিত এই স্থান অতিক্রম করিতে হয়, সেইজন্য ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যধিক। সম্প্রতি সিঙ্গাপুর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

সুমাত্রা (Sumatra), **জাভা** (যবদ্বীপ—Java), **বলি** (Bali), **লম্বক** (Lombok), **টাইমর** (Timor), **বোর্নিও** (Borneo), **সেলিবিস** (Celebes) **মলাক্কাস** (Moluccas), **সুণ্ডা** (Sunda) **ফিলিপাইন**, **নিউগিনি** প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ। পশ্চিমের দ্বীপগুলির উদ্ভিদ ও জীবজন্তু মোটামুটি এশিয়ার অনুরূপ। পূর্ব অংশের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সহিত অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সাদৃশ্য আছে।
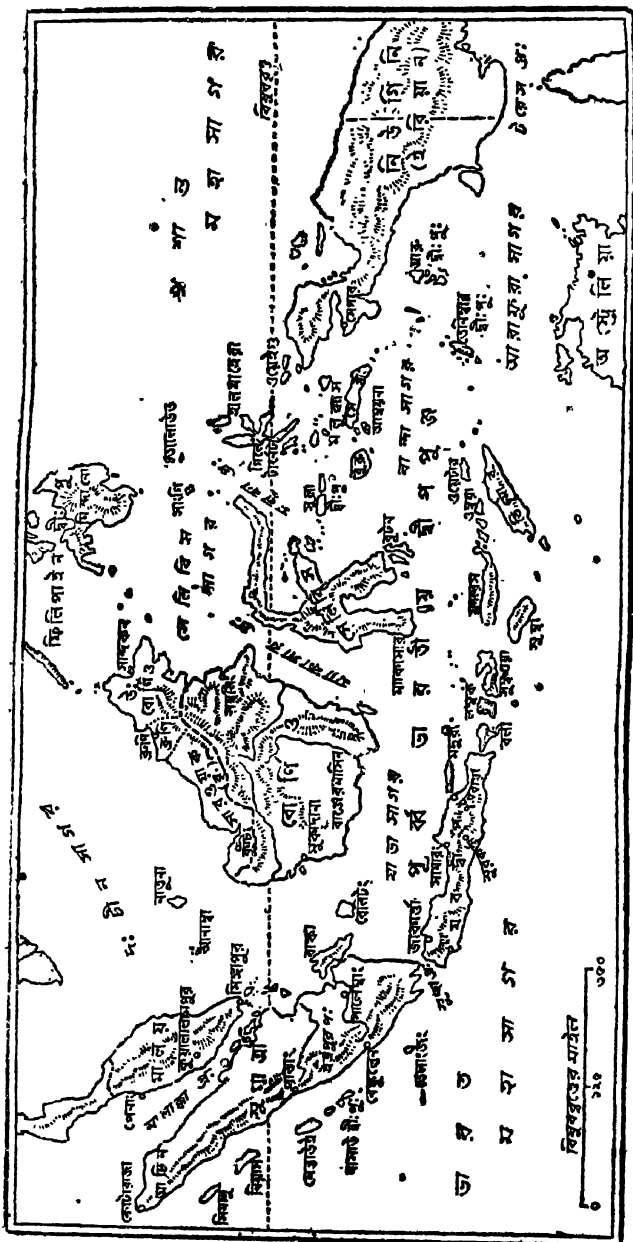
৮৩নং চিত্র—পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ওয়ালেস (Wallace) একটি কল্পিত রেখায় উভয় অংশের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। উহা **ওয়ালেস রেখা** নামে অভিহিত হয়।

দ্বীপগুলির অধিকাংশই ভঙ্গিল পর্বতমালাকে শিরদাঁড়ার মত অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রবালসম্ভূত। আগ্নেয়দ্বীপও আছে। বিখ্যাত ক্রাকাটোয়া আগ্নেয়দ্বীপ ইহাদের অন্যতম। অনেক দ্বীপে জীবন্ত আগ্নেয়গিরিও আছে। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত বলিয়া এবং মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হয় বলিয়া সেগুন, আবলুস, চন্দন, রবার, গাটাপার্চা, বাঁশ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। রবার, সিঙ্কোনা, চা, কফি, তামাক, ধান, কর্পূর, সাগু প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। খনিজ তৈল, টিন ও কয়লা এই অঞ্চলের প্রধান খনিজ সম্পদ।

ইন্দোনেশিয়া (Indonesia)

সুমাত্রা, জাভা, বলি, লম্বক, বোর্নিওর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, সুণ্ডা, মলাক্কাস, টাইমর দ্বীপের দক্ষিণভাগ এবং নিউগিনির পশ্চিম অংশ ওলন্দাজ অধিকারভুক্ত ছিল। ইহাদের সাধারণ নাম ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া সম্প্রতি স্বাধীনতা পাইয়াছে। এক্ষণে ইহা ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র ও পূর্ব ইন্দোনেশিয়া—এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত। সাধারণতন্ত্রের রাজধানী **জাকর্তা** (পূর্ব নাম **বাটাভিয়া**) জাভায় অবস্থিত। ইহা একটি প্রধান বন্দর।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপগুলির মধ্যে জাভাই সর্বাধিক উন্নতিশীল। ইহা অত্যন্ত জনবহুল ; আয়তনে ৫২,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এখানে আখের চাষ খুব উন্নত ; এখান হইতে প্রচুর চিনি রপ্তানি হয়। **সুরাবায়া** ও **সামারাং** জাভার অন্য দুইটি বন্দর।

পদং, বেঙ্কুলনা সুমাত্রার দুইটি শহর। সেলিবিসের দক্ষিণাংশে **ম্যাকাসার** প্রধান বাণিজ্যস্থান। মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জে জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি মশলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; সেইজন্য ইহাকে **স্পাইস দ্বীপপুঞ্জ** বলা হয়। ইন্দোনেশীয়দেব অধিকাংশ মুসলমান। জাভা, সুমাত্রা, বলি ও লম্বকে হিন্দুসভ্যতার নিদর্শন আছে ; বলি ও পশ্চিম লম্বকে প্রায় ১৩ লক্ষ হিন্দু আছে।

বোর্নিও-র উত্তরাংশ **বৃটিশ উত্তর বোর্নিও**। ইহা ইংরেজ-গবর্নরের শাসনাধীন। উত্তর-পশ্চিমে **সারাওয়াক** (Sarawak) রাজ্যও সম্প্রতি বৃটিশ উপনিবেশভুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের সাগু ও তামাক সুপ্রসিদ্ধ। টাইমর দ্বীপের কিয়দংশ পোর্তুগীজদের অধিকৃত।
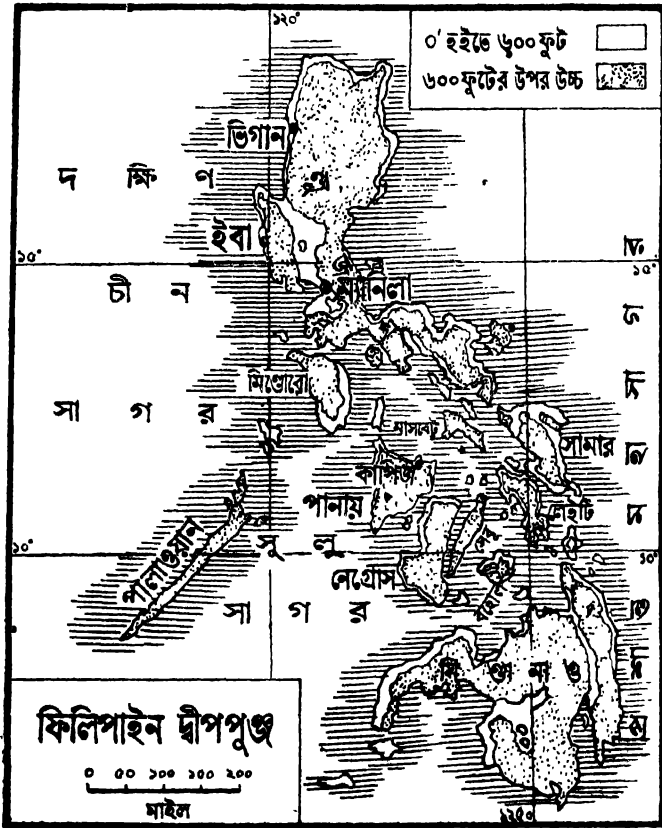
৮৪নং চিত্র—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ

ফিলিপাইন সাধারণতন্ত্র—(Republique de Filipinos)

এই দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা ৭ হাজারেরও বেশী। ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল, বর্তমানে স্বাধীন হইয়াছে। ইংরেজী ও স্পেনীয় ভাষা

ছাড়া প্রায় ৬৪ প্রকার দেশীয় ভাষা এখানে প্রচলিত। ঐ সব দেশীয় ভাষা হইতে একটি রাষ্ট্রভাষা তৈয়ারী হইতেছে। আবাকা (ম্যানিলা-শণ) নামক এক প্রকার কদলীজাতীয় গাছের আঁশ হইতে দড়ি ও কাগজ প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ব্যবসায়ে ফিলিপাইন বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে আখ, তামাক, বিখ্যাত ম্যানিলা-শণ এবং খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সোনা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমিয়ম প্রধান। রাজধানী **ম্যানিলা** (Manila) লুজান দ্বীপে অবস্থিত। এখান হইতে ম্যাঙ্গানিজ, চুরুট, শণ, তামাক ও দড়ি রপ্তানি হয়।

দক্ষিণ এশিয়া

ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও সিংহল দ্বীপ লইয়া দক্ষিণ এশিয়া।

ভারত ও পাকিস্তান—ভারত ও পাকিস্তান আমাদের জন্মভূমি। চতুর্থ খণ্ডে এই দুইটি রাষ্ট্রসম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইয়াছে। ভারতের উত্তরে নেপাল ও ভুটান পৃথক রাষ্ট্র। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলিয়া উহাদের বিবরণও সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ—লঙ্কা (সিংহল) দ্বীপ ভৌগোলিক হিসাবে ভারতেরই অংশ। ভারতের সহিত ইহার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আছে। কিন্তু ইহা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য—ভারতের সহিত এক কমনওয়েলথে আছে, এইমাত্র সম্পর্ক। মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী ইহাকে ভারত হইতে পৃথক করিতেছে। **রামেশ্বরম্** ও **তালাই মান্নার** নামক দ্বীপদ্বয় এবং উহার মধ্যভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-দ্বীপমালার অবস্থান হইতে বোঝা যায় যে একদা লঙ্কা ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রবাল-দ্বীপমালাকে **সেতুবন্ধ** (Adam's Bridge) বলে।

লঙ্কার মধ্যভাগ পর্বতময়। পর্বতের চারিদিকে সমভূমি। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ **পেড্রোটালাগালা** (Pedrotalagala, ৮,৩০০ ফুট) ও **আদম শৃঙ্গ** (Adam's Peak, ৭,৩০০ ফুট)। পর্বত হইতে অনেক ছোট ছোট নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে **মহাবলী গঙ্গা** দীর্ঘতম। উপকূলভাগ ভগ্ন। উভয়

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে লঙ্কায় শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের জন্য এবং চারিদিকে সমুদ্র থাকায় জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

চা, কোকো, তামাক, ধান, তৈলবীজ, নারিকেল, রবার, সিঙ্কোনা, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি মশলা লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বনভূমিতে আবলুস, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গ্রাফাইট ও লৌহ প্রধান। অনেক প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়। সমুদ্রকূলে মুক্তা তোলা হয়।

কলম্বো (Colombo) রাজধানী। ইহা পশ্চিম উপকূলের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও পোতাশ্রয়। এই বন্দর হইতে পূর্ব ও পশ্চিম ভারত মহাসাগরের উপর দিয়া নানা সমুদ্রপথ আছে। **কাণ্ডি** প্রাচীন রাজধানী। **অনুরাধাপুর** বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ; এখানে প্রাচীন মহানগরীর ভগ্নাবশেষ আছে। **গল** (Galle) ও **ত্রিঙ্কোমালি** (Trincomalee) দুইটি বন্দর ও পোতাশ্রয়। **জাফনা** পক-প্রণালীর উপকূলভাগে তামিলপ্রধান নগর। **নুয়ারা ইলিয়া**—বিখ্যাত শৈলাবাস।
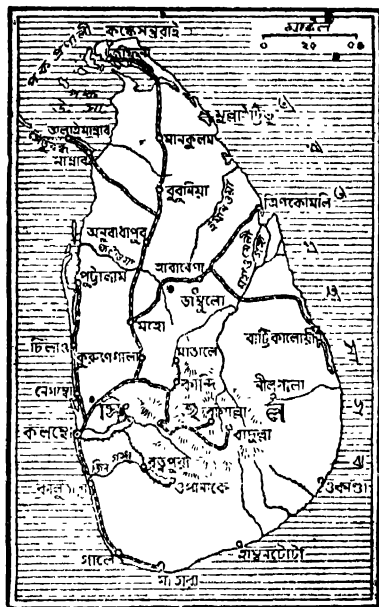
৮৫নং চিত্র—লঙ্কা (সিংহল)

প্রশ্নাবলী

১। পামীর গ্রন্থি হইতে যে সকল পর্বত বিভিন্ন দিকে বাহির হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। এশিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি বর্ণনা কর এবং এশিয়ার ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি তাহা লিখ

৩। এশিয়ার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর জলবায়ুর প্রভাব কতখানি তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। এশিয়া মহাদেশকে কয়টি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে বল। যে-কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণ লিখ।

৫। জাপানের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও। জাপানের আর্থিক অবস্থা শিল্পের উপর কতখানি নির্ভরশীল বল।

৬। চীনদেশ অথবা সোভিয়েট এশিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

৭। এশিয়ার মৌসুমি অঞ্চল বলিতে কোন অঞ্চলকে বুঝায়? এই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? এই অঞ্চলের কৃষিজ ফসল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। বল, কেন?

(ক) মালয় হইতে প্রচুর রবার বিদেশে চালান হয়। (কঃ বিঃ ১৯৪০)

(খ) সোভিয়েট এশিয়ার লোকবসতি অতি বিরল। (কঃ বিঃ ১৯৪০)

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গ্রীষ্মকালেই বৃষ্টিপাত হয়। (কঃ বিঃ ১৯৪১)

(ঘ) আরবের লোকসংখ্যা খুব কম। (কঃ বিঃ ১৯৪৩)

(ঙ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। (কঃ বিঃ ১৯৪৮)

(চ) মাছ ও ভাত জাপানীদের প্রধান খাদ্য। (কঃ বিঃ ১৯৫০)

৯। ইরাণ অথবা তুরস্কের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ।

১০। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কি, কোথায় এবং কেন প্রসিদ্ধ বল :—

হংকং, সিঙ্গাপুর, পিকিং, সাংহাই, ইয়োকোহামা, কোবে, মক্কা, ইজমির, আবাদান, বাগদাদ, জেরুজালেম, এডেন, রেঙ্গুন, মান্দালয়, টোকিও, ম্যানিলা, কলম্বো, ভ্লাডিভোষ্টক, আঙ্কারা, ইস্পাহান, সিরাজ, কাবল, পোর্টআর্থার, ওসাকা, কুজনেৎজ, সমরখন্দ, ব্যাঙ্কক, জাকার্তা।

চতুর্থ খণ্ড

ভারত ও পাকিস্তান

ভারত

এশিয়ার দক্ষিণ ভাগে তিনটি বৃহৎ উপদ্বীপ আছে—মাঝেরটি ভারত। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া—চারি মহাদেশের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ইহার অবস্থান। আয়তনে ইহা বিশাল। পর্বত, প্রান্তর, অরণ্য, মরুভূমি—সকল রকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এখানে আছে। অধিবাসী এবং জীবজন্তুও বহুবিচিত্র। ইহার প্রায় তিনদিকে সাগর ও একদিকে পর্বত; এমন স্বাভাবিক-সীমাবেষ্টিত দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এইসব কারণে ভারতকে **পৃথিবীর প্রতিরূপ** (Epitome of the World) বলা হয়।

১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগস্ট পূর্বতন **ভারতবর্ষ** বৃটিশের অধীনতামুক্ত দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। একটি **ভারত**, অপরটি **পাকিস্তান**।

সীমা—ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা; উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম-পাকিস্তান; পশ্চিমে আরব সাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর; দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ; উত্তর-পূর্বে পাতকোই ও লুসাই পর্বত।

অবস্থান ও আয়তন—নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ৮° ডিগ্রি উঃ (কুমারিকা) হইতে ৩৬১/২° ডিগ্রি (হিন্দুকুশ-কারাকোরমের সংযোগস্থল) উঃ অক্ষাংশের মধ্যে এই দেশ অবস্থিত। প্রায় মাঝখান দিয়া কর্কটক্রান্তি-রেখা গিয়াছে। পশ্চিমে কচ্ছ হইতে পূর্বে আসামের পূর্ব-সীমানা (৬৭১/২° ডিগ্রি পূ. হইতে ৫৭° ডিগ্রি পূ. দেশান্তর) অবধি ভারতের বিস্তার। ইহার উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি প্রায় ২০২২ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে আসামের পূর্ব-সীমা হইতে রাজস্থানের পশ্চিম-সীমা পর্যন্ত প্রায় ২৯২৫ মাইল। মোট আয়তন

১২,২০,০৯৯ মাইল—অর্থাৎ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় দশ গুণ; রাশিয়া বাদে ইউরোপের বাকি অংশের চেয়ে কিছু বড়।

উপকূল—ভারতের তটরেখা প্রায় সরল ও অভগ্ন। দৈর্ঘ্য মাত্র সাড়ে তিন হাজার মাইল। অর্থাৎ প্রতি ৩৫০ বর্গমাইল আয়তনে উপকূল মাত্র ১ মাইল। উত্তরে কচ্ছ হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত **পশ্চিম উপকূল**।

পশ্চিম উপকূলের বোম্বাই হইতে গোয়া পর্যন্ত **কঙ্কণ** এবং গোয়া হইতে কুমারিকা পর্যন্ত **মালাবার** উপকূল নামে খ্যাত। কুমারিকা হইতে পশ্চিম-বঙ্গের পূর্ব-সীমানা অবধি **পূর্ব উপকূল**। পূর্ব উপকূলে কুমারিকা হইতে কৃষ্ণা নদীর মুখ পর্যন্ত **কর্ণাট** এবং কৃষ্ণার মুখ হইতে মহানদীর মুখ পর্যন্ত **উত্তর সরকার** (Northern Sircars) নামে পরিচিত। পূর্ব-উপকূলকে **করোমণ্ডল উপকূল** বলা হয়।

পশ্চিম উপকূল—কচ্ছ ও কাম্বে উপসাগর এই উপকূলে অবস্থিত। কচ্ছ অত্যন্ত অগভীর। এই দুই উপসাগরের মধ্যে **কাথিয়াবাড়** (গুজরাট) **উপদ্বীপ**। দক্ষিণে **মান্নার উপসাগর** ও **পক প্রণালী** ভারত হইতে লঙ্কাদ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

এই উপকূলে সমুদ্রের কাছাকাছি **পশ্চিমঘাট পর্বত**। উপকূল ও পর্বতের মধ্যবর্তী সমভূমি সংকীর্ণ; তটসীমা হইতে গভীর সমুদ্রের আরম্ভ। সেইজন্য কতকগুলি স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিয়াছে। **বোম্বাই, মর্মগাঁও, গোয়া** ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। **কোচিন** বন্দরও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। কিন্তু বালুচরে ক্রমশ ইহার মুখ আটকাইয়া যাইতেছিল; এখন নিবারণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই উপকূলে **কান্দলা** নামক স্থানে একটি উৎকৃষ্ট বন্দর তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ব উপকূল—চিল্কা, পুলিকট প্রভৃতি উপহ্রদ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের **ব-দ্বীপের কিয়দংশ** (অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত) এবং মহানদী, কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতির **ব-দ্বীপ** আছে। উপকূলভাগ অধিক পার্বত্য নহে; **পূর্বঘাট পর্বত** ক্রমশ ঢালু হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে। উপকূল ও পর্বতের মধ্যবর্তী সমভূমি প্রশস্ত। সমুদ্র অগভীর, ঢেউও অত্যন্ত বেশী। সেজন্য

বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের অভাব। **মাদ্রাজ** বন্দরের পোতাশ্রয় কৃত্রিম—সমুদ্রে বাঁধ দিয়া বহু অর্থব্যয়ে উহা নির্মিত। **ভিজাগাপত্তমে** একটি বড় পোতাশ্রয় আছে। **কলিকাতা** নদী-বন্দরেও একটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ারী হইয়াছে।

দ্বীপ—পশ্চিম উপকূল **বেসিন, সালসেট, বোম্বাই, সেণ্টমেরি, দিউ** প্রভৃতি মহাদেশীয় দ্বীপ এবং উপকূল হইতে কিছু দূরে **মালদ্বীপ** ও **লাক্ষাদ্বীপ** —এই দুইটি প্রধান দ্বীপপুঞ্জ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ দিকে **লঙ্কা** (সিংহল) দ্বীপ অবস্থিত। ভারত ও লঙ্কার মধ্যে রহিয়াছে মান্নার ও রামেশ্বরম্ এবং **সেতুবন্ধ** (Adam's Bridge—২২ মাইল) নামক ঘনসন্নিবিষ্ট প্রবালদ্বীপমালা। পূর্ব উপকূলের নিকট পুলিকট, শ্রীহরিকোট সাবুর দ্বীপ প্রভৃতি ছোট ছোট দ্বীপ এবং বঙ্গোপসাগরে **আন্দামান** ও **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। আন্দামান ও নিকোবর ভারতের অন্তর্ভূক্ত।

ভূ-প্রকৃতি

ভারত একটি বিশাল উপদ্বীপ--প্রায় ত্রিভুজের মত উহার আকার। ভূতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, সুপ্রাচীনকালে মধ্য এশিয়ার পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পযন্ত টেথিস নামক এক সাগর ছিল। উহার উত্তরে লরাশিয়া ও দক্ষিণে গণ্ডোয়ানা নামে দুইটি মহাদেশ ছিল। সমুদ্র ছিল ঐ দুই মহাদেশের মাঝখানে; ভূ-সংক্ষোভের ফলে দক্ষিণের আগ্নেয়শিলাময় গণ্ডোয়ানা মহাদেশ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য অংশ উত্তর দিকে সরিয়া যায় (continental drift) এবং টেথিস সাগরের মধ্যস্থ বিপুল পাললিক শিলাস্তর উঁচু হইয়া হিমালয় প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বতমালায় পরিণত হয়। হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যস্থ ভূ-ভাগ বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রের অংশ ছিল। ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আগত নদীর পললে ভরাট হইয়া সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার সৃষ্টি হয়।

ভূমির বন্ধুরতা অনুসারে ভারতের চারিটি বিভাগ—(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**; (২) **উত্তর-ভারতের সমভূমি**; (৩) **দক্ষিণের মালভূমি**; (৪) **সঙ্কীর্ণ উপকূলভূমি**।

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল**—ভারতের সর্বোত্তর সীমা ছাড়াইয়া **পামির মালভূমি**। এই মালভূমি পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম, তাই ইহাকে **পৃথিবীর ছাদ** (the roof of the world) বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে বহু পর্বতমালা এখান হইতে বিস্তৃত হইয়াছে। সেজন্য ইহা **পামির গ্রন্থি**
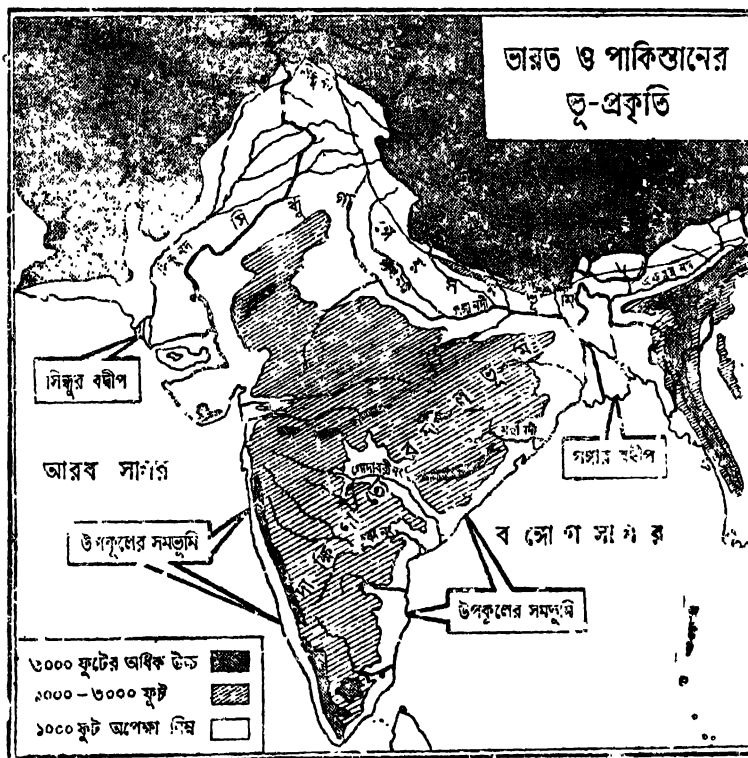
৮৬নং চিত্র—ভারত ও পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতি

(Pamir Knot) নামে প্রসিদ্ধ। **হিমালয়** পামির গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়াছে। ভারতের উত্তর দিকে এই পর্বতমালা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বে, পরে পূর্ব দিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

হিমালয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা (গড়-উচ্চতা ২০,০০০ ফুট)। দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া আন্দিজ ও রকির পরে ইহার স্থান (১৫০০ মাইল)। ইহার বিস্তার ১৫০ হইতে ২০০ মাইল। প্রধান শৃঙ্গগুলির (পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে) নাম—**নাঙ্গা পর্বত** (২৬,৬২০ ফুট), **নন্দাদেবী** (২৫,৬৬১ ফুট), **ধবলগিরি** (২৬,৮২৬ ফুট), **মাউণ্ট এভারেস্ট** (২৯,১৪১ ফুট), **গৌরীশঙ্কর** (২৩,৪৪০ ফুট) এবং **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (২৮,১৫৬ ফুট)। এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ; কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয়স্থানীয়।

রাধানাথ শিকদার নামক জরিপ-বিভাগের একজন বাঙালী কর্মচারী ১৮৫৪ অব্দে এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। সার জন এভারেস্ট সেই সময়ে জরিপ-বিভাগের প্রধান ছিলেন, তাঁহার নাম অনুসারে শৃঙ্গের নামকরণ হইয়াছে।

হিমালয়ে নানা জীবজন্তুর কঙ্কাল ও জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বোঝা যায়, এই পর্বত সমুদ্র-নিম্নের পলিমাটি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। হিমালয় স্তরীভূত শিলায় গঠিত।

হিমালয়ের পশ্চিম অংশে প্রায় সমান্তরাল তিনটি পর্বতমালা অবস্থিত। সর্ব-দক্ষিণের পর্বতমালা নীচু ও অনতিদীর্ঘ। ইহাকে **অব-হিমালয়** (Sub-Himalayan Range) বলে। **শিবালিক পাহাড়** ইহার অন্তর্গত। মাঝের পর্বতমালা উচ্চতা (৬,০০০০ হইতে ১৫,০০০ হাজার ফুট) ও প্রাচীনত্বের হিসাবে মধ্যম শ্রেণীর; ইহা **মধ্য-হিমালয়** (Middle Himalayas) নামে অভিহিত হয়। কাশ্মীরের **পিরপঞ্জাল** পর্বত ইহার অন্তর্গত। সকলের উত্তরে সর্বোচ্চ ও প্রাচীনতম অংশ; ইহাকে **প্রধান হিমালয়শ্রেণী** (Main Himalayas) বলা যাইতে পারে। প্রধান শৃঙ্গগুলি এই অংশে অবস্থিত।

প্রধান হিমালয়শ্রেণীর উত্তর-পশ্চিমে **কারাকোরাম** পর্বতমালা (গড়-উচ্চতা ১৮,০০০ ফুট)। ইহার প্রধান শৃঙ্গ **গডউইন অস্টেন** বা K_2 (১৮,২৮৩ ফুট) উচ্চতায় দ্বিতীয়স্থানীয়। কারাকোরামের একটি শাখায় **কৈলাস পর্বত** অবস্থিত। ইহার নিকটে **মানস সরোবর** হ্রদ। কৈলাস ও মানস সরোবর হিন্দুতীর্থ—ইহারা ভারত-সীমার বাহিরে তিব্বতে অবস্থিত।

অব-হিমালয় ও মধ্য হিমালয়ের মাঝে **ডুন** (উত্তর প্রদেশ) ও **মারে** (নেপাল) উপত্যকা, মধ্য ও প্রধান হিমালয়ের মাঝে **কাশ্মীর** (বা বিতস্তা) উপত্যকা; প্রধান হিমালয় ও কারাকোরামের মাঝে **সিন্ধু** উপত্যকা অবস্থিত।

হিমালয়ের পূর্ব ভাগে **পাটকোই, নাগা, বরাইল** ও **লুসাই** পর্বত আসামের পূর্ব অঞ্চল দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছে। বরাইল হইতে **জয়ন্তিয়া, খাসিয়া** ও **গারো** পাহাড় পশ্চিম দিকে গিয়াছে। পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে **তরাই** অঞ্চল। ইহা দূরব্যাপ্ত আর্দ্র বনভূমি—এখানে বাঘ, হাতী, গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি বন্য জন্তুর বাস।

গিরিপথ—হিমালয় পার হইয়া উত্তরে যাইবার কতকগুলি দুর্গম গিরিপথ আছে। তাহার মধ্যে **জোজিলা, ব্রুজিল** ও **সিপ্‌কি** প্রধান। জোজিলা গিরিপথের আরম্ভ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে।

কাশ্মীরের লেহ্‌ শহর হইতে কারাকোরাম পার হইয়া সাসার গিরিদ্বার-পথে ইয়ারখন্দ যাওয়া যায়। সিপ্‌কির পথ সিমলা হইতে শতদ্রুর খাত ধরিয়া সিপ্‌কি-গিরিদ্বার অতিক্রম করিয়া তিব্বত পর্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব অঞ্চলের **টুজু, মণিপুর, আন্** ও **টৌম্‌গুপ**-গিরিদ্বার অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাওয়া যায়।

হিমালয়ের উপকারিতা—(১) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই পর্বতে বাধা পায় বলিয়া ভারতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। (২) উত্তরের মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু এই পর্বতে আটকাইয়া যায় বলিয়া ভারতে বেশী শীত পড়ে না। (৩) গলিত তুষারে বহু নদী স্ফীতিলাভ করে; নদী-বাহিত পলিমাটিতে ভূমি উর্বর হয়: হিমালয়লব্ধ নৌপথে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। ইহা উত্তরের বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। (৪) ইহার অরণ্য-সম্পদ ও সৌন্দর্য অতুলনীয়। (৫) এখানে অনেক উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যনিবাস আছে; নিম্ন হিমালয় হইতে স্বাস্থ্যবান সৈনিক সংগ্রহ হইয়া থাকে।

(২) **উত্তর ভারতের সমভূমি**—পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল অবধি প্রায় ১,৫০০ মাইল দীর্ঘ এবং হিমালয় হইতে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অবধি ১৫০ মাইল হইতে ২০০ মাইল প্রশস্ত। মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অন্তর্গত **আরাবল্লী পর্বতমালা** (সর্বোচ্চ অংশ

আবুপাহাড়—৫,৬৫০ ফুট) ও উহার উত্তর-পূর্বে **দিল্লী শৈলশিরা** (Delhi Ridge) এই সমভূমির জলবিভাজিকা। পশ্চিমাংশ ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঢালু হইয়া আরব সাগর অবধি প্রসারিত হইয়াছে। উত্তরে হঠাৎ ও দক্ষিণে ক্রমশ উঁচু হইয়া ইহা হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। আসামপ্রান্তে এই সমভূমি উঁচু হইয়া ব্রহ্মের পর্বতমালার সঙ্গে মিশিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু এবং তাহাদের উপনদী-শাখানদীবাহিত পলিমাটিতে এই বিশাল সমভূমি গঠিত। স্থানে স্থানে স্তর এত গভীর, যে কয়েক হাজার ফুট খুঁড়িলেও কঠিন শিলা পাওয়া যায় না। ইহার পূর্ব অংশ অর্থাৎ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ঘনবসতি অঞ্চল।

(৩) **দক্ষিণের মালভূমি**—ইহা ত্রিভুজাকৃতি। গড়-উচ্চতা ২,০০০ ফুট। উত্তর ভাগ সরু, মধ্যভাগ প্রশস্ত। দক্ষিণে ক্রমশ সরু হইয়া ইহা **কুমারিকা** অন্তরীপে (Cape Comrin) শেষ হইয়াছে।

উত্তরাংশে—**আরাবল্লী পর্বত** ও রাজপুতনার প্রাচীন মালভূমিতে অবস্থিত **থর মরুভূমি**। **বিন্ধ্যপর্বতমালা** পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। বিন্ধ্যের দক্ষিণে উহার প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত **সাতপুরা পর্বত**। সাতপুরার পূর্ব দিকে **মহাদেব** ও **মহাকাল** পাহাড়। ছোটনাগপুরের **পরেশনাথ** পাহাড় এই মালভূমিকে দুই খণ্ডে ভাগ করিয়াছে। উত্তরের অংশ ছোট—উহাকে **মধ্য-ভারতের মালভূমি** বলে। বৃহত্তর অংশ উহার দক্ষিণে অবস্থিত।

পূর্ব সীমায় **পূর্বঘাট** (মলয়াদ্রি) এবং পশ্চিম সীমায় **পশ্চিমঘাট** (সহ্যাদ্রি) পর্বত অবস্থিত। এই দুই ঘাট দক্ষিণে যে-অংশে মিলিত হইয়াছে তাহার নাম **নীলগিরি** পর্বত। উহার সর্বোচ্চ চূড়া **দোদাবেট্টা** (৮৭৬০ ফুট)। ইহার দক্ষিণে **আনামলাই** (সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **আনামুদি**—৮,৮৫০ ফুট) ও **পুলনি** এবং সর্বদক্ষিণে **কার্দামম** পাহাড়। পশ্চিমঘাটে কয়েকটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ আছে; উহাদের মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে। উহাদের মধ্যে নাসিকের নিকট **থলঘাট** ও পুনার নিকট **ভোরঘাট** প্রধান। নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথ (৩০ মাইল দীর্ঘ, ১০০০ ফুট উঁচু) অবস্থিত।

আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত যে লাভায় মালভূমি গঠিত, তাহার নাম **ব্যাসল্ট** (Basalt)। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমে কাথিওয়াড় ও কচ্ছদেশেও এই ব্যাসল্টের স্তর দেখা যায়। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ইত্যাদির কার্যে ব্যাসল্টের স্তর ক্ষয়িত ও বিচূর্ণিত হইয়া মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উর্বর **কৃষ্ণমৃত্তিকা** তুলাচাষের বিশেষ উপযোগী। মালভূমির কিনারায় কিছু কিছু পাললিক শিলাস্তরও দেখা যায়; কয়লা ও বিবিধ ধাতুর খনি ঐ অংশে অবস্থিত।

(৪) **সঙ্কীর্ণ উপকূলভূমি**—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে সঙ্কীর্ণ সমভূমি আছে। পলিমাটিতে গঠিত এবং সমুদ্রকূলবর্তী বলিয়া ইহা উর্বর। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম উপকূলের অদূরেই পশ্চিমঘাট পর্বত—উপকূলভাগ কোথাও ৪০ মাইলের বেশী চওড়া নয়। পূর্ব-উপকূল প্রশস্ততর। পশ্চিম উপকূলে উল্লেখযোগ্য নদী নাই। পূর্ব-উপকূলে **মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী** প্রভৃতি নদী প্রবহমান।

সমভূমি ও মালভূমির তুলনা—উত্তর ভারতের সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রায় সম-আয়তন। কিন্তু সমভূমিতে লোকবসতি অধিক।

সমভূমির পলিমৃত্তিকা ও মালভূমির পলিমৃত্তিকা প্রায় সমান উর্বর। কিন্তু মালভূমিতে অপর যে মৃত্তিকা আছে, তাহা তেমন উর্বর নয়। সমভূমির মাটি কোমল ও কর্ষণযোগ্য। মালভূমির মাটি কঠিন—কৃষি এখানে কষ্টসাধ্য।

সমভূমিতে রাস্তাঘাট ও রেলপথ সহজে তৈয়ারী হয়। বন্ধুর মালভূমিতে রাস্তাঘাট তৈয়ারীর বড় অসুবিধা।

মৃত্তিকা—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বিভক্ত বিভিন্ন অংশের মৃত্তিকাও বিভিন্ন শ্রেণীর। উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের মাটি অনুর্বর ও প্রস্তরময়। উত্তর-ভারতের সমভূমিতে উর্বর পাললিক মাটি। স্থানবিশেষে এই অঞ্চলের মাটির দানা ও রঙের পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন ও নবীন হিসাবে পলিমাটির উর্বরতারও পার্থক্য আছে। গঙ্গানদীর ব-দ্বীপের মাটি লবণাক্ত ও কর্দমময়। দক্ষিণ ভারতের মালভূমিতে চারি প্রকার মাটি দেখা যায়—(১) উত্তর ও পূর্বভাগে মোটা দানার লাল মাটি। উহাতে প্রচুর লৌহ ও এলুমিনিয়াম আছে কিন্তু জৈব পদার্থ নাই। সেজন্য ইহা উর্বর নহে। (২) ছোটনাগপুর অঞ্চলে এবং অপর কয়েকটি স্থানে এক প্রকার ঘোর-লাল রঙের কঠিন

মাটি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে **ল্যাটারাইট** বলে। এই মাটির আদৌ উর্বরতা নাই। (৩) প্রাচীন আগ্নেয়গিরির লাভা হইতে সৃষ্ট **কৃষ্ণ মৃত্তিকা**; ইহার মধ্যে নানা প্রকার খনিজ সার আছে। সূক্ষ্ম দানা ও জলধারণ-ক্ষমতা থাকায় এই মাটি তুলা চাষের বিশেষ উপযোগী এই মাটি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে)। (৪) রাজস্থান অঞ্চল বালুকাময়—ঐ বালুমাটি

৮৭নং চিত্র—ভারত ও পাকিস্তানের মৃত্তিকা

আলগা ও সঞ্চরমান। ভারতের উপকূল অঞ্চল ব-দ্বীপের পলিমাটি ছাড়াও স্থানে স্থানে এক প্রকার লবণাক্ত পলিমাটি দেখা যায়। উহাতে পামজাতীয় গাছ ভাল জন্মে। ধানের চাষ করিতে হইলে উহা কয়েক বৎসর বৃষ্টির জলে বিধৌত করিতে হয়।

নদ নদী

উত্তর ভারত—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উত্তর ভারতের প্রধান নদী।

সিন্ধু—হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতে এই নদের উৎপত্তি। ইহার অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবাহিত। পাঁচটি উপনদীর মধ্যে শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবহমান। কেবলমাত্র **বিপাশা** ('Bias) ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে বহিতেছে।

গঙ্গা (১,৫৫৭ মাইল)—ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদী। হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অংশে গঙ্গোত্রী-হিমবাহ হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে। প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে পরে দক্ষিণ-পূর্বে ২০০ মাইল পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া হরিদ্বারের সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। উহার কিছু উত্তরে **অলকানন্দা** উপনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা অতঃপর উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্য অতিক্রম করিয়া রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট ইহা **ভাগীরথী** ও **পদ্মা** নামে দুই শাখায় ভাগ হইয়াছে। উহারা যথাক্রমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পদ্মা নদী রাজসাহীর (রামপুর-বোয়ালিয়া) দক্ষিণ-পূর্ব অবধি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানির্দেশ করিতেছে; অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর নিম্ন অংশ **হুগলী নদী** নামে পরিচিত। ভাগীরথী ও পদ্মার ব-দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ অরণ্যময় জলাভূমি। উহার নাম **সুন্দরবন**। সুন্দরবনের অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরের প্রধান উপনদী—**যমুনা** ও **শোণ**; বাম তীরে—**রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা** (সরযূ), **গণ্ডকী, কুশী**। যমুনা ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান। ইহা যমুনোত্রী-হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। যমুনার প্রধান উপনদী বিন্ধ্যনির্গত **চম্বল** ও **বেতোয়া**। গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগর—**হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর**। ভাগীরথী-তীরবর্তী প্রধান নগর **মুর্শিদাবাদ,**

নবদ্বীপ। হুগলী নদী-তীরবর্তী নগর—**চন্দননগর** ও **কলিকাতা**। যমুনাকূলে প্রধান নগর—**দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন**।

ব্রহ্মপুত্র (১,৭০০ মাইল)—তিব্বতের মানস সরোবর অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর প্রায় ৯০০ মাইল হিমালয়ের সমান্তরভাবে উহার পূর্ব প্রান্ত অবধি গিয়াছে। এই অংশে নদীটি **সাঁপো** (Tsanpo) নামে পরিচিত। অতঃপর একটু উত্তরে বাঁকিয়া আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সদিয়া নামক স্থানে ভারত-সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই অংশের নাম **ডিহিং**। আসাম ছাড়াইয়া ব্রহ্মপুত্র অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানে গিয়াছে।

উপনদীর মধ্যে দক্ষিণ তটের **সুবর্ণশ্রী, করতোয়া, তোর্সা, তিস্তা** ও **মানস** এবং বামতটের **ডিবং, লোহিত** ও **ধনশ্রীর** নাম করা যায়। এই নদের অধিকাংশই তিব্বত মালভূমি ও আসামের জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী প্রধান নগর।

দক্ষিণ ভারত—পশ্চিমবাহিনী প্রধান দুইটি নদী **নর্মদা** (রেবা) ও **তাপ্তী** (তপতী)। নর্মদার উৎপত্তি বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বাংশ অমরকণ্টক পাহাড়ে; তাপ্তীর উৎপত্তি মহাদেব পাহাড়ে। উভয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে। জব্বলপুরের নিকটে **নর্মদার জলপ্রপাত** সুপ্রসিদ্ধ; **জব্বলপুর, ব্রোচ** প্রভৃতি ইহার তীরবর্তী প্রধান নগর। তাপ্তীর তীরে **ভুসোয়াল, সুরাট** প্রভৃতি নগর অবস্থিত। তাপ্তীর প্রধান উপনদী **পূর্ণা**।

দাক্ষিণাত্যে অপর প্রধান নদীগুলি পূর্বমুখী হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রধান।

মহানদী—সাতপুরা পর্বত হইতে বাহির হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। প্রধান উপনদী—**ব্রাহ্মণী** ও **বৈতরণী**। **সম্বলপুর, কটক** প্রভৃতি শহর ইহার তীরে অবস্থিত।

গোদাবরী দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘতম নদী। পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে বাহির হইয়া বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজ রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

নাসিক, রাজমাহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান ইহার তীরে অবস্থিত। **প্রাণহিত্যা** (পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গার মিলনে উদ্ভূত), **ইন্দ্রবতী, মঞ্জিরা** প্রভৃতি প্রধান উপনদী।

কৃষ্ণা—পশ্চিমঘাট পর্বতে মহাবালেশ্বরের নিকট উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উপনদীর মধ্যে **ভীমা** ও **তুঙ্গভদ্রা** (তুঙ্গ ও ভদ্রার মিলিত প্রবাহ) প্রধান। **সাতারা** ও **বেজোয়াদা** শহর কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত।

কাবেরী—কুর্গরাজ্যে উৎপন্ন হইয়া মহীশূর ও মাদ্রাজের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। এই নদীর গতিপথে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার মধ্যে **শ্রীরঙ্গপত্তম্, শিবসমুদ্রম্** ও **শ্রীরঙ্গম্** প্রধান। **শিবসমুদ্রমের জলপ্রপাত** বিখ্যাত। **হিমাবতী, ভবানী** প্রভৃতি উপনদী। **ত্রিচিনোপল্লী, কুম্ভকোণম্** শহর ইহার তীরে অবস্থিত।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীর তুলনা—উত্তর ভারতের সমভূমিতে যে সকল নদী আছে, অধিকাংশের জল হিমালয়ের তুষারভূমি হইতে আসে। সেজন্য ঐ সব নদীতে বারো মাস জল থাকে। দক্ষিণ ভারতের নদী বর্ষার জল বহন করে, তাই গ্রীষ্মকালে অনেক নদী স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়।

আর্যাবর্তের নদীর অধিকাংশই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। সেজন্য ইহাদের উপর দিয়া বাণিজ্য ও জলযানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। দক্ষিণ ভারতের অনেকটা মালভূমির উপরে; অল্প অংশ সমুদ্রকূলবর্তী সমভূমির উপরে প্রবহমান। তাই এই সব নদীর উপর দিয়া যাতায়াত করিবার অসুবিধা।

উত্তর ভারতের নদী অপেক্ষাকৃত নবীন; ইহাদের অনেকগুলি মাঝে মাঝে গতি-পরিবর্তন করে। ইহারা দৈর্ঘ্যে বড়; তীরে বড় বড় নগর আছে। দক্ষিণ ভারতের নদী প্রাচীন; কঠিন মালভূমির উপর উহাদের খাত সুনির্দিষ্ট। ইহারা দৈর্ঘ্যে ছোট, তীরে বড় নগর বেশী নাই।

উত্তর ভারতের নদীর দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের কাজ হয়। দক্ষিণ ভারতের নদীদ্বারা তাহা সম্ভব হয় না, কিন্তু খরস্রোত বলিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।

হ্রদ—কাশ্মীরের **উলার ও ডাল,** রাজস্থানের **সম্বর ও পুষ্কর,** মহীশূরের **বনবিলাস** প্রভৃতি হ্রদ প্রসিদ্ধ। বর্ষাকালে সম্বরের আয়তন ১০০ বর্গমাইল পর্যন্ত হয়। অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়; তটভূমিতে লবণ পড়িয়া থাকে। **কোলার** কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত; ইহার আয়তনও প্রায় ১০০ বর্গমাইল। **চিল্কা, পুলিকট** প্রভৃতি উপহ্রদ (lagoon) পূর্ব উপকূলে অবস্থিত।

জলপ্রপাত—জব্বলপুরের নিকটে **নর্মদার জলপ্রপাত,** কাবেরীর **শিবসমুদ্রম্ প্রপাত,** পশ্চিমঘাট পর্বতে শিরাবতীর **গারসোপা প্রপাত,** রাঁচির নিকটে স্বর্ণরেখার **হুড্রু প্রপাত** সমধিক উল্লেখযোগ্য।

উষ্ণ প্রস্রবণ—পাঞ্জাব রাজ্যের **জ্বালামুখী, মণিকর্ণ**; বোম্বাই রাজ্যের **লাসুন্দ্রা, বজ্রবাঈ** প্রভৃতি উষ্ণ প্রস্রবণ প্রসিদ্ধ। হিমালয়ে **বদ্রিনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী** প্রভৃতি স্থানে, কাশ্মীরের **লাডাক** অঞ্চলে, বিহারের **রাজগীর, সীতাকুণ্ড** প্রভৃতি স্থানে, পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় **বক্রেশ্বরে** উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

জলবায়ু

ভারতের কোথাও পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও বা নীচু সমভূমি। কোন স্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী, কোন স্থান সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। কোন অংশ উষ্ণ মণ্ডলে, কোন অংশ কর্কটক্রান্তির উত্তরে। এইজন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়।

বৃষ্টিপাতের জন্য গ্রীষ্মের তীব্রতা কম হইয়া যায়। এজন্য ভারতে যে সব অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয়, সেখানে গ্রীষ্মের প্রখরতা কম। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও মালাবার উপকূলে বেশী বৃষ্টি হয় বলিয়া সেখানে গ্রীষ্ম প্রখর নয়।

যে স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চ, সেখানে শীত তত প্রখর। দার্জিলিং, শিলং, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে। সেজন্য ঐ সব জায়গায় শীত বেশী।

যে স্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী সেখানে শীত-গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই। মাদ্রাজ, পুরী প্রভৃতি স্থান গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত, অতএব সেখানে গ্রীষ্মাধিক্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমুদ্রের নিকটবর্তী বলিয়া শীত, গ্রীষ্ম—দুই-ই ঐসব স্থানে কম।

পর্বতমালার অবস্থানের ফলেও জলবায়ু প্রখর হইতে পারে না। হিমালয় ভারতের উত্তরে। ঐ পর্বতমালা উত্তর বায়ুর গতি আটকাইয়া রাখে। হিমালয় না থাকিলে ভারতে শীতকালে ভীষণ শীত পড়িত।

স্বাভাবিক জলবায়ুর বিভাগ অনুসারে দক্ষিণ ভারত উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তর ভারত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু হিমালয়ের অবস্থানের জন্য ভারতে শীতের প্রখরতা কম। তাই সমগ্র ভারতকেই উষ্ণ মণ্ডলের মধ্যে ধরা হয়। বৎসরের গড়-হিসাব ধরিলে উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণাপথে উষ্ণতা বেশী। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের তিন দিকে সমুদ্র এবং ঐ অঞ্চল প্রধানত মালভূমি। সেইজন্য উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হইলেও সেখানে তেমন গ্রীষ্মাধিক্য ঘটিতে পারে না। দাক্ষিণাত্যে শীতকালের উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালের উষ্ণতার পার্থক্য অতি সামান্য। কিন্তু উত্তর ভারতে শীত ও গ্রীষ্ম—উভয়েরই প্রকোপ বেশী।

বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন প্রকার হইলেও ভারত মোটের উপর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং উহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র।

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত—গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে উত্তর ভারতের স্থলভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। তাহার ফলে ঐ অঞ্চলের বায়ু খুব বেশী গরম ও হালকা হইয়া পড়ে। হালকা বায়ু ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। উহার স্থান পূরণ করিবার জন্য সেই সময় ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত আরব সাগর ও বঙ্গোপ-সাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ উচ্চপ্রেষ বাতাস প্রবলবেগে স্থলের দিকে আসিতে থাকে। কিন্তু ফেরেলসূত্র অনুযায়ী ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক দক্ষিণ হইতে সোজা উত্তরে আসিতে পারে না; ডান দিকে বাঁকিয়া যায়। এই বায়ুপ্রবাহের নাম **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু**।

আরব সাগরের বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্বে দাক্ষিণাত্য মালভূমির দিকে ধাবিত হইতে থাকে। প্রথমেই পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়; তাহার ফলে

মালবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। পরে এই বায়ুপ্রবাহ পর্বত পার হইয়া পশ্চিমে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে পৌঁছে। তখন ইহার জলীয় অংশ শেষ হইয়া আসে। তাহা ছাড়া পশ্চিমঘাটের পর তেমন কোন উচ্চ পর্বত না

৮৮নং চিত্র—জলবায়ু (বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত)

থাকায় বায়ুপ্রবাহ আর বাধা পায় না। এই কারণে দাক্ষিণাত্যে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম। কচ্ছ উপসাগরের উত্তরে এই বায়ুপ্রবাহের কোন প্রভাব নাই।

বঙ্গোপসাগরের বায়ুপ্রবাহের এক শাখা ব্রহ্মদেশের আরাকান পর্বতে প্রতিহত হইয়া সেই অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ করে। ইহার অপর শাখা হিমালয় ও আসামের পর্বতমালায় বাধা পায়। তখন দিক পরিবর্তন করিয়া উহা উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। ইহার ফলে বাংলা ও আসামে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বায়ুর অভিমুখে অবস্থিত খাসিয়া পাহাড়ে **চেরাপুঞ্জী** নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টি (৫০০ ইঞ্চি) হয়।

এই মৌসুমীবায়ু জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। জুন, জুলাই ও আগস্ট এই তিন মাসে ভারতে যত বৃষ্টি হয়, বাকি নয় মাসেও তত হয় না। মালাবার অঞ্চলে ১৫ই জুন, বাংলা ও উড়িষ্যায় ১লা জুলাই এবং উত্তর প্রদেশে ১৫ই জুলাই সহসা মৌসুমীবৃষ্টি আরম্ভ হয়।

ভারতের দক্ষিণে যে দুস্তর জলভাগ রহিয়াছে, শীতকালে তাহার উষ্ণতা সহজে হ্রাস হয় না। ইহার ফলে জলভাগ স্থলভাগের অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং স্থলের বায়ুপ্রবাহ উত্তরদিক হইতে ভারত মহাসাগরের দিকে বহিতে থাকে। এশিয়ার মধ্যভাগে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমে দারুণ শীতের জন্য উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। সেখান হইতে শীতল ও শুষ্ক বায়ু দক্ষিণাবর্তে উত্তর-পূর্ব হইতে ভারতের দিকে বহিতে থাকে। এই বায়ুপ্রবাহের নাম **উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু**।

স্থলভাগের উপর দিয়া আসে বলিয়া এই বায়ুতে জলকণা থাকে না। এই বায়ুপ্রবাহ শীতকালে ভারতের উপর দিয়া বহিতে থাকে; সেই কারণে শীতকালে করোমণ্ডল উপকূল ছাড়া, ভারতের অন্যত্র কদাচিৎ বৃষ্টি হইয়া যায়। করোমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণতম অংশে এই সময় খুব সামান্য বৃষ্টি হয়, মাদ্রাজের নভেম্বর-ডিসেম্বরের বৃষ্টির সঙ্গে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীর কোন সম্পর্ক নাই। উহা ঘূর্ণবাত বৃষ্টি (cyclonic rainfall)। শরৎকালের শেষে যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ দুই বায়ুপ্রবাহের সংঘাতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঘূর্ণবায়ুর সৃষ্টি হয়। উহা মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলে **শীতকালে বৃষ্টিপাত** ঘটায়।

বৃষ্টিপাতের ক্রম অনুসারে ভারতের নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগ হইতে পারে :—

(ক) **অতিবর্ষণ অঞ্চল** (৮০ ইঞ্চির বেশী)—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর বিহার, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল, মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলের সামান্য অংশ।

(খ) **অনতিবর্ষণ অঞ্চল** (৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চি)—উড়িষ্যা, দক্ষিণ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর সরকার, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

(গ) **স্বল্পবর্ষণ অঞ্চল** (২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি)—মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব।

(ঘ) **মরুপ্রায় অঞ্চল** (২০ ইঞ্চির কম)—রাজস্থানের মরু (বায়ু প্রতিহত করিবার মত পর্বতের অভাবে) এবং কাশ্মীরের উত্তরভাগ ইহার অন্তর্গত।

(ঙ) **বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল**—পশ্চিমঘাট পর্বতের অবস্থানের জন্য দাক্ষিণাত্য মালভূমির মধ্যভাগ (সমগ্র হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূরের উত্তরাংশ) বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। খাসিয়া-গারো পাহাড়ের অন্তরালে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাও বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত।

ঝড়বৃষ্টি—গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু এবং শীতের প্রারম্ভে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু বহিতে আরম্ভ করে। এই দুই বিপরীত বায়ুর সংঘর্ষে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণবাত ও ঝড়বৃষ্টি হয়। তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে ও মাদ্রাজে ঝড়বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভের ঝড়কে **কালবৈশাখী** এবং শরতের প্রারম্ভের ঝড়কে **আশ্বিনের ঝড়** বলে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে আগত ঘূর্ণবাত শীতকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে সামান্য বারিপাত ঘটায়। গমচাষের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী।

উদ্ভিজ্জ-সংস্থান

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী ভারতে নিম্নোক্ত রূপ উদ্ভিদ-বিস্তার দেখা যায় :—

(১) **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি**—হিমালয় অঞ্চলে (৫,০০০ ফিট হইতে ৯,০০০ ফিট উঁচুতে) দেবদারু, পাইন প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সরলবর্গীয়

বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আরও উঁচুতে শুধু গুল্ম ও তৃণাদি জন্মে। হিমরেখার নিকট (প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চে) শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মে। হিমরেখার ঊর্ধ্বে চিরতুষার—কোন উদ্ভিদই সেখানে জন্মিতে পারে না।

(২) **চিরহরিৎ বনভূমি**—যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮০ ইঞ্চির বেশী, (বিশেষত পার্বত্য অঞ্চলে) সেখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বন দেখা যায়। হিমালয়ের নিম্নাংশে এবং আসাম ও পশ্চিম উপকূলের পার্বত্য অংশে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় বন আছে।

(৩) **মৌসুমী বনভূমি**—যে সকল স্থানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চি, সেখানেও বন জন্মে। কিন্তু উহা নিবিড় নয়। নিম্ন হিমালয়, আসাম এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমের কিয়দংশে এই বনভূমি দেখা যায়। শাল, সেগুন, আবলুস, চন্দন প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এই বনের প্রধান উদ্ভিদ্।

(৪) **গুল্মভূমি**—দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে অল্পবৃষ্টি অঞ্চলে, ঐ মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে এবং রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির কম। এই সকল স্থানে ছোট কাঁটাগাছের বন দেখা যায়।

(৫) **মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চল**—রাজস্থানের পশ্চিম অংশ মরুপ্রায়। বিশেষ বৃষ্টিপাত হয় না। উদ্ভিদের মধ্যে এখানে সেখানে সামান্য ঝোপঝাড় দেখা যায়। এই অঞ্চলে **থর মরুভূমি** অবস্থিত।

(৬) **তৃণভূমি**—অবস্থিতি অনুসারে ভারত, বিশেষত ইহার উত্তর ভাগ তৃণভূমির দেশ (tropical grassland)। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য সমস্ত তৃণক্ষেত্র কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যেখানে ভূমি কর্ষণযোগ্য নয়, সেখানে মৌসুমী বনের উৎপত্তি হইয়াছে। মধ্যভারতের মালভূমিতে ও দাক্ষিণাত্যের স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু তৃণভূমি অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে।

(৭) **প্লাবন বনভূমি** (tidal forest)—বঙ্গোপসাগরের উপকূলের জলাভূমিতে লবণাক্ত মৃত্তিকায় ম্যানগ্রোভ জাতীয় সুন্দরী গাছের বন আছে। ইহাই **সুন্দরবন**। এই উপকূলভাগে পামজাতীয় নারিকেল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষও জন্মে।

অরণ্যসম্পদ—যে সব জায়গা উষ্ণ এবং বৃষ্টিপাতের ফলে আর্দ্র সেখানে ঘন বন পরিব্যাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে, আসাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায়, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং পশ্চিমঘাটের অংশবিশেষে জঙ্গল আছে। ভারতের আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ অরণ্যভূমি। সেগুন, শাল, আবলুস, চন্দন, দেবদারু, সাটিন, মহুয়া, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ প্রভৃতি প্রধান বৃক্ষ। ঘরবাড়ি, আসবাব ও জাহাজ তৈয়ারীর কাঠ, দিয়াশলাই প্রভৃতির কাঠ,—সকল রকম কাঠই ভারতের বনে পাওয়া যায়। লাক্ষা, ধুনা, তার্পিন, রজন, রেশম, মোম প্রভৃতিও বনভূমিতে প্রচুর পরিমাণে মিলে।

মধ্যভারত, মাদ্রাজ ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে প্রচুর **সেগুন** গাছ জন্মে। এই কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট। হিমালয়ের পূর্বভাগে, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্যভারত ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে **শাল** গাছের জঙ্গল আছে; **চন্দন, আবলুস, সাটিন** প্রভৃতি গাছ মহীশূর ও পশ্চিমঘাট অঞ্চলে জন্মে। চন্দনগাছ হইতে সুগন্ধি তৈল পাওয়া যায়। **দেবদারু**- ও **পাইন**-জাতীয় গাছ হিমালয়ের উচ্চ অংশে জন্মে; ইহা হইতে তার্পিন তৈল, ধুনা, রজন, দিয়াশলাই-এর কাঠি ইত্যাদি পাওয়া যায়। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলে **শিমুল, শিশু, ছাতিম, পিটুলি, গর্জন, গেঁয়ো, বাইন, কেওয়া** ইত্যাদি গাছ জন্মে। উড়িষ্যা, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার অঞ্চলে **বাঁশ** জন্মে। বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারী হয়। ছোটনাগপুরে **মহুয়া**, দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে **সিঙ্কোনা** জন্মে। সিঙ্কোনার গাছ হইতে কুইনাইন প্রস্তত হয়। মালাবার উপকূলে প্রচুর **নারিকেল** গাছ আছে। ইহা ভিন্ন **তাল, সুপারি, খেজুর, আম, জাম, কাঁঠাল** প্রভৃতি অনেক গাছ ভারতের নানা স্থানে জন্মে। তাল ও খেজুর রস হইতে গুড় তৈয়ারী হয়।

বনভূমি মাটিকে দৃঢ় ও আর্দ্র রাখে, মাটির ক্ষয় নিবারণ করে। বৃষ্টির সঞ্চার ও বন্যাস্রোতের প্রতিরোধের জন্যও বনভূমির প্রয়োজন। নূতন বনভূমি-সৃষ্টির জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে এইজন্য দেশে সর্বত্র **বন-মহোৎসব** পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা হয়।

ভারতের কৃষিজসম্পদ

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকর্মের বিশেষ উপযোগী।

ধান—ভারতে খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। যেখানে গড়-উষ্ণতা ৭৫° এবং বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে ৮০ ইঞ্চি (অথবা উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা আছে) সেখানে ধান ভাল হয়। পাললিক সমভূমি—যেখানে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়—তাহাই ধান চাষের উপযুক্ত। ভারতের সর্বত্র অল্পাধিক ধান জন্মে : পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই উপকূলে প্রচুর ধান হয়। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরেও কিছু কিছু ধান জন্মে।

গম—ভারতের অপর প্রধান খাদ্যশস্য। যেখানে বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি এবং গড়-উত্তাপ ৬০° ডিগ্রির কাছাকাছি, সেখানে ভাল গম জন্মে। চাষের প্রথমে ও শীষ বাহির হইবার কিছু আগে সামান্য বৃষ্টি, এবং তাহার পরেই প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন। সেজন্য গমের চাষ এদেশে শীতকালে হইয়া থাকে। পাঞ্জাব, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও বোম্বাই অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয়।

যব—বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর যব জন্মে। গমের ন্যায় ইহার চাষও শীতকালে হইয়া থাকে।

বাজরা, জোয়ার, রাগি (millet)—দেশের এক-পঞ্চমাংশ লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও মাদ্রাজে ইহা উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিপাত ১৫-২০ ইঞ্চি হইলেই ইহা জন্মিতে পারে।

ভুট্টা—মাঝামাঝি বৃষ্টিপাতযুক্ত সমভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ইহা সর্বাধিক উৎপন্ন হয়।

ডাল কলাই—ভারতের সর্বত্র অল্পবিস্তর ডাল-কলাইয়ের চাষ হইয়া থাকে। শুষ্ক স্থানে ইহা ভাল জন্মে। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রচুর **ছোলা**

ভারত
কৃষি সম্পদ
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
পশ্চিম পাকিস্তান
দিল্লী
জয়পুর
এলাহাবাদ
পাটনা
শিলং
কলিকাতা
আহমদাবাদ
নাগপুর
কটক
বোম্বাই
গোয়া
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
ত্রিবান্দ্রম
সিংহল
গম
ধান
ইক্ষু
চা
জোয়ার, বাজরা
কফি
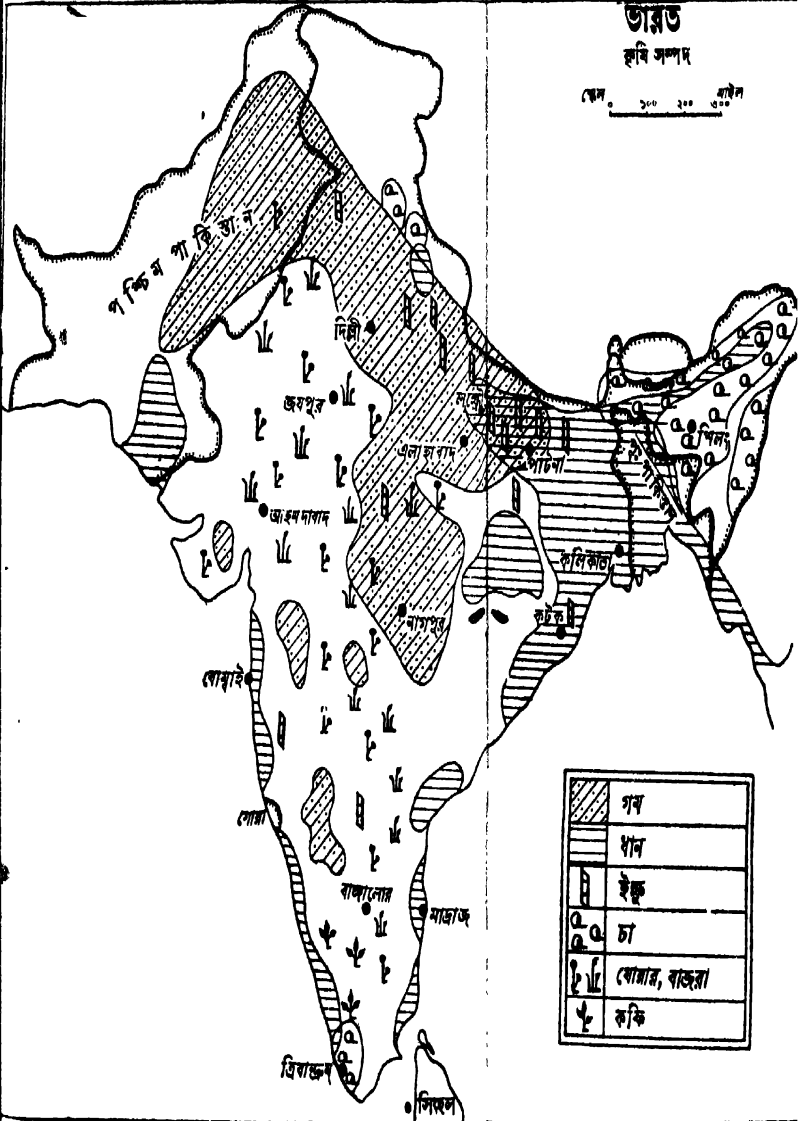
হয়। গরু-ঘোড়ার খাদ্যরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। **মসূর** মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশে জন্মে। **অড়হরের** চাষ বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে হইয়া থাকে।

ইক্ষু—আর্দ্র ও উষ্ণ জমিতে—বিশেষত পাললিক সমভূমি, যেখানে জল দাঁড়ায় না—সেখানে ভাল ইক্ষু জন্মে। দেশের প্রায় অর্ধেক ইক্ষু উত্তরপ্রদেশে জন্মে। বিহার, মাদ্রাজ এবং পশ্চিমবঙ্গেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ভারতে উৎপন্ন গুড়-চিনির পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। তবু চাহিদা মিটে না—বাহির হইতে চিনি আমদানির প্রয়োজন হয়।

চা—যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (৭০-৯০ ইঞ্চি) অথচ জল জমিয়া থাকে না—পর্বতের এইরূপ ঢালু অংশে চা জন্মে। আসাম রাজ্যে (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা) সর্বাধিক (ভারতের উৎপাদনের $\frac{২}{৩}$ ভাগ) চা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়, উত্তরপ্রদেশের দেরাদুনে, পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি ও কার্ডামাম পর্বতে প্রচুর চা জন্মে। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় এবং রাঁচির নিকটবর্তী অঞ্চলে সামান্য চায়ের চাষ হয়। সমুদ্র-সমতল হইতে ৪।৫ হাজার ফিট উপরে যে চা জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট। এইজন্য দার্জিলিঙে উৎপন্ন চা সর্বোত্তম। চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়স্থানীয়।

কফি—সু-উচ্চ ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতে কফি উৎপন্ন হয়। মহীশূর, কুর্গ, ত্রিবাঙ্কুর, নীলগিরি এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব অংশে কফির চাষ হয়। রৌদ্রের উত্তাপ হইতে চারা বাঁচাইবার জন্য সাধারণত অন্য গাছের আওতায় কফিচাষ হয়।

তুলা—যেখানে মাটি ভিজা থাকে এবং বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির কাছাকাছি, সেখানে কার্পাসের চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ-মৃত্তিকা কার্পাস উৎপাদনের বিশেষ অনুকূল। বোম্বাই ও বেরারে সবচেয়ে বেশী তুলা জন্মে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং আসামেও তুলা উৎপন্ন হয়। দেশী তুলার আঁশ লম্বা নয়, ইহাতে মিহি কাপড় তৈয়ারী হয় না। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে

আমেরিকা হইতে বীজ আনাইয়া জলসেচের সাহায্যে লম্বা আঁশের কার্পাস-চাষ হইতেছে।

পাট—পাটচাষের জন্য পলিমাটি, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং উত্তপ্ত ও আর্দ্র
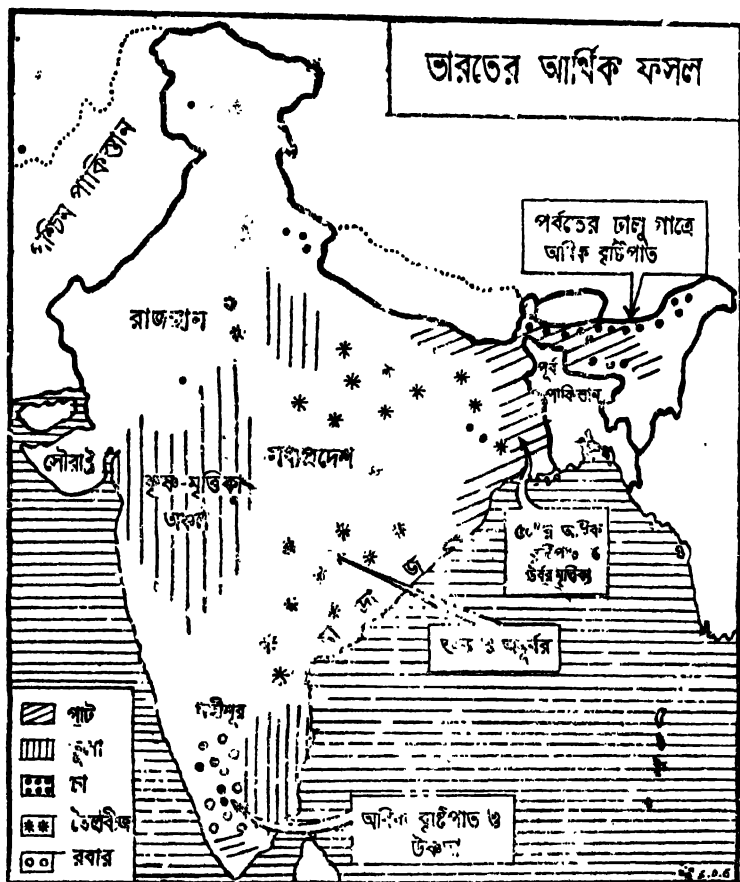
৮৯নং চিত্র—ভারতের আর্থিক ফসল

জলবায়ুর প্রয়োজন। ভারতে অনেক পাটকল আছে, কিন্তু তদনুপাতে পাট উৎপন্ন হয় না। সেজন্য পাটের চাষ বাড়াইবার বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার অঞ্চলে এবং আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে প্রচুর পাট

জন্মে। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলে, উড়িষ্যার নানা স্থানে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু কিছু পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং আন্দামানেও পাটচাষ আরম্ভ হইয়াছে।

শণ—ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর শণ জন্মে।

তৈলবীজ—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে সরিষা; মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে তিল; মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও মধ্যপ্রদেশে রেড়ি ও মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে চিনাবাদাম উৎপন্ন হয়। মালাবার ও বঙ্গোপসাগর উপকূলে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়। তৈলবীজ উৎপাদনে ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ।

আলু—প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে জন্মে।

পান—পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে পানের চাষ হয়।

তামাক—তামাকচাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যে প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। মাদ্রাজ রাজ্যে সবচেয়ে বেশী তামাক জন্মে।

আফিং—পপিগাছ হইতে আফিং পাওয়া যায়। সরকারী ব্যবস্থায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত ও রাজস্থানে পপিগাছের চাষ হয়।

সিঙ্কোনা—সিঙ্কোনাগাছের ছাল হইতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ কুইনাইন তৈয়ারী হয়। শীতল পার্বত্য অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। আসাম, দার্জিলিং ও নীলগিরিতে সিঙ্কোনার চাষ হইয়া থাকে।

রবার—ইহা একপ্রকার বৃক্ষকাণ্ডের রস হইতে তৈয়ারী হয়। নিরক্ষীয় উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। মহীশূর, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কুর্গ, কোচিন ও মালাবার অঞ্চলে রবার উৎপন্ন হইতেছে।

মশলা—আদা, হলুদ, মৌরি, ধনিয়া, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা ভারতের প্রায় সর্বত্র জন্মে। লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, গোলমরিচ, তেজপাতা প্রভৃতি মাদ্রাজের দক্ষিণ ভাগে ও মালাবার উপকূলে উৎপন্ন হয়।

সেচব্যবস্থা

কৃষির জন্য পরিমাণমত জলের প্রয়োজন। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে ফসলের হানি হয়। জমি উর্বর হইলেও কেবলমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকা সব জায়গায় নিরাপদ নয়। বিশেষত ভারতে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। **আসাম** ও **মালাবার** উপকূল ভিন্ন ভারতের অপর সকল অঞ্চলেই অল্পবিস্তর জলসেচের প্রয়োজন।

কূপ—বোম্বাই ও রাজস্থানে কূপের জল তুলিয়া চাষের ক্ষেত্রে দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা আছে। ইহা শ্রমসাধ্য। অনেক জায়গায় পারসিক চক্র (Persian Wheel) নামক বহুপাত্র-সমন্বিত এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলা হয়। তৈলচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যেও জল তোলার রীতি আছে। ইদানীং নলকূপ বসাইয়া অনেক জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জলাশয়—মাদ্রাজ, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চিত রাখা হয়। সেখান হইতে দরকারমত জল লইয়া শস্যক্ষেত্রে সিঞ্চিত হয়। হায়দ্রাবাদের **নিজাম সাগর** এইরূপ একটি বিশাল জলাশয়। পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানে পুকুর হইতে জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা কোন-এক বৎসর বৃষ্টিপাত কম হইলে পুকুর শুকাইয়া যায়; তখন আর জলসেচ সম্ভব হয় না। জলসেচের জন্য ছোট ছোট নদীর মুখে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম জলাশয় তৈয়ারী করিবারও রীতি আছে।

খাল—খালের সাহায্যে জলসেচন সর্বাংশে সুবিধাজনক। নদী পর্বতগাত্র হইতে যেখানে সমভূমিতে নামিয়া আসে, বাঁধ দিয়া জলতল উচ্চ করিয়া সেখান হইতে খাল কাটিলে বারো মাস তাহাতে জল থাকে। এই প্রকার খাল **স্থায়ী খাল** (perennial canal) নামে অভিহিত হয়। বর্ষায় নদীর জল বাড়িলে খালের পথে সেই জল ক্ষেতে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাকে **প্লাবন খাল** (inundation canal) বলে।

শীতকালে নদীজল কমিয়া গেলে প্লাবন খালে জল থাকে না—সেই সময় সেচকার্য বন্ধ হইয়া যায়। প্লাবন খালে ইহাই অসুবিধা। আজকাল

নদীখালের সংযোগস্থলে নদীমুখে বাঁধ দিয়া জল আটকানো হয়। এইরূপে প্লাবন খাল স্থায়ী খালে পরিবর্তিত করা হয়। মূল খালের অনেক শাখা-প্রশাখা কৃষি অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকে; খালের জল দরকারমত ছাড়িয়া দেওয়া ও বন্ধ করা যায়।

উত্তরপ্রদেশে **সার্দা** খাল, **অপার গ্যাঞ্জেস** ও **লোয়ার গ্যাঞ্জেস** খাল, **যমুনা** খাল; বিহারে **শোণ** খাল এবং উড়িষ্যার **মহানদী** খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর **বাকিংহাম** খাল এবং কাবেরী নদীর **মেটুর** খাল সুপ্রসিদ্ধ। ত্রিবাঙ্কুরের **পেরিয়ার** নদীর গতি বদলাইয়া মাদুরার নিকট প্রায় ৩০০ বর্গমাইল জমিতে জলসেচন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের জলসেচের জন্য **মেদিনীপুর** খাল (৪৩৫ মাইল), **হিজলী** খাল (১৪০ মাইল), **ইডেন** খাল (৪৫ মাইল), **বক্রেশ্বর** খাল (২০ মাইল) ও **দামোদর** খাল (১৪০ মাইল) আছে।

খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা পাঞ্জাবেই সর্বোত্তম। উহার অধিকাংশই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় অংশে তিনটি খাল উল্লেখযোগ্য—

(১) **পশ্চিম যমুনা** খাল—এই খালপথে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, রোটাক, হিসারপ্রভৃতি অঞ্চল যমুনার জলে সিঞ্চিত হইতেছে। ইহার ১,৫০০ শাখা; জলসিক্ত জমির পরিমাণ ৯০ হাজার একর।

(২) **শিরহিন্দ** খাল—এই খাল দিয়া শতদ্রুর জলে ফিরোজপুর, হিসার, নাভা ও লুধিয়ানা অঞ্চল সিঞ্চিত হইতেছে।

(৩) **উচ্চ বড়িদোয়াব** (Upper Baridoab) খাল—ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল (দুইটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে **দোয়াব** বলে) এই খাল পথে ইরাবতীর জলে সিঞ্চিত হইতেছে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন

বিদ্যুৎ বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার প্রাণ। ভারতে যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইতেছে। বিদ্যুৎ দুই ভাবে উৎপাদন করা হয়। কয়লাশক্তি (power) হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়

তাহাকে আমরা তাপতড়িৎ (thermal electricity) বলি। কলিকাতায় তোমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার কর তাহা তাপবিদ্যুৎ। তাছাড়া অনেক স্থানে জলপ্রবাহের শক্তি হইতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। তাহাকে জলবিদ্যুৎ (hydro-electricity) বলে। জলবিদ্যুৎ অল্পব্যয়েই উৎপাদন করা যায়। তবে ইহার জন্য কতকগুলি অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা চাই।

অনুকূল পরিবেশের মধ্যে **অধিক বৃষ্টিপাত, বন্ধুর প্রকৃতি** এবং **বিরামহীন জলপ্রবাহ**—এই তিনটিই প্রধান। শুধু এই তিনটি পরিবেশ বর্তমান থাকিলেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সব সময় যুক্তিযুক্ত হয় না। আরও একটি অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশও থাকা চাই। জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করার শিল্পাঞ্চল বা লোকালয় নিকটে না থাকিলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা লাভজনক হয় না। ভূপ্রকৃতি বন্ধুর হইলে নদীতে জলপ্রপাত থাকে। এই জলপ্রপাতের জল যখন সবেগে নীচে নামিতে থাকে তখন ইহার শক্তি বেশী হয়। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও বেশী হয়। জলের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত দরকার। বৃষ্টি সকল সময় হয় না এবং হইলেও সব সময় সমান বৃষ্টিপাত হয় না। এইজন্য শুধু বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার অনেক অসুবিধা আছে। তাই জলপ্রপাতের উৎসের নিকটে কৃত্রিম জলাশয় সৃষ্টি করিয়া তথা হইতে নলের সাহায্যে নীচে জল লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য জলধারার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যেখানে ভূপ্রকৃতি বন্ধুর নয় সেখানে নদীতে বাঁধ দিয়া জল আটকানো হয়। বাঁধের যে পার্শ্বে জলাশয় সৃষ্টি হয় তাহা অনেকটা উঁচুতে থাকে, অপর পার্শ্ব অনেক নিম্নে থাকে। তখন নলের সাহায্যে উঁচু স্থান হইতে নিম্নে জল চালান করা হয়। ভারতের বহুস্থানে এইভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।

ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করিবার প্রবল চেষ্টা হইতেছে। কল চালাইবার মত খনিজ তৈলের প্রাচুর্য এদেশে নাই। কয়লার ভাণ্ডারও ক্রমশ ফুরাইয়া আসিতেছে। কিন্তু পার্বত্য নদী ও জলপ্রপাত হইতে স্বল্পব্যয়ে উৎপন্ন যথেষ্ট বিদ্যুৎশক্তির অতি সামান্য অংশ (পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ) এতদিন আমরা কাজে লাগাইয়াছি। পশ্চিমঘাট হইতে **লোনাভলা, নীলামুলা** ও **অন্ধ্র উপত্যকায়**

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের তিনটি যন্ত্র আছে। ইহারা বোম্বাই, কল্যাণ ও পুণা শহরের সম্পূর্ণ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করে। মহীশূরে **শিবসমুদ্রম্, সম্‌সা** ও **যোগ্‌প্রপাত**; মাদ্রাজে **মেট্টুর, পাইকারা, পাপনাশম**; ত্রিবাঙ্কুরে **পল্লীভাসাল**; উত্তর প্রদেশে **বাহাদুরাবাদ, নিরগজনী**; পাঞ্জাবে **যোগীন্দ্র নগর**; কাশ্মীরে **বরমূলা**; আসামে **শিলং** ইত্যাদি স্থানে কিছু কিছু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

জলশক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য ভারতে অনেকগুলি নূতন পরিকল্পনা হইয়াছে। জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া বন্যানিয়ন্ত্রণ, নৌবাহন-ব্যবস্থা, ভূমির ক্ষয়রোধ, মৎস্যের চাষ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি—এ সমস্তও অনেকগুলির গৌণ উদ্দেশ্য। নদী-নিয়ন্ত্রণদ্বারা বহুবিধ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত যে সকল পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি পরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া হইল ঃ—

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project)—দামোদর এবং উহার উপনদী কোনার, বোকারো ও বরাকরে মোট দশটি বাঁধ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে—

(ক) ২,২৭,২০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি হইবে।

(খ) বৃষ্টির জল আটকাইয়া নিম্ন অঞ্চলে বন্যা বন্ধ হইবে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গের দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে।

(ঘ) শহর অঞ্চলের সরবরাহের উপযোগী জল যাহাতে বারো মাস নদীতে থাকে, সেই ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) নিম্ন অংশে নদী যাহাতে নাব্য থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে।

(চ) যে সকল হ্রদের সৃষ্টি হইবে তাহাতে এবং বিভিন্ন নদীখালে মাছের চাষ সম্ভব হইবে।

(ছ) মৎস্যশিকার, সন্তরণ, নৌ-বিহার প্রভৃতিও চলিবে। পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হইতে ১০ বৎসর লাগিবে ; খরচ ৫৫ কোটি টাকা।

দামোদরের উপনদীগুলিতে বাঁধ দিয়া দুই পর্বতের মধ্যে একটি বৃহৎ হ্রদ তৈয়ারী হইয়াছে। ঐগুলিতে বর্ষার বাড়তি জল—যাহা এখনও বন্যার সৃষ্টি

৯০নং চিত্র—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা

করে—সারা বৎসর সঞ্চিত থাকিবে। বর্ধমান শহরের নিকট দুর্গাপুরে আর-একটি ভিন্ন প্রকার বাঁধ দেওয়া হইবে। সেখানে নদীর জলতলকে কয়েক ফুট উচ্চ করিয়া খালপথে জল বহাইয়া দেওয়া হইবে। প্রথমোক্ত বাঁধগুলি হইতে জল ছাড়িয়া দিলে যে কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইবে, উহা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যাইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mor Project)—ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিহার রাজ্যের মেসাঞ্জোরে একটি এবং পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায় আর-একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ৩,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে এবং বীরভূমের ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে। এখন বীরভূম জেলায় যে ধান জন্মে, পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে তাহা অপেক্ষা ৫ কোটি মণ বেশী ধান উৎপন্ন হইবে।

কুশী পরিকল্পনা (Koshi Project)—নেপাল ও নেপাল-বিহার সীমান্তে কুশী নদীতে বাঁধ দিয়া ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে। জলাভূমির জল নিষ্কাশন, মৎস্যের চাষ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

মহানদী পরিকল্পনা (Mohanadi Project)—মহানদীতে তিনটি বাঁধ দিয়া ৩½ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও ২৫ লক্ষ একর জমিতে
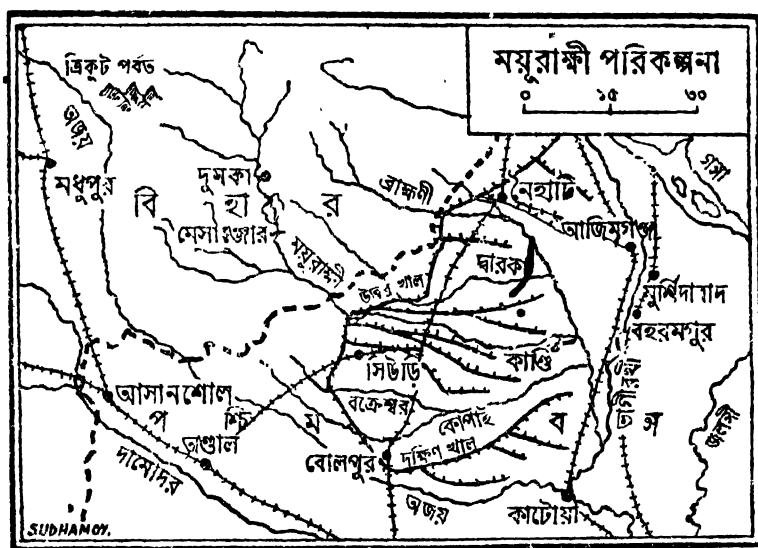
৯১নং চিত্র—ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

জলসেচ, বনরক্ষণ ও বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত চলিবে। সম্বলপুরের নিকট হীরাপুরে বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

ভাখরা ও নঙ্গল পরিকল্পনা—(Vakra and Nangal Project)—শতদ্রু নদীর উপর ভাখরা ও নঙ্গল নামক স্থানে যথাক্রমে ৬৮০ ফুট এবং ১০০ ফুট উচ্চ দুইটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটির কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে

এই পরিকল্পনার ফলে পূর্ব পাঞ্জাব, পেপস্থ ও রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ অত্যন্ত উপকৃত হইবে। এই সব অঞ্চলে ৬৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিলে এখান হইতে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে।

রামপদ সাগর পরিকল্পনা (Rampad Sagar Project)—গোদাবরী নদীতে বাঁধ দিয়া ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৭৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে।

রাজমহলের নিকট **গঙ্গা** নদীতে, শোণের উপনদী **রিহান্দে, নর্মদা** ও **তাপ্তী** নদীতে, **চম্বল** নদীতে, **তুঙ্গভদ্রা** নদীতে এবং আরও বহুস্থানে বাঁধ দিয়া ভারতভূমি সমৃদ্ধ করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে।

খনিজ সম্পদ

ভারতের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, লোহা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোলিয়ম, তামা, সোনা ও লবণ প্রধান।

কয়লা—ভারতে উত্তোলিত কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে। পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ, আসানসোল; বিহারের ঝরিয়া, গিরিডি, ডালটনগঞ্জ, করণপুর ও বোকারোর কয়লাখনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসামের মাকুম, উড়িষ্যার তালচের, মধ্যপ্রদেশের ওয়ারোরা, রেওয়ার উমারিয়া, রাজস্থানের বিকানীর এবং হায়দ্রাবাদে সিঙ্গারেনির নিকটবর্তী কয়লাখনিতে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। কয়লা উত্তোলনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে অষ্টমস্থানীয়।

লোহা—ছোটনাগপুরের সিংভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্জর ও বোনাই অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলায়, মাদ্রাজের সালেম জেলায়, মহীশূরে, গোয়া ও রত্নগিরিতে লোহার খনি আছে। ময়ূরভঞ্জের গরুমহিষণী,

বাদাম পাহাড়, ওকামপথ প্রভৃতি খনি সমধিক প্রসিদ্ধ। সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের খনিগুলির ১৫০ মাইলের মধ্যে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর অবস্থিত থাকায় লৌহ-নিষ্কাশনের সুবিধা আছে। ইহারই জন্য জামসেদপুরের কারখানা পৃথিবীখ্যাত হইয়াছে। লৌহ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সপ্তমস্থানীয়।
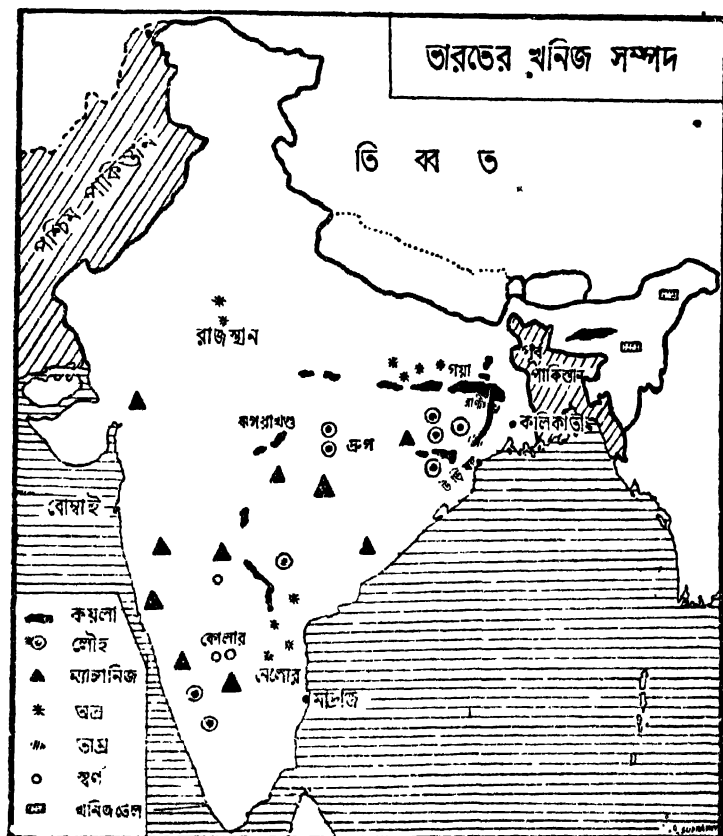
৯২নং চিত্র—ভারতের খনিজ সম্পদ

অভ্র—বিহারের গয়া, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলায়, মাদ্রাজের নেলোর জেলায়, আজমীর মারওয়ারে, ত্রিবাঙ্কুর ও নীলগিরিতে অভ্রের খনি আছে।

অভ্রসম্পদে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথমস্থানীয়। সমগ্র পৃথিবীতে উত্তোলিত অভ্রের অর্ধেকেরও বেশী ভারতে পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ—মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ভাণ্ডা চিন্দওয়ারা, নাগপুর ও জব্বলপুর জেলায়, উড়িষ্যার বোনাই, কেওঞ্ঝর ও গাংপুরে, ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলায়, মাদ্রাজের বেলারি ও ভিজাগাপট্টম জেলায়, বোম্বাইয়ের পাঁচমহলে, মহীশূরে মধ্যভারতে ঝবুয়ায় ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানিজ সম্পর্কে ভারতের স্থান সোভিয়েট রাশিয়ার পরেই। ভারতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের শতকরা ৬০ ভাগ মধ্যভারতে পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ম—আসামের ডিগ্‌বয় নাহারকটিয়া ইত্যাদি স্থানে পেট্রোলিয়মের খনি আছে। ভারত খনিজ তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ নহে।

তামা—সিংভূম জেলায় ঘাটশিলা ও মোসাবানিতে এবং মাদ্রাজের নেলোর জেলায় তামার খনি আছে। সিকিম, ভূটান, নেপাল, দার্জিলিং এবং রাজস্থানে অল্পবিস্তর তামা পাওয়া যায়।

সোনা—পৃথিবীতে যত সোনা পাওয়া যায়, ভারতে উত্তোলনের পরিমাণ উহার শতকরা ২ ভাগ মাত্র। প্রায় সমস্তই মহীশূরের কোলার খনি হইতে উত্তোলিত হয়।

লবণ—হিমাচল-প্রদেশের মণ্ডি নামক স্থানে প্রচুর খনিজ লবণ পাওয়া যায়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র-উপকূলে এবং রাজস্থানের সম্বর হ্রদের লবণাক্ত জল হইতে লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে **কেওলিন** (চিনামাটির জিনিসের জন্য) ও **ফায়ার ক্লের** (fire clay—তাপসহ ইট তৈয়ারির জন্য) খনি আছে। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যপ্রদেশে প্রচুর **বক্সাইট** (এলুমিনিয়াম-নিষ্কাশনের জন্য) পাওয়া যায়। কুমারিকা অন্তরীপের নিকটে কৃষ্ণ বালুকা হইতে **ইল্‌মেনাইট** (সাদা রঙ তৈয়ারীর জন্য) নিষ্কাশিত হইতেছে। ত্রিবাঙ্কুরের সমুদ্রতটে **মোনাজাইট** (গ্যাসের আলোর পলিতা তৈয়ারীর জন্য) ও **থোরিয়াম** পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন ভারতের নানা স্থানে চুনাপাথর, এসবেস্টস্, গ্রাফাইট, সোরা, ক্রোমাইট, অ্যান্টিমনি, জিপসাম প্রভৃতির খনি আছে।

ভারতের শিল্পজ সম্পদ

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এদেশে বিবিধ **কুটিরশিল্প** চলিত আছে। শাল, সূক্ষ্ম কারুকার্যময় কাপড়, হাতীর দাঁতের জিনিস, সোনা-রূপার গহনা, নানাবিধ পাথর ও মাটির জিনিস এক সময়ে পৃথিবীখ্যাত ছিল। কলের প্রতিযোগিতায় ইদানীং অনেক কুটিরশিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবু শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙা (চন্দননগর), ধনেখালি প্রভৃতি জায়গায় **তাঁতের কাপড়**; মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ভাগলপুর, কাশী ও আসামের **রেশমী কাপড়**; অমৃতসর, রামপুর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের **পশমী কাপড়**; মির্জাপুরের **কার্পেট** ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ, কাশী ও মোরাদাবাদে **পিতল-কাসার বাসন**; কৃষ্ণনগরে **মাটির জিনিস**; গয়া, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে **পাথরের জিনিস** তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ভারতে ইদানীং প্রভূত শিল্পবিস্তার হইতেছে। এখানে প্রধান কয়েকটি যন্ত্রশিল্পের উল্লেখ করা যাইতেছে—

কার্পাসশিল্প—ইহাকে ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প বলা যায়। বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে ইহার কেন্দ্র। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর, মাদুরা, মাদ্রাজ, শোলাপুর, বাঙ্গালোর, নাগপুর, জব্বলপুর, ইন্দোর, দিল্লী, কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে চার শতেরও অধিক কাপড়ের কল চলিতেছে।

পাটশিল্প—পাটের কলগুলির বেশীর ভাগই কলিকাতার কাছাকাছি হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত। মোট ১০৭টি পাটের কলের মধ্যে মাত্র ৩টি উত্তরপ্রদেশে, ৪টি মাদ্রাজে ও ২টি বিহারে অবস্থিত। আগে বেশীর ভাগ পাট পূর্ব পাকিস্তান হইতে আনাইতে হইত। বর্তমানে উৎপাদন বাড়িয়া ১৬ হইতে ৪০ লক্ষ গাঁট দাঁড়াইয়াছে। প্রয়োজন প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট।

রেশমশিল্প—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূরে রেশমের কারখানা আছে। মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরের কার্পাস-কাঠের খণ্ড হইতে কিছু কিছু **কৃত্রিম রেশম** (rayon) তৈয়ারী হইতেছে।

পশমশিল্প—কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর, বরোদা, বোম্বাই ও

রাজস্থানে শাল, কম্বল ও কার্পেট তৈয়ারী হয়। পশমবস্ত্র তৈয়ারীর জন্য অস্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে পশম আমদানি হইয়া থাকে।

চর্মশিল্প—ভারতে ৭১টি চর্ম পরিষ্কার (tan) করিবার কারখানা এবং ২৬টি সুবৃহৎ জুতা ইত্যাদি চর্মদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। বাটানগর, কানপুর, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি চর্মশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইহা ছাড়াও প্রতি বৎসর ভারত হইতে আড়াই কোটিরও অধিক মূল্যের চামড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতের অরণ্য হইতে চামড়া ট্যান করিবার তৈল পাওয়া যায়।

চিনির কল—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে ৬২টি চিনির কল আছে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কলে শতকরা ৮০ ভাগ চিনি তৈয়ারী হয়।

কাগজের কল—ভারতে ১৫টি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত। বাঁশ ও সাবুই ঘাস এবং বিদেশ হইতে আমদানি সরলবর্গীয় গাছের মণ্ডে কাগজ তৈয়ারী হয়।

তেলের কল—উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রভৃতি রাজ্যে তেলের কল আছে। উহাতে সরিষা, তিল, তিসি, নারিকেল, কার্পাস বীজ প্রভৃতি তৈলবীজ হইতে তেল বাহির করা হয়।

চীনামাটি—দিল্লী, জয়পুর, গোয়ালিয়র, ভেল্লোর ও কলিকাতায় চীনামাটির কারখানা আছে। সেখানে নানা জিনিস তৈয়ারী হয়।

চা—চা-গাছের পাতা তুলিয়া উহা ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ভারতে প্রায় ৫,০০০০ চা-বাগান ও কারখানা আছে। আসাম, দার্জিলিং, কাংড়া উপত্যকা, নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে উহা অবস্থিত।

লৌহশিল্প—ভারতে তিন শতেরও বেশী লোহার কারখানা আছে। তাহার মধ্যে ছোটনাগপুরের সিংভূম জেলায় অবস্থিত **জামসেদপুরের কারখানা** বৃহত্তম। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কারখানাগুলির মধ্যে ইহা একটি পশ্চিমবঙ্গের **কুলটি** ও **বার্ণপুর** এবং মহীশূরের **ভদ্রাবতী** কারখানাও প্রসিদ্ধ

এইগুলি ছাড়া ভারতে আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইবে। উড়িষ্যার **রৌরকেলা** নামক স্থানে একটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের **ভিলাই** নামক স্থানে আর-একটি কারখানা হইবে। ইহার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে** তৃতীয় কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

বোম্বাই, ভিজাগাপত্তম ও কলিকাতার বন্দরে **জাহাজ মেরামত** হইয়া থাকে। ভিজাগাপত্তমে **জাহাজ ও স্টীমার তৈয়ারী** হইতেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে দুইখানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। ভারতে প্রথম তৈয়ারী জাহাজের নাম **জলউষা** (৮,০০০ টন)। বাঙ্গালোরে **এরোপ্লেন তৈয়ারীর** কারখানা হইয়াছে। মিহিজামের নিকট চিত্তরঞ্জনে **ইঞ্জিন তৈয়ারীর** বিরাট আয়োজন হইয়াছে। বোম্বাই ও কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে মোটরগাড়ি তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের কাঁচড়াপাড়া, খড়্গপুর, বিহারের জামালপুর, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে রেলগাড়ী, এবং বোম্বাই ও হাওড়ায় ট্রামগাড়ি মেরামতের কারখানা আছে।

কলিকাতা, বোম্বাই, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক **দিয়াশলাই-কারখানা** আছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ, দিল্লী, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে **সিমেণ্ট তৈয়ারীর কারখানা** আছে। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গে **কাচের কারখানা** আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু **চাউলের কল, ময়দার কল** এবং কয়েকটি **বিস্কুট ও বার্লির কারখানা** আছে। বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেলের নিকট **রবারের কারখানা**; বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কানপুর, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে **রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ তৈয়ারীর কারখানা**; ছোটনাগপুরের মুরি, ত্রিবাঙ্কুরের আলোয়ার, পশ্চিমবঙ্গের বেলুড় ও অনুপনগরে **এলুমিনিয়মের কারখানা** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **কাপড়-কলের যন্ত্রাদি, সাইকেল, ইলেকট্রিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন ও রোড রোলার** ইদানীং ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

লোকবসতি

ভারত বিশাল দেশ। ইহার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু সর্বত্র একরূপ নহে। সকল স্থানে কৃষিকার্যের উন্নতিও এক নয়। শিল্পও সকল স্থানে নাই। এই সকল কারণে ভারতের সর্বত্র জনবসতি একরূপ নয়। সাধারণত কৃষি ও শিল্পাঞ্চলেই বসতি ঘন। অন্যত্র বসতি অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৫১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ৩৫,৬৮,৯১,৬২৪ ছিল। তারপর ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি লোকসংখ্যা ৩৭,৬৭,৫০,০০০এ দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। নিম্নে ১৯৫১ সালে বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা কত ছিল তাহা দেওয়া হইল। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালের লোকগণনার সময় তখনকার রাজ্যগুলিতে লোকসংখ্যা যেরূপ ছিল তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৫১ সালের লোকসংখ্যা

আসাম	৯,১২৯,৪৪২
বিহার	৪০,২১৮,৯১৬
বোম্বাই	৩৫,৯৪৩,৫৫৯
মধ্যপ্রদেশ	২১,৩২৭,৮০৮
মাদ্রাজ (অন্ধ্রসহ)	৫৬,৯৫২,৩৩২
উড়িষ্যা	১৪,৬৪৪,২৯৩
পাঞ্জাব	১২,৬৩৮,৬১১
উত্তরপ্রদেশ	৬৩,২৫৪,১১৮
পশ্চিমবঙ্গ	২৪,৭৮৬,৬৮৩
হায়দ্রাবাদ	১৮,৬৫২,৯৬৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৪,০২১,৬১৬ *
মধ্যভারত	৭,৯৪১,৬৪২

* ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী।

১৯৫১ সালের লোকসংখ্যা

মহীশূর	৯,০৭১,৬৭৮
পেপসু	৩,৪৬৮,৬৩১
রাজস্থান	১৫,২৯৭,৯৭৯
সৌরাষ্ট্র	৪,১৩৬,০০৫
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৯,২৬৫,১৫৭
আজমীঢ়	৬৯২,৫০৬
ভূপাল	৮৩ ,৯০৭
বিলাসপুর	১২৭,৫৬৬
কুর্গ	২২৯,২৫৫
দিল্লী	১,৭৪৩,৯৯২
হিমাচলপ্রদেশ	৯৮৯,৪৩৭
কচ্ছ	৫৬৭,৮২৫
মণিপুর	৫৭৯,০৫৮
ত্রিপুরা	৬৪৯,৯৩০
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩,৫৭৭,৪৩১
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩০,৯৬৩
সিকিম	১৩৫,৬৪৬

যাতায়াতের উপায়

রাস্তা—ভারতের বিখ্যাত রাস্তাগুলির মধ্যে **গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** সর্বপ্রধান। উহা কলিকাতা হইতে দিল্লী (অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর দিয়া পেশোয়ার এবং সেখান হইতে খাইবার গিরিপথের জামরুদ) পর্যন্ত গিয়াছে। **ডেকান ট্রাঙ্ক রোড** উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর শহর হইতে মধ্যপ্রদেশের

নাগপুর হইয়া দক্ষিণ ভারতে গিয়াছে। ছয়টি **জাতীয় রাজপথের** (national highways) পরিকল্পনা হইয়াছে। সরল ও সুপ্রশস্ত এই পথগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্মিত ও রক্ষিত হইবে। প্রস্তাবিত পথগুলি যাইবে—(১) কলিকাতা হইতে বোম্বাই, (২) কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ; (৩) কলিকাতা হইতে দিল্লী; (৪) দিল্লী হইতে বোম্বাই; (৫) দিল্লী হইতে মাদ্রাজ; (৬) মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই।

কাশ্মীর অবধি নূতন রাস্তা—কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের সঙ্গে এতকাল দুইটি রাস্তায় ভারতের যোগাযোগ ছিল। একটি রাওয়ালপিণ্ডি হইতে, অপরটি ওয়াজিরাবাদ হইতে বাহির হইয়াছে। দুইটি রাস্তার অধিকাংশই এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত। সেইজন্য এই নূতন রাস্তা অতি দ্রুত তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা পাঠানকোট হইতে জম্মু পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার প্রয়োজনে মাধোপুরে ইরাবতীর উপর একটি সেতু তৈয়ারী হয়।

জলপথ—উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদী-খাল নাব্য। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মপুত্রের উপর ডিব্রুগড় পর্যন্ত প্রায় ৮০০ মাইল, এবং গঙ্গার উপর দিয়া কানপুর পযন্ত প্রায় ১,০০০ মাইল জলপথে যাতায়াত করা যায়। পাঞ্জাবে যমুনা ও শিরহিন্দ্ খাল, উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার খাল, বিহারে শোণ নদের খাল, মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর খাল, উড়িষ্যার মহানদীর খাল, পশ্চিমবঙ্গে হিজলি খাল নাব্য। সমুদ্রপথে দেশের বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে **উপকূল-বাণিজ্য** এবং দূর দেশের সঙ্গে **বৈদেশিক-বাণিজ্য** চলিয়া থাকে।

রেলপথ—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। বর্তমানে ভারত ইউনিয়নের মোট রেলপথের পরিমাণ ৩৪ হাজার মাইল। দেশের প্রত্যেক বন্দর ও প্রায় প্রত্যেক শহর রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত।

সম্প্রতি ভারত সরকার রাজ্যের রেলপথগুলি পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথগুলির **সাতটি প্রধান অঞ্চলে** বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নে নূতন বিভাগ অনুযায়ী রেলপথগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) **ইস্টার্ন রেলওয়ে** (E. R.)—ইহার সদর অফিস কলিকাতায়

অবস্থিত। হাওড়া, শিয়ালদহ, দানাপুর ও আসানসোল—এই চারিটি রেলওয়ে ডিভিশন লইয়া ইহা গঠিত। হাওড়া হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ইহা মোগলসরাই পর্যন্ত বিস্তৃত।
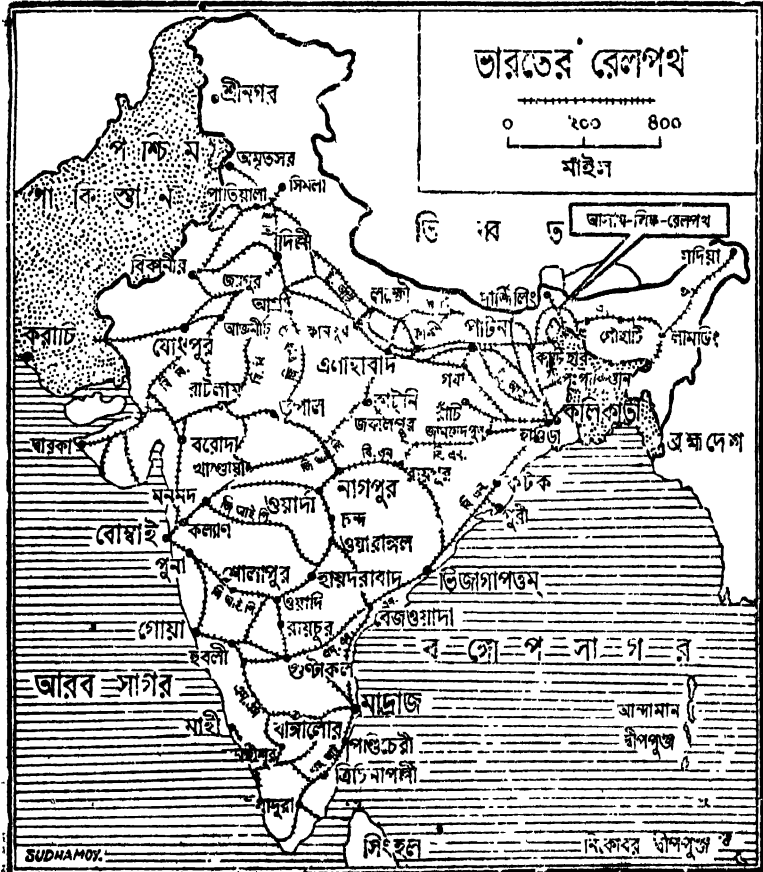
৯৩নং চিত্র—ভারতের রেলপথ

(২) **সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে** (S. E. R.)—কলিকাতা হইতে নাগপুর ও বিশাখাপত্তনম্ পর্যন্ত রেলপথ ইহার অন্তর্গত। ১৯৫৫ সালের ১লা

আগস্ট হইতে এই নূতন অঞ্চলের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইহা ইস্টার্ন রেলওয়ের অন্তর্গত ছিল। এই রেলওয়ের সদর অফিসও কলিকাতায় অবস্থিত।

(৩) **নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে** (N. E. R.)—প্রাক্তন আসাম রেলপথ, আউধ এণ্ড ত্রিহুত রেলপথ এবং বোম্বে-বরোদা অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের ফতেগড় অংশ লইয়া নর্থ ইস্টার্ন রেলপথ গঠিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৭৬০ মাইল। উত্তর প্রদেশের **গোরক্ষপুরে** ইহার সদর কার্যালয় অবস্থিত। ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে ইহা কার্যকরী হইয়াছে। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর অংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। গৌহাটি, ডিব্রুগড়, তেজপুর, শিবসাগর, সদিয়া, ডিগবয়, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, কাটিহার, কিষণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, শোণপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ছাপরা, গোরক্ষপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি শহর এই রেলপথের উপর অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ মিটার গেজ।

আসাম লিঙ্ক রেলপথ (A. L. R.)—ভারতবিভাগের ফলে বঙ্গদেশও বিভক্ত হয়। ইহার ফলে আসামের সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভারত সরকার প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে কতকাংশে নূতন রেলপথ নির্মাণ ও কতকাংশে পুরাতন রেলপথের সংস্কার করিয়া ভারতের অপরাপর অংশের সহিত আসামের সংযোগ সাধন করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে এই নূতন রেলপথে যাত্রী ও মাল চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। ইহা নর্থ ইস্টার্ন রেলপথের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৪) **নর্দার্ন রেলওয়ে** (N. R.)—প্রাক্তন ইস্ট পাঞ্জাব রেলওয়ে, যোধপুর রেলওয়ে, বিকানীর রেলওয়ে, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ বিভাগ এবং বোম্বে-বরোদা অ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের দিল্লী রেওয়ারী ফাজিলকা অংশ লইয়া নর্দার্ন রেলওয়ে গঠিত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে ইহা কার্যকরী হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৯৫০ মাইল। নয়া দিল্লীতে ইহার সদর কার্যালয় অবস্থিত। পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ এবং রাজস্থানের কতকাংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। দিল্লী, হরিদ্বার,

কাশী, মির্জাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, যোধপুর, বিকানীর, অমৃতসর, লোধিয়ানা, ফিরোজপুর প্রভৃতি শহর এই রেলপথে অবস্থিত।

(৫) **সেণ্ট্রাল রেলওয়ে** (C. R.)—প্রাক্তন গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে, নিজাম স্টেট রেলওয়ে, সিন্ধিয়া স্টেট রেলওয়ে ও ঢোলপুর স্টেট রেলওয়ে লইয়া সেণ্ট্রাল রেলওয়ে গঠিত হইয়াছে।

১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর হইতে ইহা কার্যকরী হইয়াছে। হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। বোম্বাই, পুণা, কল্যাণ, ভুসাওয়াল, ভূপাল, ঝান্সি, গোয়ালিয়র, আগ্রা, মথুরা, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি শহর এই রেলপথে অবস্থিত।

(৬) **ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে** (W. R.)—প্রাক্তন বোম্বে-বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে (দিল্লী রেওয়ারি-ফাজিলকা অংশ ও ফতেগড় ডিস্ট্রিক্ট বাদে) সৌরাষ্ট্র রেলওয়ে, রাজস্থান রেলওয়ে ও জয়পুর রেলওয়ে লইয়া ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর ইহা কার্যকরী হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৯৮৮ মাইল এবং **বোম্বাইয়ে** ইহার সদর কার্যালয় অবস্থিত। সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই, রাজস্থান, মধ্যভারত, দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। বোম্বাই, বরোদা, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, আমেদাবাদ, উদয়পুর, জয়পুর, মথুরা প্রভৃতি স্থানগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

(৭) **সাদার্ন রেলওয়ে** (S. R.)—প্রাক্তন সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে ও মহীশূর স্টেট রেলওয়ে লইয়া সাদার্ন রেলওয়ে গঠিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে উহা কার্যকরী হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৯৯৯ মাইল এবং **মাদ্রাজে** ইহার সদর কার্যালয় অবস্থিত। মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে, বোম্বাইয়ের দক্ষিণাংশে এবং হায়দ্রাবাদের কতকাংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। মাদ্রাজ, সালেম, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, তুতিকোরিন, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন, মাঙ্গালোর, মহীশূর, বাঙ্গালোর, বেজওয়াদা প্রভৃতি শহর এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

বিমানপথ (Air Route)—ভারতে বিমানপথের প্রভূত বিস্তার হইতেছে। ১৯৫৩ সালের ১লা আগস্ট হইতে ভারত সরকার দেশীয় বিমান কোম্পানীগুলিকে জাতীয়করণ করেন। বর্তমানে দুইটি বিমান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভারতের অভ্যন্তরের বিমান-চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য। (১) **ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন** (Indian Air Lines
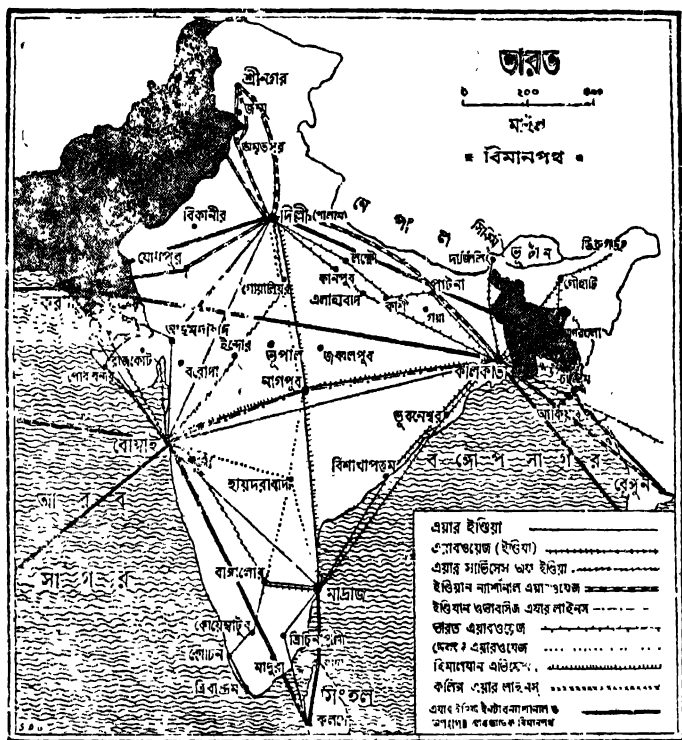
৯৪নং চিত্র—ভারতের বিমানপথ

Corporation) এবং বিদেশের সঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য (২) **এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল** (Air India International) এই দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান সব শহরই বিমানপথে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

ভারতের বন্দর ও পোতাশ্রয়

ভারতের উপকূল অভগ্ন, তাই ভারতে বেশী বন্দর বা পোতাশ্রয় নাই। ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে নিম্নের কয়েকটিই প্রধান :—

কলিকাতা—সর্বপ্রধান বন্দর। ড্রেজার দ্বারা নদীর মুখ মুক্ত রাখা হয়। সমগ্র পূর্ব ভারত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। সমুদ্রপথে ভারতের যত মাল রপ্তানি হয়, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ যায় এই বন্দর হইতে। চা, পাট, অভ্র, কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, চামড়া, তৈলবীজ, তামাক, গালা প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। কার্পাসবস্ত্র, লোহার জিনিস, কাগজ, পেট্রোলিয়ম, রাসায়নিক দ্রব্য, লবণ, চাউল, গম প্রভৃতি এই বন্দরে আমদানি হয়।

বোম্বাই—দ্বিতীয় বন্দর এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। অধিকাংশ সমুদ্রগামী জাহাজ এই বন্দর দিয়া যাতায়াত করে। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। তুলা, তৈলবীজ, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী জিনিস। কার্পাসবস্ত্র, পেট্রোলিয়ম, লোহার জিনিস, কলকব্জা প্রভৃতি এই বন্দরে আমদানি হয়।

মাদ্রাজ—ভারতের তৃতীয় বন্দর। বহু ব্যয়ে এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। ভারত সরকার ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৬টি জাহাজের জন্য একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করিতেছেন। চা, কফি, মসলা, তৈলবীজ, চামড়া, নারিকেল-শাঁস, ছোবড়া প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। কার্পাসবস্ত্র, পেট্রোলিয়ম, চিনি, রাসায়নিকদ্রব্য ও কলকব্জা প্রধানত আমদানি হইয়া থাকে।

বিশাখাপত্তনম—উন্নতিশীল বন্দর। এখানে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধানত চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ ও চীনাবাদাম রপ্তানি হয়। আমদানী জিনিসের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, কলকব্জা প্রভৃতি প্রধান।

পশ্চিম উপকূলের **সুরাট, মাঙ্গালোর, মাহী, কালিকট, কোচিন, আলেপ্পি, ত্রিবান্দ্রম, কান্দালা** এবং পূর্ব উপকূলে **তুতিকোরিন, কারিকল, পণ্ডিচেরি, কোকনদ** ইত্যাদি আরও অনেক বন্দর আছে।

করাচী বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় **কান্দলা** বন্দরটিকে প্রধান বন্দরে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কচ্ছ উপসাগরের পূর্বপ্রান্তে

কান্দালা নদী খাঁড়িতে (Kandala Creek) সুন্দর পোতাশ্রয় এবং **কান্দলা** ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান নগর

কলিকাতা—ভারতের বৃহত্তম নগর ও বন্দর। কলিকাতা মহানগরী ও উহার চতুর্দিকে অসংখ্য কলকারখানা আছে। ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র ও বাণিজ্যস্থান।

হাওড়া—হুগলী নদীর দক্ষিণ তীরে কলিকাতার বিপরীত দিকে অবস্থিত অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে অনেক কলকারখানা আছে। শিল্পের মধ্যে পাটশিল্পই প্রধান।

জামসেদপুর—বিহারের সিংভূম জেলায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

পাটনা—গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহার রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা অতি প্রাচীন শহর।

কটক—মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে অবস্থিত উড়িষ্যার পূর্বতন রাজধানী ও অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

কাশী—উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। ইহা ভারতের প্রাচীনতম নগর। এখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করার জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কাশীর রেশমী কাপড়, পিতলের বাসন ও খেলনা প্রসিদ্ধ।

এলাহাবাদ—গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এখানে কাগজ ও তেলের কল আছে।

আগ্রা—উত্তরপ্রদেশে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে তাজমহল ও আগ্রার দুর্গ দেখিবার জন্য বহু পর্যটক আসেন।

কানপুর—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের সর্বপ্রধান শিল্প-

বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে চামড়ার কারখানা, তেল, সূতীবস্ত্র, পশম ও চিনির কল আছে।

আলিগড়—ঐসলামিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মাখন ও চাবি-তালার জন্য আলিগড় প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্ণৌ—উত্তরপ্রদেশের রাজধানী এবং অন্যতম প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

দিল্লী—ভারতের রাজধানী। ইহা অতি প্রাচীন শহর। এখানে কাপড়ের কল, রাসায়নিক ও পেনিসিলিন কারখানা ও চিনির কল আছে।

অমৃতসর—পূর্ব পাঞ্জাবে পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অবস্থিত। ইহা শিখদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এখানকার স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত। এখানে পশম ও সূতী কাপড়ের কল আছে।

শ্রীনগর—কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। বৃহত্তম শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বহু পর্যটক কাশ্মীরে আসেন।

জয়পুর—রাজস্থানের রাজধানী ও বৃহত্তম নগর। এখানকার কারুকার্য-করা কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ।

গোয়ালিয়র—ইহা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এখানে মাটির বাসন তৈয়ারীর কারখানা ও কাপড়ের কল আছে।

ইন্দোর—মধ্যপ্রদেশের অন্যতম বৃহত্তম নগর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র।

নাগপুর—নবগঠিত বোম্বাই রাজ্যে অবস্থিত। ম্যাঙ্গানিজ ও তুলার অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে কতকগুলি কাপড়ের কল আছে।

জব্বলপুর—মধ্যপ্রদেশের সর্বপ্রধান শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে কামান বন্দুক তৈয়ারীর কারখানা ও কাপড়ের কল আছে।

আহ্মেদাবাদ—বোম্বাই রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও ভারতের সর্বপ্রধান বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র। এখানে বহু কাপড়ের কল আছে। ইহা কার্পাস-উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত, তাই কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠার অনেক সুবিধা হইয়াছে।

বোম্বাই—ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র; এখানে অসংখ্য কলকারখানা আছে। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই প্রধান।

বাঙ্গালোর—মহীশূর রাজ্যের সর্বপ্রধান নগর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে বস্ত্র, রেশম, তৈল, সাবান প্রভৃতির কলকারখানা আছে। এখানে বিমাননির্মাণের কারখানাও আছে।

মহীশূর—মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ও অন্যতম প্রধান নগর। এখানকার চন্দন কাঠ প্রসিদ্ধ।

হায়দরাবাদ—অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী। ইহা ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগর ও ব্যবসাকেন্দ্র।

মাদ্রাজ—ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম নগর ও বন্দর। ইহা একটি শিল্পপ্রধান শহর ও বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র।

কইম্বাটুর—মাদ্রাজ রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাপড় ও চিনির কল আছে।

মাদুরাই—মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহা হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান। ইহাকে 'দক্ষিণের কাশী' বলা হয়।

বাণিজ্য

আমাদের জীবনরক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেক জিনিসের প্রয়োজন। একটিমাত্র স্থান হইতে সমস্ত জিনিস মিলে না। ধরা যাক অভ্রের কথা। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ইহা নাই। অথচ ভারতে উহা এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে, প্রচুর খরচ করিয়াও আমরা উহা ফুরাইতে পারি না। নানা দেশের এমনি বহু দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূভাগের মধ্যে এই কারণে নানা জিনিসের ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাই বাণিজ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, তাহার নাম **অন্তর্বাণিজ্য**; পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, তাহাকে বলে **বহির্বাণিজ্য**।

অন্তর্বাণিজ্য—জলপথে প্রধানত নৌকা-স্টীমারযোগে এবং স্থলপথে প্রধানত রেলগাড়িযোগে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। গরুর গাড়,

'মহিষের গাড়িতে করিয়া, গাধা উট প্রভৃতির পিঠে চাপাইয়া এবং মোটরলরি-যোগেও মালপত্র নানাস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। আসামের চা, খনিজ তৈল; পশ্চিমবঙ্গের চট, চামড়া, কয়লা, নানা রাসায়নিক জিনিস; উড়িষ্যার কাঠ; বিহারের ঘি, চিনি, কয়লা, লোহার জিনিস; বোম্বাইয়ের কাপড়, সূতা, কাচের জিনিস; মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের তৈল, তৈলবীজ; পাঞ্জাবের গম ইত্যাদি জিনিস ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি হয়।

বহির্বাণিজ্য—স্থলপথে পাকিস্তানের সহিত সর্বাধিক, এবং তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ বাণিজ্য চলে।

জলপথে—গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া মিশর প্রভৃতি দূরবর্তী দেশের সহিত বাণিজ্য চলে। ভারতে ক্রমশঃ শিল্পের প্রসার হইতেছে। ইহার ফলে কৃষিজ, বনজ ও খনিজ কাঁচা মালের রপ্তানি এবং শিল্পজ দ্রব্যের আমদানি কমিয়া যাইতেছে। ইহা উন্নতির লক্ষণ।'

প্রধান আমদানী জিনিস—ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে **কার্পাসের জিনিস**; অস্ট্রেলিয়া ও গ্রেট বৃটেন হইতে **পশম ও পশমী জিনিস**; গ্রেট বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে **রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, কলকব্জা,** ইত্যাদি; ইরাণ, বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে **পেট্রোলিয়ম**; লঙ্কা ও কেনিয়া হইতে **মসলা**; গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে **ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য**, গ্রেট বৃটেন, জার্মানি, জাপান ও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে **কাচ ও কাচের জিনিস**; গ্রেট বৃটেন ও কানাডা হইতে **কাগজ**; চীন ও ফ্রান্স হইতে **রেশমী ও রেশম কাপড়** ভারতে আমদানী হয়। আর্জেন্টিনা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতকে ইদানীং প্রচুর **গম ও চাউল** আমদানি করিতে হইতেছে। কিন্তু বেশী দিন এইরূপ আমদানির প্রয়োজন থাকিবে না।

প্রধান রপ্তানী জিনিস—গ্রেট বৃটেনে **চা, তুলা, পাট, চামড়া, রবার, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ ও মেষলোম**; জাপানে; **তুলা**; জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে **চট ও চটের থলি** ভারত হইতে রপ্তানি হয়।

ভারতের রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রাজ্যসীমানা পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্যগুলির সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভারতের রাজ্যগুলির ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

আসাম

এই রাজ্য ভারতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি—একটি পর্বতশ্রেণী পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত থাকিয়া আসামের সমতলভূমিকে উত্তর ও দক্ষিণ দুইটি উপত্যকায় ভাগ করিয়াছে। পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের নাম **জরন্তিয়া, খাসিয়া** ও **গারো**। উহাদের উত্তরদিকে **ব্রহ্মপুত্র** নদ এবং দক্ষিণে **সুরমা** নদী প্রবাহিত। দুই নদীরই তীরভূমি উর্বর। হিমালয় ও ব্রহ্মদেশের পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে **পাতকোই, নাগা,** ও **লুসাই** প্রধান।

জলবায়ু—আসামের জলবায়ু আর্দ্র। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্প আনিয়া এই রাজ্যের মধ্যভাগের পর্বতমালায় প্রতিহত হয়। ইহার ফলে সুরমা উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। খাসিয়া পাহাড়ের **চেরাপুঞ্জি** নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত (৫০০ ইঞ্চি) হয়। কিন্তু বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম (৮০ ইঞ্চি)।

কৃষিজাত দ্রব্য—আসামের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, চা ও তৈলবীজ। ভারতের চায়ের বেশীর ভাগই আসামে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাট ও রবার প্রধান। পাট উৎপাদনে ইহা ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়।

ভারতের আর কোন রাজ্যে আসামের মত গভীর জঙ্গল নাই। জঙ্গলে শাল, শিমুল, জারুল, শিশু প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। গুটিপোকাও সংগৃহীত

হয়—তাহাতে এণ্ডি, মুগা ইত্যাদি রেশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসামে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে।

খনিজ দ্রব্য—লখিমপুর জেলায় ডিগবয় নামক স্থানে পেট্রোলিয়মের খনি আছে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণদিকে পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি কয়লার খনি আছে।

প্রধান নগর—রাজধানী **শিলং** খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত; উহা খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। **ডিব্রুগড়, শিবসাগর, নওগাঁ, গৌহাটি, তেজপুর, গোয়ালপাড়া** ও **ধুবড়ি** ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ নগর ও বাণিজ্যস্থান। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় **গৌহাটি** সর্বপ্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গৌহাটির নিকটে কামাখ্যা পাহাড়ে **কামরূপ** তীর্থ অবস্থিত। **ডিগবয়**—খনিজ তৈলের জন্য বিখ্যাত। **করিমগঞ্জ**—চুন ও কমলালেবুর জন্য এবং **শিলচর** চায়ের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। শিলচর মণিপুরী টাট্টু ব্যবসায়ের একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণাংশে অবস্থিত **চেরাপুঞ্জিতে** পৃথিবীর সব জায়গার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। নিকটবর্তী উপত্যকাগুলি হইতে চুনাপাথর ও কমলালেবু রপ্তানি হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকট **সদিয়া** (Sadia) নগরে সৈন্যনিবাস আছে।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যসীমানা পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা ও আয়তনের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিহার রাজ্যের কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিহারে পূর্ণিয়া জেলার প্রায় ৭৮০ বর্গমাইল-পরিমিত স্থান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশকে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিহারের এই অংশটুকু পশ্চিমবঙ্গে আসাতে এই রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ-ভাগের মধ্যে সংযোগ সাধিত হইয়াছে। এ ছাড়া বিহারের মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমার প্রায় সবটুকুই (দুইটি থানা বাদে) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অংশের আয়তন ২,৯৪০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১১.২ লক্ষ। ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হইয়াছে।

পুরুলিয়া শহরই এই জেলার সদর হইয়াছে। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তন ৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

সীমা ও উপকূল—দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য, উত্তরে সিকিম ও ভুটান এবং পূর্বদিকে পূর্ব পাকিস্তান—ইহারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান।

পূর্বে ২৪-পরগনার সীমান্তে রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাঁড়িভাঙার মোহনা হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার হিজলি অবধি পশ্চিমবঙ্গের উপকূলভাগ বিস্তৃত।

ভূপ্রকৃতি—উত্তর ভাগে কিয়দংশ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। উহার দক্ষিণে (জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর অংশ) তরাই অঞ্চল। ছোট-নাগপুরের মালভূমি বর্ধমান বিভাগের উত্তর-পশ্চিম ভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত; এখানে ছোট ছোট দ্বীপ (**সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য), খাল, বিল ও উপহ্রদ আছে। বাকি সমস্ত অংশ গঙ্গা ও ভাগীরথীর উর্বর কোমল পলিমাটিতে গড়া সমভূমি।

নদী—রাজমহল পাহাড়ের নিকট **গঙ্গা** পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট হইতে **ভাগীরথী** বাহির হইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট হইতে ভাগীরথী হুগলী নদী নামে অভিহিত হয়। **অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ** ও **কাঁসাই** ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। গঙ্গার মূল প্রবাহ পদ্মা নামে পূর্ববঙ্গের ভিতর প্রবাহিত হইতেছে; উহার উপনদী **মহানন্দার** তীরে মালদহ অবস্থিত। পদ্মার দুই শাখানদী **মাথাভাঙা** ও **জলঙ্গি** ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। **ইচ্ছামতী, মাতলা, গোসাবা, হাঁড়িভাঙা** প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান নদী। কুচবিহার জেলা দিয়া **তিস্তা, তোর্সা** প্রভৃতি নদী গিয়াছে।

জলবায়ু—জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; কিন্তু সমুদ্র-সান্নিধ্য, ভূমির নিম্নতা এবং বৃষ্টিপাতের জন্য কতকটা সমভাবাপন্ন হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী-বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র

সমান নয়; উত্তর অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালের গোড়ায় বিকালবেলা প্রায়ই ঝড় হয়—উহাকে **কালবৈশাখী** বলে। মৌসুমের শেষভাগে কখন কখন ঝড় হইয়া থাকে: উহা **আশ্বিনের ঝড়** নামে অভিহিত হয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। মাঘ মাসে কখন কখন দূরাগত মৃদু ঘূর্ণাবাতের প্রভাবে সামান্য বারিপাত হইয়া থাকে।

উৎপন্ন দ্রব্য

কৃষিজ সম্পদ—মোট কর্ষিত জমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগে ধান উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া পাট, চা ও আখ প্রধান। তামাকের চাষ বিশেষত কুচবিহার জেলায় হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন গম, তৈলবীজ, আলু, নানা প্রকার ডালকলাই ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম-কীটের প্রয়োজনে তুঁতগাছের চাষ হয়। মংপুতে সিঙ্কোনার চাষ হয়। পার্বত্য অঞ্চলে কমলালেবুর বাগান আছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের আম প্রসিদ্ধ। সমুদ্রোপকূলে নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল প্রভৃতি জন্মে।

বনজ সম্পদ—দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবনের বেশীর ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে পড়িয়াছে। সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এখান হইতে সুন্দরী, গরান, গেঁউয়া ইত্যাদি কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরী কাঠ খুব শক্ত—ইহাতে ঘরের আড়া, খুঁটি এবং আসবাবপত্র তৈয়ারী হয়। গরান কাঠেও ভাল খুঁটি হয়; উহার ছালে চামড়ায় কষ দেওয়া (tanning) হয়। গেঁউয়া কাঠে প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাই-এর কাঠি হয়। পার্বত্য ত্রিপুরার জঙ্গলে শাল, সেগুন, গামার এবং প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। অনেক শিমুলগাছ জন্মে, উহাতে শিমুল তুলা উৎপন্ন হয়। শিমুল কাঠেও প্যাকিং-বাক্স ও দিয়াশলাই-এর কাঠি তৈয়ারী হয়। পলাশ, কুল, বাবলা প্রভৃতি গাছে লাক্ষাকীট প্রতিপালিত হয়। দার্জিলিং অঞ্চলে পাইন গাছের অরণ্য রহিয়াছে। উহা এখনও যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় নাই।

খনিজ সম্পদ—বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে অনেক কয়লার খনি আছে। কয়লার উৎপাদনে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ

৯৫নং চিত্র—পশ্চিমবঙ্গ
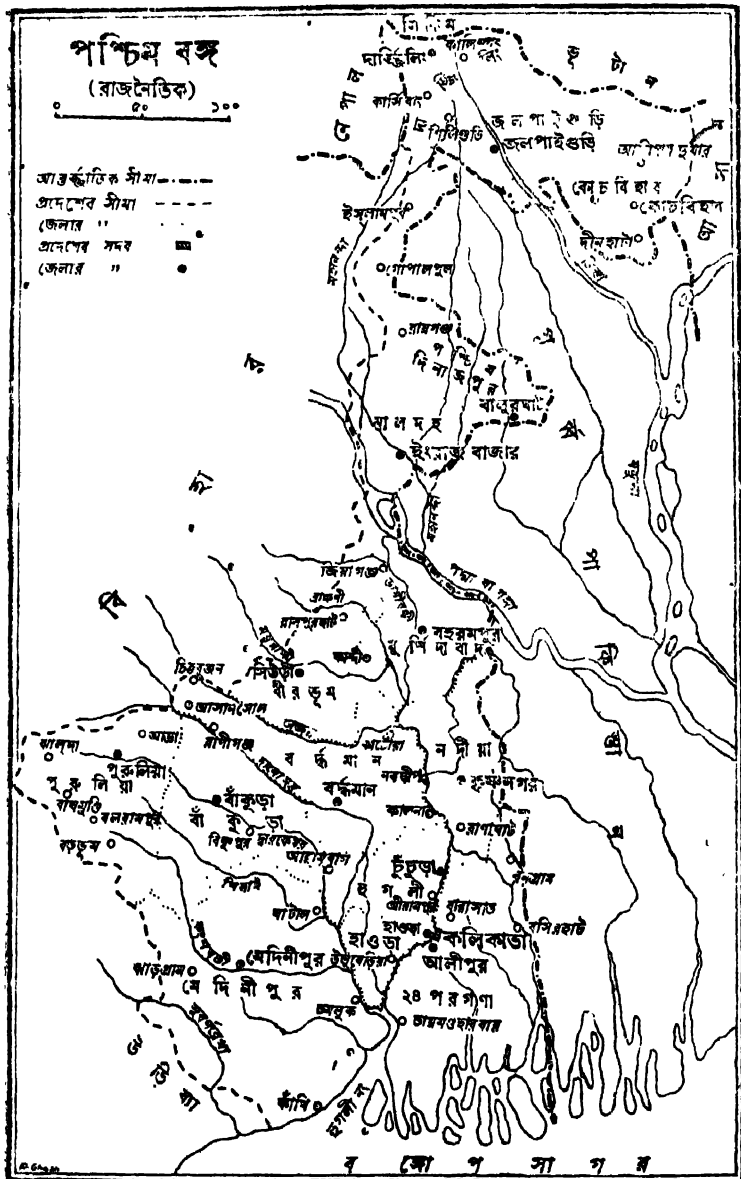
দ্বিতীয়স্থানীয়। আসানসোলের নিকট সামান্য নিকৃষ্টশ্রেণীর লৌহও পাওয়া যায়।

শিল্প-সম্পদ—কলিকাতা, হাওড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পাটের কল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, রাসায়নিক কারখানা, চীনামাটি, কাচ, রবার ও চামড়ার জিনিষ, দিয়াশলাই, সাবান, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা আছে। পাটশিল্পই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত কলিকাতার সমৃদ্ধির মূল। কুলটি ও বার্নপুরে লোহার কারখানা চলিতেছে। বেলডাঙা ও রামনগরে (পলাশির নিকট) চিনির কল আছে। কুটিরশিল্পের মধ্যে শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড়; মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের রেশমী কাপড়; খাগড়া (মুর্শিদাবাদ) ও কাটোয়ার পিতল-কাঁসার বাসন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বাণিজ্য—পাট ও পাটের জিনিস, চা, তৈলবীজ, চামড়া, কয়লা প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। লোহা ও ইস্পাতের জিনিস, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচ ও চীনামাটির বাসন, পেট্রোলিয়ম, লবণ, মশলা, শৌখিন জিনিসপত্র, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি প্রধানত আমদানি হইয়া থাকে।

প্রধান নগর

কলিকাতা—রাজধানী, সমুদ্র হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর; ১৯১২ অব্দ পর্যন্ত নিখিল ভারতের রাজধানী ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের লোক তো আছেই—সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য লোক এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করে। ই. আই. রেলপথের সাহায্যে ইহা সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত। খিদিরপুর এবং কিং জর্জ ডক নামক জাহাজের অবস্থানের ও মেরামতের স্থান কলিকাতার দক্ষিণভাগে অবস্থিত। জনসংখ্যা (শহরতলী-সমেত) এখন পঞ্চাশ লক্ষের বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নগরটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ।

হাওড়া—হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত শিল্পপ্রধান শহর। বিশাল সেতুদ্বারা উহা কলিকাতার সহিত সংযুক্ত। বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের বৃহত্তম স্টেশন।

দার্জিলিং, কালিম্পং, ও কার্সিয়াং—হিমালয় অঞ্চলের শৈলাবাস ও চা-উৎপাদনকেন্দ্র। এ অঞ্চলের কমলালেবু প্রসিদ্ধ। তিব্বত হইতে কালিম্পঙে পশম ও পশমী কাপড় আমদানি হয়। **শিলিগুড়ি**—এখানে মূল্যবান কাঠ, চা, কমলালেবু ও আনারস পাওয়া যায়। **মুর্শিদাবাদ** ও **বহরমপুর**—রেশম ও পিতল-কাঁসার জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট আম পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ নবাবী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। **বর্ধমান** ও **শিউড়ি**—দুইটি জেলার সদর। অনেক চাউলের কল আছে। **রাণীগঞ্জ**—কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। এখানে কাপড়ের কল এবং মৃৎশিল্পকেন্দ্র আছে। **আসানসোল**—শিল্পপ্রধান শহর। কয়লার খনি আছে। অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা ও লৌহ-ইস্পাতের কারখানা (বার্নপুর) আছে। **বাঁকুড়া**—রেশম ও তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধি আছে। **কুচবিহার**—পূর্বতন দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের রাজধানী ছিল। এখন কুচবিহার জেলার সদর। **কাঁথি**—সমুদ্রতীরবর্তী শহর। এখানে হাঙরের যকৃৎ হইতে তৈল-উৎপাদনের কারখানা আছে। লবণ তৈয়ারীর কারখানা তৈয়ারী হইতেছে। **মালদহ**—রেশম ও আমের জন্য বিখ্যাত। **নবদ্বীপ**—সংস্কৃত—বিশেষত ন্যায়শাস্ত্র—অনুশীলনের প্রাচীন কেন্দ্র। **চৈতন্যদেবের** জন্মস্থান ও লীলাভূমি। সেন রাজাদের আমলে ইহা বাংলার অন্যতম রাজধানী ছিল। **ডায়মণ্ডহারবার**—হুগলী নদীর মুখে অবস্থিত ছোট শহর; সমুদ্রগামী জাহাজ এই অবধি স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসে। এখান হইতে কলিকাতা বন্দর অবধি নদীখাত ড্রেজার দিয়া কাটাইয়া জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখিতে হয়। এখান হইতে খিদিরপুর অবধি একটি নূতন নাব্য খাল কাটাইবার পরিকল্পনা হইয়াছে।

বিহার

উত্তরে নেপাল, পূর্বে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ—এই সীমার মধ্যে বিহার রাজ্য অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি—দক্ষিণভাগে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এখানে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে—তাহাদের মধ্যে—**পরেশনাথ পাহাড়** (৪৫০০ ফুট) সর্বোচ্চ। মালভূমির উত্তর-পূর্বে **রাজমহল পাহাড়** সাঁওতাল-পরগনার মধ্য দিয়া গঙ্গাতীর অবধি বিস্তৃত। মালভূমির উত্তরে খাস-বিহার—ইহার অধিকাংশ সমভূমি। নদীর মধ্যে **গঙ্গা** ও তাহার উপনদীগুলি প্রধান। **ঘর্ঘরা, গণ্ডক** ও **কুশী** গঙ্গার বামতটের উপনদী। দক্ষিণতটের প্রধান উপনদী **শোণ**। **দামোদর** ও **রূপনারায়ণ** ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

জলবায়ু—উষ্ণ ও আর্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম (৪০ ইঞ্চি হইতে ৪৫ ইঞ্চি), শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ বেশী।

উৎপন্ন দ্রব্য—উত্তরে সমভূমিতে ধান, গম, যব, রাই, তিসি, আখ, তুলা, ভুট্টা, তামাক, মশলা এবং বিবিধ রবিশস্য উৎপন্ন হয়। আখের চাষে উত্তরপ্রদেশের পরেই বিহারের স্থান। দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ও হাজিপুরে প্রচুর আম ও লিচু জন্মে। পাট এবং আফিংও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। রেশমের জন্য তুঁতের চাষও হয়। ছোটনাগপুরের অরণ্য অঞ্চলে শালকাঠ, লাক্ষা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদ—খনিজ সম্পদে বিহার ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানভূম জেলার ঝরিয়া, কাতরাসাগড় প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। গিরিডি, রাঁচি ও হাজারিবাগ অঞ্চলে অভ্র ও কয়লার খনি আছে। সিংভূম জেলায় লোহা ও তামার খনি আছে; ম্যাঙ্গানিজও পাওয়া যায়। ভাগলপুরের নিকট কহালগাঁও অঞ্চলে কেওলিন পাওয়া যায়।

শিল্প—জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান। চম্পারণ, সারণ, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, ভাগলপুর, পাটনা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে চিনির কল আছে। মুঙ্গেরের তামাকের কারখানা

সুবৃহৎ। জাপলা ও শোণ-তীরবর্তী ডেহরিতে (ডালমিয়ানগর) সিমেণ্টের কারখানা আছে। মুরির অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, সিন্দ্রীর সার উৎপাদন-কেন্দ্র, নামকুমের লাক্ষাগবেষণা কেন্দ্র (Lac Research Institute) ইত্যাদি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
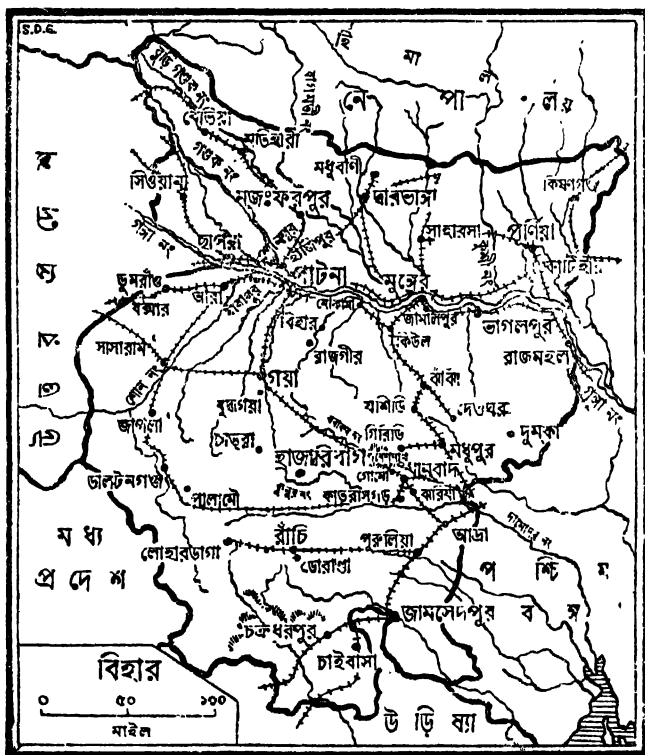
৯৬নং চিত্র—বিহার

প্রধান নগর—পাটনা রাজধানী; গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও শোণ ইহার নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রাচীন মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র এখানে.

অবস্থিত ছিল। **বাঁকিপুর** পাটনার শহরতলী। নিকটবর্তী **দানাপুর** সেনানিবাস। **রাঁচি** ছোটনাগপুরে অবস্থিত সেনানিবাস; রাজ্য সরকারের গ্রীষ্মবাস্। নিকটবর্তী **কাঁকের** পাগল-চিকিৎসার কেন্দ্র এবং **হুড্রুর** জলপ্রপাত বিখ্যাত। **ভাগলপুর**—ভাগলপুর বিভাগের প্রধান শহর; এখানে রেশমী কাপড় তৈয়ারী হয়। **মুঙ্গের** শহরের নিকট সীতাকুণ্ডে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। **জামালপুরে** বৃহৎ রেলের কারখানা আছে। **গয়া** হিন্দুতীর্থ। ইহার নিকটবর্তী **বুদ্ধগয়া** বৌদ্ধ-তীর্থ। **পরেশনাথ** জৈনতীর্থ। **ধানবাদ**—কয়লাখনির কেন্দ্র। **মজঃফরপুর** ও **দ্বারভাঙ্গার** লিচু, আম এবং **মতিহারির** তামাক প্রসিদ্ধ। **জামসেদপুর** ও **ডালমিয়ানগর** শিল্পপ্রধান শহর। **নালন্দায়** হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে শ্রেষ্ঠ বিত্তালয় ছিল; মাটি খুঁড়িয়া প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। **রাজগীর** প্রাচীন মগধের রাজধানী ছিল। স্বাস্থ্যকর স্থান, উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। **দেওঘর, মধুপুর, হাজারিবাগ, গিরিডি** স্বাস্থ্যকর স্থান। দেওঘর (বৈত্তনাথতীর্থ) হিন্দুতীর্থ।

উড়িষ্যা

ইহা আগে বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। ১৯৩৬ অব্দে উড়িষ্যা বিভাগ, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত হয়। ইহার উত্তরে বিহার, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মাদ্রাজ ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ।

১৯৪৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী ময়ূরভঞ্জ কেওঞ্ঝর, তালচের, বোনাই, ঢেঙ্কানল, কালাহাণ্ডি, বামড়া, আটঘর ইত্যাদি ২৪টি দেশীয় রাজ্য উড়িষ্যা-রাজ্যের সহিত মিশিয়াছে। রাজ্যের আয়তন ইহার ফলে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কটক, পুরী, বালেশ্বর, গঞ্জাম, সম্বলপুর ও কোরাপুট—এই ছয়টি পুরাতন জেলা। দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্তির পরে ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর, ঢেঙ্কানল, পাটনা, সুন্দরগড়—এই নূতন জেলাগুলি গঠিত হইয়াছে।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু—উত্তরাংশ পার্বত্য মালভূমি। দক্ষিণাংশের সমভূমি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। **মহানদী, বৈতরণী** ও **ব্রাহ্মণী**—তিনটি প্রধান

নদী এই অংশে প্রবহমান। মহানদীর **ব-দ্বীপ** ও **চিল্কা হ্রদ** এখানে অবস্থিত। জলবায়ু আর্দ্র ও সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য সমভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত ৫০—৬০ ইঞ্চি।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ; ভুট্টা, আখ, তৈলবীজ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। মালভূমিতে শাল, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ এবং উপকূল অঞ্চলে সুন্দরী কাঠ ও নারিকেল পাওয়া যায়। চিল্কা হ্রদে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে ; সেই মাছ নানা জায়গায় চালান যায়।

খনিজ দ্রব্য—ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেওঞ্ঝরে ভারতের অধিকাংশ **লোহা** পাওয়া যায়। তালচের ও সম্বলপুরে **কয়লার খনি** আছে। এই রাজ্যে **চুনাপাথর, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ** ইত্যাদিও সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। পিতল-কাঁসা ও পাথরের বাসন, হাড়, শিঙের ও চামড়ার তৈয়ারী নানা জিনিস এবং রেশম ও তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়।

প্রধান নগর—উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ও বিমানকেন্দ্র **ভুবনেশ্বর** ; এখানে সুপ্রাচীন মন্দির আছে। **কটক** মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে অবস্থিত শিল্প-বাণিজ্যস্থান ও পুরাতন রাজধানী। এখানে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। **পুরী** প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এবং সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস। **সম্বলপুর** শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। মহানদী-পরিকল্পনা অনুসারে যেখানে হীরাকুণ্ড বাঁধ তৈয়ারী হইতেছে, এই শহর তাহার নিকট অবস্থিত। বাঁধ তৈয়ারী হইলে এই স্থানের বিপুল সমৃদ্ধি হইবে। **বারিপদা** ময়ূরভঞ্জের শহর এবং খনিজ দ্রব্য ও কুটিরশিল্পের কেন্দ্র। **বালেশ্বর** বাণিজ্যকেন্দ্র ; পূর্বে এখানে বন্দর ছিল। **গোপালপুর** সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস।

উত্তর-প্রদেশ

উত্তরে নেপাল ও তিব্বত, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও রাজস্থান, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে বিহার—এই সীমার মধ্যে উত্তর-প্রদেশ অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু—উত্তর অংশে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। ***শিবালিক*** *পর্বত হিমালয়ের দক্ষিণে প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত।* হিমালয়

ও শিবালিকের মধ্যে **ডুন উপত্যকা**। পর্বতের নিম্নভাগে বালুকাময় **ভাবার** ও স্যাঁতসেতে **তরাই** অঞ্চল—সেখানে শাল, দীর্ঘ তৃণ জন্মে। উত্তরপ্রদেশের সর্বদক্ষিণে মধ্যভারতের মালভূমি অংশ। ইহা শুষ্ক ও অনুর্বর। মধ্যভাগে পলিমাটির সুবিশাল সমভূমি। **যমুনা, গঙ্গা, রামগঙ্গা, গোমতী, সরযু** (ঘর্ঘরা—Gogra) প্রভৃতি নদী এই অঞ্চলে প্রবহমান। সরযুর প্রধান উপনদী **কালী** (শার্দা—Sarda) ও **তাপ্তী**। যমুনার প্রধান উপনদী **বেতোয়া** ও **চম্বল**। এই অংশের মত নদীবহুল উর্বর অঞ্চল ভারতের আর কোথাও নাই। লোকবসতি ঘন।

জলবায়ু—জলবায়ু চরমভাবাপন্ন বলা যায়—শীতকালে যেমন শীত, গ্রীষ্মকালে তেমনই গরম। বৃষ্টিপাত অধিক নহে (৩০—৪০ ইঞ্চি)—পশ্চিমদিকে উহা ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা হইতে দুইটি, যমুনা হইতে দুইটি এবং শার্দা ও শোণ হইতে এক-একটি খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—আখ, যব, গম, ভুট্টা ও বাজরা উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন ডালকলাই, ধান, কার্পাস, আফিং প্রভৃতিও জন্মে। ডুন উপত্যকায় চা-বাগান আছে। গোরক্ষপুর, কানপুর, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে চিনির কল আছে। ভারতের অধিকাংশ চিনি এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন কানপুরে তেল; কাশীতে রেশমী ও সূতী কাপড়; আগ্রা ও ফিরোজাবাদে কাচের জিনিস; আগ্রা ও মির্জাপুরে গালিচা; মোরাদাবাদে পিতল-কাঁসার বাসন; আগ্রা ও কানপুরে চামড়ার জিনিস, চুণারে মাটি ও পাথরের জিনিস; গাজীপুরে আতর, গোলাপজল ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

প্রধান নগর—রাজধানী **লক্ষ্ণৌ** গোমতীর তীরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিবিধ কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত। **এলাহাবাদ** পুরাতন রাজধানী। ইহার অন্য নাম প্রয়াগ—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত হিন্দুতীর্থ। রেলওয়ে জংশন ও বিমান-ঘাঁটি। **কানপুর** বিভিন্ন রেলপথের কেন্দ্র; উত্তর প্রদেশের সর্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। **আগ্রা** যমুনাতীরে অবস্থিত শিল্পকেন্দ্র। মোগল-আমলে কিছুকাল এখানে রাজধানী ছিল। এখানকার **তাজমহল** সমাধিভবন পৃথিবীখ্যাত। আগ্রার অদূরের **দয়ালবাগ** নামক

স্থানে নানা শিল্পদ্রব্য তৈয়ারি হয়। **কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার** ও **অযোধ্যা** প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। কাশী অন্যতম প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বহুখ্যাত। ইহার নিকটবর্তী **সারনাথ**

৯৭ নং চিত্র—উত্তর প্রদেশ

বৌদ্ধতীর্থ। **আলিগড়ে** তালা, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। এখান হইতে প্রচুর ঘৃত-মাখন রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সুপরিচিত। **রুড়কিতে** ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। **মুসৌরী, নৈনিতাল,**

আলমোড়া, দেরাদুন প্রভৃতি এবং দক্ষিণে **বিন্ধ্যাচল** স্বাস্থ্যনিবাস। দেরাদুন যুদ্ধবিদ্যা ও বনবিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র। **মোরাদাবাদ** রামগঙ্গার তীরে অবস্থিত পিতল-কাঁসা শিল্পের কেন্দ্র। **রামপুরের** পশম-শিল্প বিখ্যাত। **মির্জাপুরে** কার্পেট ও **গাজীপুরে** আতর ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। **মীরাট** ও **বেরিলি** সেনানিবাস।

পাঞ্জাব

পাকিস্তান রাষ্ট্র-গঠনের ফলে পূর্বতন পাঞ্জাব প্রদেশ বাংলার ন্যায় দুই ভাগ হইয়াছিল। জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগের সমুদয় অংশ এবং লাহোর বিভাগের সমগ্র অমৃতসর জেলা ভারতীয় অংশে পড়িয়াছে। লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতী (রাভী) নদীর পূর্বদিকে অবস্থিত পাঠানকোট, গুরুদাসপুর এবং বাটাল তহ্‌শিলও ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভিন্ন লাহোর জেলার সামান্য অংশ ভারত পাইয়াছে। ইতিপূর্বে রাজ্যটি পূর্ব-পাঞ্জাব নামে অভিহিত হইত।

পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে পাতিয়ালা রাজ্যই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই রাজ্য ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্য লইয়া স্বাধীনতালাভের পর 'পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য সমবায়' (Pepsu) নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। গত ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতের প্রদেশগুলির সীমানার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ইহার ফলে উপরোক্ত রাজ্য সমবায়ের সব কয়টি অংশই পাঞ্জাব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাই এখন 'পেপসু' নামে কোন প্রদেশ রহিল না।

এই সকল রাজ্য পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত হওয়ায় পাঞ্জাবের আয়তন ও লোকসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নবগঠিত পাঞ্জাব রাজ্যের আয়তন ৪৬,৬১৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ।

দক্ষিণে রাজস্থান; পূর্বে হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ; উত্তরে কাশ্মীর ও জম্মু; পশ্চিমে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তী পাঞ্জাব প্রদেশ—ইহার মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু—উত্তর ও উত্তর-পূর্বের কতক অংশ হিমালয়ের

পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। আরাবল্লী হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত যে উচ্চভূমি আছে (Delhi Ridge), এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে তাহার উত্তরভাগ আসিয়া পড়িয়াছে। অবশিষ্ট পাললিক সমভূমি। ইরাবতী (Ravi) ও বিপাশার
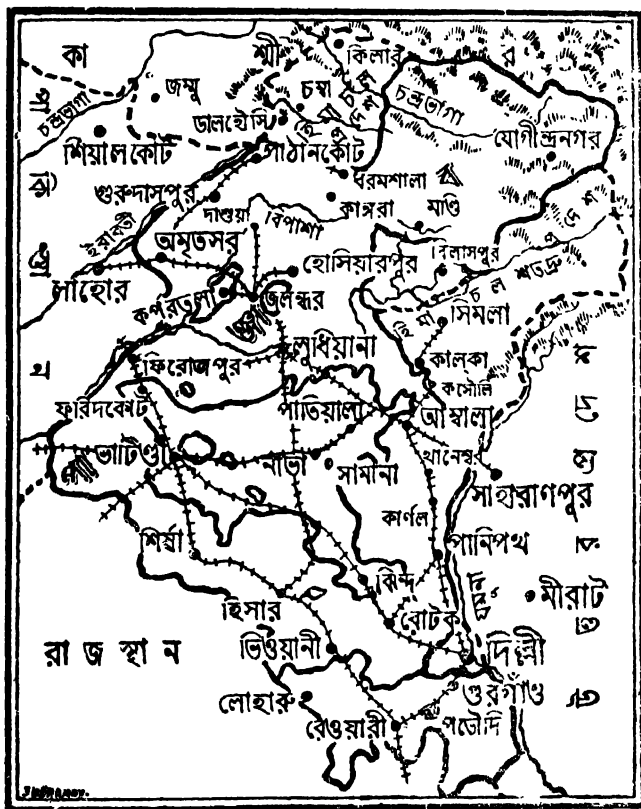
৯৮নং চিত্র—পাঞ্জাব

(Beas) মধ্যবর্তী বড়ি-দোয়াবের* কতকটা এবং বিপাশা-শতদ্রুর (Sutlej) মধ্যবর্তী জলন্ধর-দোয়াব এই রাজ্যে অবস্থিত। প্রধান নদী **শতদ্রু** ও **বিপাশা**। **ইরাবতী** ও **চন্দ্রভাগার** (Chenub) সামান্য অংশ এই রাজ্যে প্রবহমান।

* দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানকে দোয়াব বলে

জলবায়ু—জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সামান্য বৃষ্টিপাত হয় (২০—৩০ ইঞ্চি)। উত্তরের পার্বত্য-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী। ঘূর্ণবাতের ফলে ঐ অংশে শীতকালে অল্প বৃষ্টি হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—শিরহিন্দ খাল, পশ্চিম-যমুনা খাল, বড়ি-দোয়াব খাল এবং অসংখ্য কূপ হইতে জলসেচনের ফলে এই শুষ্ক সমভূমি অঞ্চলে গম, যব, তুলা, তামাক, আখ ও ধান জন্মে। কাংড়া উপত্যকায় চা উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অরণ্যে পাইন, দেবদারু প্রভৃতি কাঠ পাওয়া যায়। পশুচারণও ঐ অংশের অধিবাসীদের অন্যতম উপজীবিকা। পশুর চামড়া, শাল, কম্বল, কার্পেট প্রভৃতি পশম-শিল্প, নানাবিধ কারুশিল্প, সূতী কাপড়, চিনি, দিয়াশলাই প্রভৃতি তৈয়ারী হয়।

প্রধান নগর—**জলন্ধর** প্রসিদ্ধ সেনানিবাস। আম্বালা-কালকা রেলপথে অবস্থিত **চণ্ডীগড়ে** নূতন রাজধানী। **অমৃতসর** বড়ি-দোয়াব অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রধান শিখতীর্থ। এখানকার স্বর্ণমন্দির পৃথিবীখ্যাত। **লুধিয়ানা** শতদ্রু-তীরে অবস্থিত। পশম ও কার্পাস-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **আম্বালা** ও **ফিরোজপুর** সেনানিবাস। **কসৌলী** ও **ডালহৌসী** পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে কসৌলীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। **পাতিয়ালা**—প্রাক্তন পেপসুরাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা সুন্দর শহর ও অন্যতম প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। **কপূরতলা, ঝিন্দ, ভাতিন্দা** অন্যান্য প্রধান শহর।

বোম্বাই

এই রাজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০০ মাইল এবং বিস্তার ৭০০ হইতে ৮০০ মাইল। ইহার উত্তরে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র; দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে আরব-সাগর।

রাজ্যসীমানা পুনর্গঠনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে বোম্বাই রাজ্যের মানচিত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এই রাজ্যের আয়তন অনেক

বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাক্তন সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছপ্রদেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন হায়দরাবাদ ও মধ্যপ্রদেশেরও অনেক অংশ নবগঠিত বৃহৎ বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুনর্গঠিত বোম্বাই রাজ্যের আয়তন ১৯০,৬৯০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৮,২৬৫,১৭৪।

ভু-প্রকৃতি ও **জলবায়ু**—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১) **পশ্চিম উপকূলের সঙ্কীর্ণ সমভূমি**। পশ্চিমঘাট পর্বত সমুদ্র হইতে কোথাও ৫০।৬০ মাইল, কোথাও বা মাত্র ৫।৬ মাইল দূরবর্তী। গোয়াব উত্তরের অংশ **কঙ্কণ** ও দক্ষিণের অংশ **মালাবার** উপকূল নামে অভিহিত হয়। (২) **পশ্চিমঘাট অঞ্চল**—পশ্চিমঘাট পর্বত পশ্চিম উপকূলের পূর্ব দিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। উত্তরে নাসিকের নিকট **থলঘাট,** দক্ষিণে পুণার নিকট **ভোরঘাট** গিরিপথ দুইটি অবস্থিত। বোম্বাই হইতে দুইটি রেলপথ ইহাদের মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। (৩) উত্তর-পূর্বে কৃষ্ণমৃত্তিকাময় নিম্ন মালভূমি **খান্দেশ অঞ্চল**। কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা-চাষের বিশেষ উপযোগী। (৪) রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ **উচ্চ মালভূমি**। উত্তরদিকে গুজরাট অঞ্চলে **নর্মদা ও তাপ্তী** নদী প্রবাহিত। **গোদাবরী, কৃষ্ণা** এবং কৃষ্ণার উপনদী **ভীমা, নীরা, ঘাটপ্রভা, তুঙ্গভদ্রা** প্রভৃতি পূর্বদিকে বহিয়া গিয়াছে।

জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র; কিন্তু সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য অনেকটা সমভাবাপন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমভাগে এবং উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বোম্বাই শহরে ৭৫ ইঞ্চি এবং পশ্চিমঘাটের **মহাবালেশ্বর** শৃঙ্গে ২৫০—৩০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমঘাটের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া মালভূমিতে বৃষ্টিপাত কম।

উৎপন্ন দ্রব্য—গুজরাটে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট তুলা জন্মে। উপকূলভাগে ধান ও নারিকেল প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলা, গম, ছোলা এবং নদী-উপত্যকায় ধান, গম, তৈলবীজ ও নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতে সেগুন ও চন্দনকাঠ পাওয়া যায়।

পাঁচমহল জেলার রত্নগিরিতে কিছু ম্যাঙ্গানিজ এবং ধারওয়ারের নিকটের খনি হইতে অতি সামান্য সোনা পাওয়া যায়।
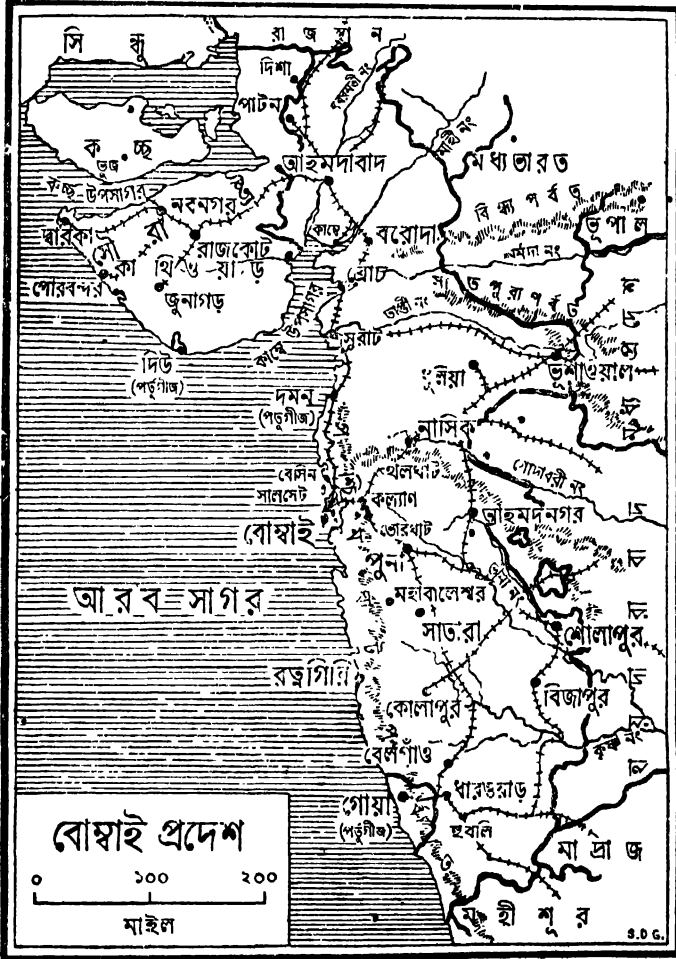
৯৯নং চিত্র—বোম্বাই প্রদেশ

বোম্বাই শিল্প-প্রধান রাজ্য। ২২৮টি কাপড়ের কল আছে। বোম্বাই ও আমেদাবাদ কার্পাস-শিল্পের কেন্দ্র। ইহা ভিন্ন চিনি, কাগজ, রেশম, কাচ ও

নানা রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে। কিন্তু কয়লার অভাব—কলকারখানার কয়লা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার হইতে আসে। টাটা কোম্পানির পরিচালনায় পশ্চিমঘাট পর্বতে **লোনাভলা, নীলামূলা** ও **অন্ধ্র উপত্যকায়** জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করিয়া কলকারখানা ও বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানো হয়।

প্রধান নগর—রাজধানী **বোম্বাই** ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এবং দ্বিতীয় বন্দর। ইহা পশ্চিম উপকূলের নিকট একটি ছোট দ্বীপের উপর অবস্থিত; সেতু ও রেলপথের দ্বারা দেশের সহিত যুক্ত। নিকটবর্তী **এলিফ্যাণ্টা** দ্বীপের পর্বত-গুহায় প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শন আছে। **আমেদাবাদ** গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী সবরমতী-তীরে অবস্থিত। কার্পাস-শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এই শহরকে 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়। **পুনা** বৃহৎ সেনানিবাস, এখানে কেন্দ্রীয় আবহ-অফিস অবস্থিত। পূর্বে পেশোয়াদের রাজধানী ছিল; এখানে বোম্বাই রাজ্য-সরকারের বর্ষাবাস। **বরোদা** বৃহৎ শহর ও বিমানপোত নির্মাণ-কেন্দ্র। **সুরাট** তাপ্তীর মোহনায় অবস্থিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এখানে সর্বপ্রথম কুঠি স্থাপন করে। **নাসিক** গোদাবরী-উৎসের নিকটে অবস্থিত হিন্দুতীর্থ ও স্বাস্থ্যনিবাস। **বেলগাঁও, শোলাপুর, ধারওয়ার, হুবলি** তুলা ও বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। **মহাবালেশ্বর** পশ্চিমঘাটের উপর অবস্থিত স্বাস্থ্য-নিবাস, রাজ্যসরকারের গ্রীষ্মাবাস। **আহ্‌মদনগর** ও **বিজাপুর** ঐতিহাসিক নগর। **সাতারা** ছত্রপতি শিবাজীর জন্মস্থান। **রত্নগিরি** পশ্চিম উপকূলের বন্দর; এখানে প্রধানত উপকূল-বাণিজ্য হইয়া থাকে। **ব্রোচ** ও **কাম্বে** প্রাচীন বন্দর। **নাগপুর**—ইহা পূর্বতন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে ইহা বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা বেন-গঙ্গা উপত্যকায় পাঁচটি রেলপথের মিলনস্থলে অবস্থিত। ইহা কার্পাস-শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র ও একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **অমরাবতী** ও **ওয়ার্ধা**—তুলা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। **ঔরঙ্গাবাদ** ও **দৌলতাবাদ**—মোগল-আমলের রাজধানী। ইহার নিকটে **অজন্তা** ও **ইলোরার** বিখ্যাত গুহাগুলি অবস্থিত। এইগুলি দর্শন করার জন্য প্রতি বৎসর বহু পর্যটক ঔরঙ্গাবাদে আসেন।

কাণ্ডলা—কচ্ছ অঞ্চলে অবস্থিত বোম্বাই রাজ্যের উত্তরাংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। স্বাধীনতালাভের পর এই বন্দর তৈয়ারী করা হইয়াছে। **ওখা, পোরবন্দর** ও **সোমনাথ** সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত অন্যান্য প্রধান বন্দর। **দ্বারকা**—হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থস্থান। **রাজকোট** ও **ভবনগর**—অন্যান্য প্রধান শহর।

উপকূলভাগে **গোয়া** (Goa), **দমন** (Damn), **দিউ** (Diew), পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত। গোয়ার রাজধানী **নভা গোয়া,** প্রধান বন্দর **মর্মগাঁও**।

মাদ্রাজ

ইহার উত্তরে অন্ধ্র ও মহীশূর রাজ্য; পূর্ব ও দক্ষিণে ভারতমহাসাগর; পশ্চিমে মহীশূর ও কেরল রাজ্য।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের আয়তন কিছুটা কমাইয়া নূতন মাদ্রাজ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলকে মহীশূরের সহিত এবং মালাবার অঞ্চলকে কেরল প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। নবগঠিত মাদ্রাজ রাজ্যের আয়তন ৫০,১৭০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি।

ভু-প্রকৃতি ও জলবায়ু—রাজ্যের পূর্বদিকে করোমণ্ডল উপকূল। **পালার, দক্ষিণ-পেন্নার, কাবেরী** প্রভৃতি নদী এখান হইতে সমুদ্রে পড়িতেছে। কাবেরী ব-দ্বীপ এবং **কোলার, পলিকট** প্রভৃতি উপহ্রদ এই অংশে অবস্থিত।

পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের মধ্যে **উচ্চ মালভূমি**। **নীলগিরি** পর্বত ঐ দুই পর্বতের সংযোগ সাধন করিয়াছে। নীলগিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **দোদাবেট্টা** (৮৬৪০ ফুট)। নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** গিরিপথ। উহার দক্ষিণে **আনামালাই** ও **পুলনি পাহাড়**। তাহার দক্ষিণে **কার্ডামম** কুমারিকা অবধি বিস্তৃত। আনামালাইর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **আনাইমুডি** (৮৮৫০ ফুট)।

মাদ্রাজের গড়-উষ্ণতা উত্তর-ভারতের চেয়ে বেশী। কিন্তু সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য জলবায়ু অনেকটা সম-ভাবাপন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টি (১০০ ইঞ্চির বেশী) হয়। কিন্তু পশ্চিমঘাটের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলিয়া মালভূমি অঞ্চলে ও পূর্ব উপকূলের

উত্তরভাগের বৃষ্টিপাত কম। কিন্তু পূর্ব উপকূলের দক্ষিণ অংশে উভয় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীত ও গ্রীষ্মে **দুইবার বর্ষা** হইয়া থাকে।

উৎপন্ন দ্রব্য—মালভূমি ও পূর্ব উপকূলের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া জলসেচের জন্য নদীতে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম জলাশয় তৈয়ারী করা হয়। এই জলে এবং বাকিংহাম, মেতুর প্রভৃতি খালের জলে সিঞ্চিত হইয়া এখানে প্রচুর কৃষিকার্য হয়। ধান, চিনাবাদাম, আখ, তুলা, তামাক, জোয়ার ইত্যাদি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উপকূলে নারিকেল জন্মে। নীলগিরি পর্বতে সিঙ্কোনা, চা ও কফি চাষ হয়। কার্ডামম পর্বতে দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতে সেগুন, চন্দন ও আবলুস কাঠ পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে রবারও জন্মে।

সালেম জেলায় লোহার খনি আছে। উপকূলভাগে মাছ, শঙ্খ, মুক্তা এবং উপহ্রদগুলিতে লবণ পাওয়া যায়।

মাদ্রাজে কার্পাস-শিল্প প্রধান, অনেক চিনির কলও আছে। ইহা ছাড়া কাগজ, তেল, চামড়া, রেশম, পাটের জিনিস, নারিকেল-দড়ি, সাবান, দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা আছে।

প্রধান নগর—মাদ্রাজ রাজধানী; ভারতের তৃতীয় বন্দর। এখানকার পোতাশ্রয় কৃত্রিম। বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **মাদুরায়** বিখ্যাত মীনাক্ষী-মন্দির অবস্থিত। হিন্দু-তীর্থ। রেশম ও কার্পাস-শিল্পের কেন্দ্র। **তাঞ্জোর, রামেশ্বর, কুম্ভকোণম্‌, ত্রিচিনোপল্লী** ও **কাঞ্জিভরম্‌** (কাঞ্চী) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ও হিন্দু-তীর্থ। **কোয়েম্বাটুর** বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্র। এখানে ইক্ষু-গবেষণালয় আছে। **চিদাম্বরমে** আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। **উতকামন্দ, কন্নুর, কোদাইকানাল, ওয়েলিংটন** বিখ্যাত শৈলনিবাস। কোদাইকানালে মানমন্দির আছে। উতকামন্দ রাজ্যসরকারের গ্রীষ্মাবাস। **সালেম** নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব উপকূলে **কাড্ডালোর, নাগাপত্তম** ও **টিউটিকোরিন** উপকূল-বাণিজ্যের বন্দর।

করোমণ্ডল উপকূলে **পণ্ডিচেরি** ও **কারিকল** বন্দর এবং **ইয়ানাঁও** (Yanaon)।

অন্ধ্র

১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর পূর্বতন মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তরাংশ লইয়া অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ইহার আয়তন ৬৩ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২২ কোটি ছিল।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ অন্ধ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। বর্তমান অন্ধ্ররাজ্যের আয়তন অনেক বড়। ইহা বর্তমান ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য। ইহার আয়তন ১১০,২৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ২২ লক্ষ।

রাজ্যের উপকূলভাগে বিস্তীর্ণ সমভূমি আছে। সমভূমির পশ্চাতে পূর্বঘাট পর্বত। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের পশ্চিমাংশ মালভূমি অঞ্চল। গোদাবরী ও কৃষ্ণা এই রাজ্যের সর্বপ্রধান নদী। উভয় নদীই মোহনায় ব-দ্বীপ তৈয়ারী করিয়াছে। নদী উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বর।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, ইক্ষু, তামাক, তুলা, তৈলবীজ ও নারিকেল এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

খনিজ—খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র** এবং **লৌহই** প্রধান।

শিল্প—এই রাজ্যের শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই উল্লেখযোগ্য। এখানে অনেক কাপড়ের কল আছে।

প্রধান নগর—কুর্ণুল—প্রাক্তন অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। **বিশাখাপত্তনম্** সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। এখানে জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। **ওয়ালটেয়ার**—সমুদ্র-উপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান। **হায়দরাবাদ**—নবগঠিত অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান শহর। ইহা চারিটি রেলপথের মিলনস্থলে অবস্থিত একটি শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। **সেকেন্দ্রাবাদ** বিখ্যাত সেনানিবাস। অন্যান্য শহরের মধ্যে **নেলোর, করিমনগর, মসলীপত্তম্, কোকনদ, রাজমহেন্দ্রীই** প্রধান।

মধ্যপ্রদেশ

দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রশস্ত উত্তর অংশে এই রাজ্য অবস্থিত। উত্তরে উত্তরপ্রদেশ, পূর্বে বিহার ও উড়িষ্যা, দক্ষিণে অন্ধ্র ও বোম্বাই প্রদেশ, পশ্চিমে বোম্বাই ও রাজস্থান—এই সীমার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন মধ্যপ্রদেশের অনেকখানি অংশ বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাক্তন মধ্যভারত ও বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের সামান্য কিছু অংশ নব-গঠিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাই একদিক দিয়া ইহার আয়তন কমিলেও অন্য দিক দিয়া ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। নূতন মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের আয়তন প্রায় ১৭১,২০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৬১ লক্ষ।

ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু—একটি সুপ্রশস্ত মালভূমি। মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ নদী উপত্যকা। **নর্মদা, বেনগঙ্গা, চম্বল, পেনগঙ্গা, ইন্দ্রবতী, শোণ** ইত্যাদি নদী প্রবহমান। উত্তর ভাগে বিন্ধ্য এবং সাতপুরা ও মহাকাল পর্বতের মধ্যে নর্মদা নদীর সমতল কৃষ্ণমৃত্তিকা-উপত্যকা। সাতপুরা ও মহাকালের দক্ষিণে বেনগঙ্গার সমভূমি। পূর্ব অংশ মহানদীর উপত্যকা।

মালভূমি অঞ্চলে উচ্চতার জন্য জলবায়ু তত উষ্ণ নয়। কিন্তু নিম্ন-উপত্যকাগুলিতে গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম পড়ে। বৃষ্টিপাত ৪০ হইতে ৫০ ইঞ্চি। পূর্বাংশেই বেশী বৃষ্টি হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—মহানদীর উপত্যকায় এবং ছত্রিশগড় সমভূমিতে ধান ও গম অধিক পরিমাণে জন্মে। কৃষ্ণমৃত্তিকায় তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া জোয়ার, ছোলা, আখ, ধান প্রভৃতি ফসলও এই রাজ্যে জন্মে। অরণ্যময় অংশে শাল, সেগুন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ, রেশমের গুটিপোকা, লাক্ষা ও বিড়িপাতা পাওয়া যায়। বেরারে প্রচুর তুলা জন্মে। **দ্রুগ** অঞ্চলে লৌহ আছে। **বালাঘাট, ভাণ্ডারা, চিন্দওয়ারা** ও **জব্বলপুর** জেলা হইতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই রাজ্যে কতকগুলি কাপড়ের কল ও সিমেণ্টের কারখানা আছে। রেশম-বস্ত্রও তৈয়ারী হয়।

প্রধান নগর—জব্বলপুর নর্মদা-তীরে অবস্থিত শিল্পপ্রধান নগর। অনতিদূরে মার্বেল পাথরের পাহাড় ও নর্মদার জলপ্রপাত সুবিখ্যাত। **কাটনী** বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র। অনেকগুলি সিমেণ্টের কারখানা আছে। **রায়পুর** ছত্রিশগড় অঞ্চলে শিবনাথের (মহানদীর উপনদী) তীরে অবস্থিত। ধান, রেশম, লাক্ষা প্রভৃতির বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য কলেজ আছে। **বিলাসপুর**—রেলপথের কেন্দ্র। মহাদেব পর্বতের উপর অবস্থিত **পাঁচমারি** রাজ্য-সরকারের গ্রীষ্মাবাস। **কামতি** ও **সাগর** সৈনা নিবাস। সাগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **ভুপাল**—এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। **গোয়ালিয়র**—ইহা অতি প্রাচীন নগর; ইহা প্রস্তর-শিল্প ও চুরুট তৈয়ারীর কেন্দ্র। এখানে দেড় মাইল দীর্ঘ প্রস্তর-দুর্গ আছে। **ইন্দোর** শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। কাপড়ের কল, ময়দার কল, ও ধাতুদ্রব্য তৈয়ারীর কারখানা আছে: **উজ্জয়িনী** হিন্দুতীর্থ। এখানকার মানমন্দির বিখ্যাত। **নৌ** সেনানিবাস। **লস্কর** পূর্বতন রাজপ্রমুখের বাসস্থান।

রাজস্থান

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে আজমীঢ় রাজ্য রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যের সীমানার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বর্তমান রাজস্থান রাজ্যের আয়তন ১,৩২,৩০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। ইতিহাসে তোমরা রাজপুতানা অঞ্চলের অনেকগুলি রাজ্যের কথা পড়িয়া থাকিবে। ইহাদের প্রায় সবগুলিই এই রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই রাজ্যের উত্তরে পাঞ্জাব, উত্তর-পূর্বে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে বোম্বাই রাজ্য এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান—এই সীমানার মধ্যে রাজস্থান রাজ্য অবস্থিত।

আরাবল্লী পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত হইয়া রাজ্যটিকে প্রায় মাঝামাঝি খণ্ডিত করিয়াছে। **আবু** (৫৬৫০ ফুট) উহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। পশ্চিম অংশ প্রায় বৃষ্টিহীন (১০ ইঞ্চি) নিম্ন সমভূমি—উহা **থর**-মরুভূমির অংশ। একমাত্র নদী **লুনি**। যোধপুর, বিকানীর ও যশল্মীর রাজ্য এই অঞ্চলে অবস্থিত। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য জোয়ার। বিকানীর রাজ্যের উত্তর অংশে শতদ্রু নদীর **খাল** আছে। সেখানে তুলা, গম, ছোলা ও তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তাহা ছাড়া এখানে জিপসাম নামক খনিজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আরাবল্লীর পূর্ব অংশে **চম্বল** ও তাহার উপনদী **বানস, কালীসিন্ধ** প্রভৃতি প্রবহমান। এখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী (২৩-৩০ ইঞ্চি); গম, যব, আখ, তুলা, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে। জয়পুর রাজ্যের **সম্বর হ্রদ** হইতে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। **জয়পুর** রাজধানী এবং রাজস্থানের বৃহত্তম ও সুন্দরতম নগর, শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র। **অম্বর** জয়পুরের নিকট অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী। **উদয়পুর** মেবারের প্রাচীন রাজধানী। **আবু** স্বাস্থ্যনিবাস ও জৈনতীর্থ। **চিতোর, হলদিঘাট** ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান।

কেরল প্রদেশ

ভারতের গভর্ণর-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে এই রাজ্যই ক্ষুদ্রতম। প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য এবং প্রাক্তন মাদ্রাজের মালাবার জেলা লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এই রাজ্যের আয়তন ১৪,৯৮০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ। এই রাজ্যের লোকবসতি খুব ঘন। অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যার অনুপাতও খুব বেশী।

উপকূলের সমভূমি, পূর্বদিকের মালভূমি ও পাহাড় লইয়া এই রাজ্য গঠিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—পার্বত্য অঞ্চলে সিঙ্কোনা, ইউক্যালিপটস, সেগুন কাঠ, রবার, চা, কফি, নানাবিধ মসলা এবং উপকূল অঞ্চলে ধান, নারিকেল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়।

প্রধান নগর ও বন্দর--ত্রিবান্দ্রম—রাজধানী ও বন্দর। **এর্ণাকোলম**

—পৃথক অবস্থায় কোচিনের রাজধানী ছিল। ইহা দ্বিতীয় নগর ও বন্দর। **কুইলন, আলেপ্পি, ও কোচিন** প্রধান বন্দর। কোচিন ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও নৌঘাঁটি।

কাশ্মীর ও জম্মু

ভুপ্রকৃতি ও জলবায়ু—এই রাজ্য ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য কাশ্মীর 'ভূস্বর্গ' নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী ও তাহাদের নিম্ন-উপত্যকায় দেশটি গঠিত। **পিরপঞ্জল, পঙ্গি, জানস্কর** ও **লাডাক** (কারাকোরাম) এই চারিটি পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গিলগিটের উপত্যকা, কাশ্মীর (বিতস্তার) উপত্যকা, পুঞ্চ উপত্যকা এবং জম্মুর পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত। হিমালয়ের অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ **নাঙ্গাপর্বত** এই রাজ্যের উত্তরাংশে রহিয়াছে। **জোগ** ও **বানিহাল** গিরিপথ এবং **উলার** হ্রদ কাশ্মীর উপত্যকা-অংশে অবস্থিত। এই রাজ্যে **চন্দ্রভাগা, ঝিলম** (বা বিতস্তা) **সিন্ধু** ইত্যাদি নদী প্রবহমান।

জলবায়ু শুষ্ক, শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। বৃষ্টিপাত কম। শীতকালে সামান্য বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা হইতে জলসেচ করিয়া কৃষিকার্য হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য—গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, আপেল, পীচ, আঙুর প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিছু কিছু ধানও হয়। তুঁতের চাষ হয় বলিয়া রেশম-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। শ্রীনগরের নিকটস্থ সরকারী শিল্প-ফ্যাক্টরী এশিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম। তৃণভূমিতে পশুচারণ হয়। মেষ ও ছাগলোম হইতে উৎকৃষ্ট শাল ও কার্পেট তৈয়ারী হয়। বনে বিনাযত্নে অজস্র সুন্দর ফুল ফুটে, তাই কাশ্মীরের এক নাম—'ভারতের উদ্যান'।

প্রধান নগর—রাজধানী **শ্রীনগর** ঝিলম নদীর তীরে অবস্থিত মনোরম শহর। **লেহ** প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **অমরনাথ** হিন্দুতীর্থ। **জম্মু** শীতকালের রাজধানী। **উরি, পুঞ্চ, মীরপুর** ও **কাঠুয়া**—কুটিরশিল্প-প্রধান শহর। ভারত-সরকার পাঠানকোট হইতে জম্মু অবধি একটি নূতন রাস্তা তৈয়ারী করাইয়াছেন।

মহীশূর

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু—হায়দরাবাদের দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের সর্বোচ্চ অংশে (২০০০ ফুট উচ্চ) এই রাজ্য অবস্থিত। রাজ্য-পুনর্গঠনের ফলে প্রাক্তন হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যের কতক অংশ নবগঠিত মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের আয়তন ৭২,৭৩০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ।

দক্ষিণে **নীলগিরি**, পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট** ও পূর্বে **পূর্বঘাট** পর্বত। **কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা, পেন্নার, পাল্লার, পেনিয়ার**, প্রভৃতি প্রধান নদী। দক্ষিণ-পূর্বে কাবেরীর **শিবসমুদ্রম্** এবং উত্তর-পশ্চিমে শিরাবতীর **গারসোপ্পা** জলপ্রপাত। এই দুইটি স্থান হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। জলবিদ্যুৎ-শক্তিতে কোলারের স্বর্ণখনি ও অনেক কলকারখানা চলিতেছে। পশ্চিমের পার্বত্য অংশে মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব অংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলিয়া বৃষ্টিপাত কম (২০-৩০ ইঞ্চি)। কাবেরীর খাল হইতে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—বৃষ্টিবহুল অংশে আবলুস, চন্দন ও সেগুনকাঠ, কফি ও সিঙ্কোনা উৎপন্ন হয়। অল্পবৃষ্টি অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে আখ, কার্পাস, ধান, ডালকলাই, তৈলবীজ, জোয়ার প্রভৃতি জন্মে। কোলারে স্বর্ণ, ভদ্রাবতীতে লৌহ ও নানাস্থানে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। এই রাজ্য বিশেষভাবে শিল্পসমৃদ্ধ। লৌহ, রেশম, পশম, কার্পাস, চিনি, চন্দন ইত্যাদি-সম্পর্কিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রধান নগর—মহীশূর রাজধানী। **কোলারে** ভারতের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্বর্ণখনি আছে। **বাঙ্গালোর** স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাস, বাণিজ্যকেন্দ্র, চারিটি রেলপথের মিলনস্থল ও সেনানিবাস। এখানকার বিজ্ঞান-পরিষদ্ (Indian Institute of Science) পৃথিবী বিখ্যাত। এখানে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা হইয়াছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্য

পূর্বে যে ১৪টি রাজ্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের সবগুলিই গভর্ণর-শাসিত রাজ্য। এ ছাড়া ভারতের আরও ৬টি রাজ্য আছে। **এইগুলি**

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। এই রাজ্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

হিমাচল প্রদেশ—কাশ্মীরের দক্ষিণে ও উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমে দুইটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অঞ্চল লইয়া হিমাচল প্রদেশ গঠিত। ইহার অধিকাংশই বন্ধুর পার্বত্যভূমি। এই রাজ্যের আয়তন ১১,০৫৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ১৭ হাজার। **সিমলা** এই রাজ্যের রাজধানী। ইহা হিমালয়ের শাখাপর্বতের উপর অবস্থিত ভারতের অন্যতম বিখ্যাত শৈলনিবাস।

ত্রিপুরা—প্রাক্তন করদরাজ্য ত্রিপুরাই বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন ত্রিপুরা রাজ্য হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানই ইহার তিন দিকের সীমানা। পূর্বদিকে আসাম রাজ্য। ইহার আয়তন ৪,১১৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার। **আগরতলা** এই রাজ্যের রাজধানী।

মণিপুর—আসামের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রহ্মসীমান্তে এই রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ইহার আয়তন ৮,৬২৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার। **ইম্ফল** এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান শহর।

দিল্লী—দিল্লী মহানগরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী কিছুটা অঞ্চল কেন্দ্রীয় শাসনাধীন। ইহার আয়তন ৫৭৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার। **দিল্লীই** ইহার প্রধান ও একমাত্র শহর এবং রাজধানী। দিল্লী ভারতের রাজধানী।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ এবং নিকটবর্তী ছোট ছোট অনেকগুলি দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এই রাজ্যের বসতি খুব কম। অধিবাসীদের সংখ্যা ৩১ হাজারের চেয়েও কম। **পোর্ট ব্লেয়ার**—এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান শহর।

লাক্ষাদ্বীপ ও আমিন দ্বীপ—ভারতের পশ্চিম উপকূলের নিকট আরব সাগরে অবস্থিত কতকগুলি দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য গঠিত। এই দ্বীপপুঞ্জে ছোট-বড় ১৪টি দ্বীপ আছে। লোকসংখ্যা খুবই কম—প্রায় ২১ হাজার। অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান।

পূর্ব-হিমালয়ের তিনটি রাজ্য

নেপাল

স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য। পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, পূর্বে সিকিম ও দার্জিলিং এবং উত্তরে হিমালয় ও তিব্বত। আয়তন ৫৪ হাজার বর্গমাইল। হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ **মাউণ্ট এভারেস্ট** ও অপর প্রধান শৃঙ্গ **ধবলগিরি** এই রাজ্যে অবস্থিত। **ঘর্ঘরা, গণ্ডক** ও **কুশী** প্রধান নদী। গম, জোয়ার, তৈলবীজ, ধান এবং আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি ফল প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। শাল, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধনিপুণ গোর্খা জাতি এখানকার অধিবাসী। রাজধানী **কাটমুণ্ডু**। **পত্তন** একটি প্রধান নগর। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান **কপিলাবস্তু** এই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত।

ভুটান

ইহা আসামের উত্তরে অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য। আয়তন ১৮ হাজার বর্গমাইল। হিমালয়ের সু-উচ্চ শৃঙ্গ **চমলহরি** এই রাজ্যে অবস্থিত; ব্রহ্মপুত্রের উপনদী মানস ইহার মধ্য দিয়া প্রবহমান। ভুট্টা, গম এবং কিছু কিছু ধানের চাষ হয়। রেশম, মৃগনাভি, গালা ও কাঠ বাহিরে চালান যায়। রাজধানী **পুণাখা**।

সিকিম

দার্জিলিং-এর উত্তরে নেপাল ও ভুটানের মধ্যে অবস্থিত। কার্যত ইহা ভারত-সরকারের কর্তৃত্বাধীন। আয়তন ২,৮০০ বর্গমাইল। তিস্তা নদীর উপত্যকায় প্রচুর ফসল হয়। ভুট্টা, গম, ধান, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। রাজধানী **গ্যাংটক**।

পাকিস্তান

১৯৪৭ অব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের মুসলমানপ্রধান অংশ পৃথক হইয়া এই নবীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার এক অংশ ভারতের পূর্ব ভাগে। ইহাকে **পূর্ব পাকিস্তান** বলা হয়। অপর অংশের অবস্থান ভারতের পশ্চিমে। ইহা **পশ্চিম পাকিস্তান** নামে অভিহিত হয়। পাকিস্তানের এই উভয় অংশের মধ্যে প্রায় ১,৪০০ মাইলের ব্যবধান। মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগ ভারতপ্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত।

এই কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উৎপন্ন-দ্রব্য, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে।

সীমা—পূর্ব পাকিস্তানের **উত্তরে** পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা, আসাম রাজ্য; **পূর্বে** আসাম, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ; **দক্ষিণে** বঙ্গোপসাগর; **পশ্চিমে** পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের **উত্তরে** কাশ্মীর ও সোভিয়েট রুশিয়া; **পূর্বে** কাশ্মীর, পাঞ্জাব (ভারত) ও রাজস্থান; **দক্ষিণে** কচ্ছ ও আরব সাগর; **পশ্চিমে** ইরাণ ও আফগানিস্তান।

অবস্থান ও আয়তন—পূর্ব পাকিস্তান উত্তরে (দিনাজপুরের উত্তরে) প্রায় ২৬½° উ. অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে (চট্টগ্রামের দক্ষিণ) প্রায় ২০½° উ. অক্ষরেখা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে (দিনাজপুরের পশ্চিম) ৮৮° পূর্ব দেশান্তর হইতে পূর্বে (পার্বত্য-চট্টগ্রামের পূর্বে) প্রায় ৯১½° পূ দেশান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন ৫৪ হাজার বর্গমাইল; লোকসংখ্যা প্রায় ৪২০ লক্ষ।

পশ্চিম পাকিস্তান উত্তরে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উত্তর) প্রায় ৩৮° উ. অক্ষরেখা হইতে দক্ষিণে (সিন্ধুর দক্ষিণ) প্রায় ২৩½° উ. অক্ষরেখা এবং পশ্চিমে (বেলুচিস্তানের পশ্চিম) ৬১° পূ. দেশান্তর হইতে পূর্বে (পাকিস্তান পাঞ্জাবের পূর্ব) ৭৫° পূ. দেশান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন প্রায় ৩,১০,২৩৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ৩৩৭ লক্ষ।

অতএব পাকিস্তানের আয়তন ভারতের এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী। পশ্চিম-পাকিস্তান আয়তনে বৃহত্তম হইলেও লোকবসতি পূর্ব পাকিস্তানে অধিক।

উপকূল—পূর্ব পাকিস্তানের উপকূল-ভাগ ভগ্ন এবং তটরেখার পরিমাণ আয়তনের তুলনায় বেশী (প্রতি ৩০০ বর্গমাইলে উপকূলের পরিমাণ প্রায় ১ মাইল)। ইহা রায়মঙ্গল নদীর শাখা হাড়িভাঙ্গার মোহনা হইতে কক্সবাজারের দক্ষিণ অবধি বিস্তৃত। রায়মঙ্গল, মালঞ্চ, হরিণঘাটা, তেতুলিয়া, পশর, মেঘনা, কর্ণফুলি, ডাকাতিয়া, ফেণী প্রভৃতি নদীর মোহনা এই উপকূলে অবস্থিত। উপকূলের দক্ষিণে **সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবুদিয়া, মহেশখালি** প্রভৃতি দ্বীপ অবস্থিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের কেবল দক্ষিণদিকে সমুদ্র; এখানে উপকূল-ভাগ অত্যন্ত অল্প (প্রায় প্রতি ৫০০ বর্গমাইলে মাত্র ১ মাইল)। বেলুচিস্তানের তটরেখা প্রায় সোজাসুজি গিয়া তারপর দক্ষিণ-পূর্বে আঁকা-বাঁকা হইয়া গিয়াছে (সিন্ধুর ব-দ্বীপ)। তটরেখা অতঃপর সরলভাবে সিন্ধুপ্রদেশের দক্ষিণ দিয়া গিয়া পূর্বমুখে বাঁকিয়াছে। সিন্ধুর মোহনার নিকট সমুদ্র অগভীর; সেজন্য সমুদ্রগামী জাহাজ সিন্ধুনদে ঢুকিতে পারে না। সিন্ধুনদের পশ্চিম শাখার পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ **করাচি** বন্দর। **হিংলাজ** উপদ্বীপ ও **মোঞ্জ** অন্তরীপ এই উপকূলে অবস্থিত।

ভূপ্রকৃতি

পাকিস্তানের অধিকাংশ ভূভাগ প্রাচীনকালে সমুদ্রমগ্ন ছিল। ভূ-আন্দোলন ও নদীর পললে উহা ক্রমশ উঁচু হইয়াছে। সেজন্য পর্বতগুলি ভঙ্গিল এবং প্রধানত পাললিক শিলায় গঠিত। সমভূমি অংশ পলিমাটিতে গড়া। এই পলিমাটি কোন কোন জায়গায় প্রায় হাজার ফুট গভীর।

পূর্ব পাকিস্তান

ভূপ্রকৃতি অনুসারে পূর্ব-পাকিস্তানকে দুই অঞ্চলে ভাগ করা যায়। (১) পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পাললিক সমভূমি; (২) পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও উত্তর ত্রিপুরার উচ্চভূমি।

১০০নং চিত্র—পূর্ব পাকিস্তান
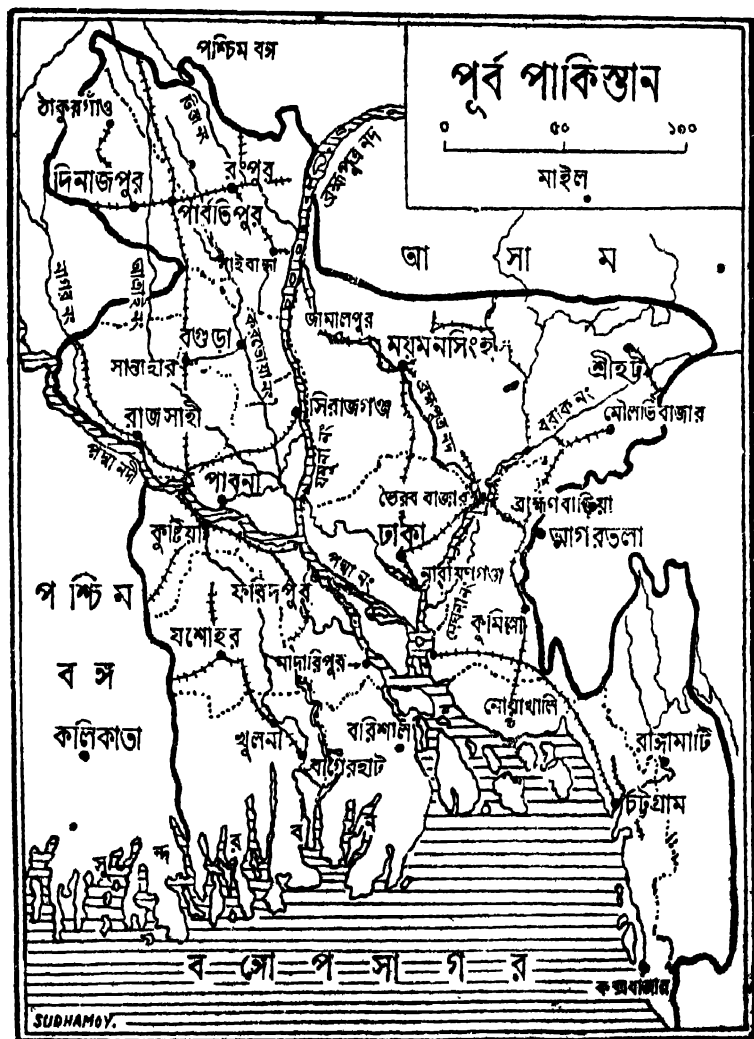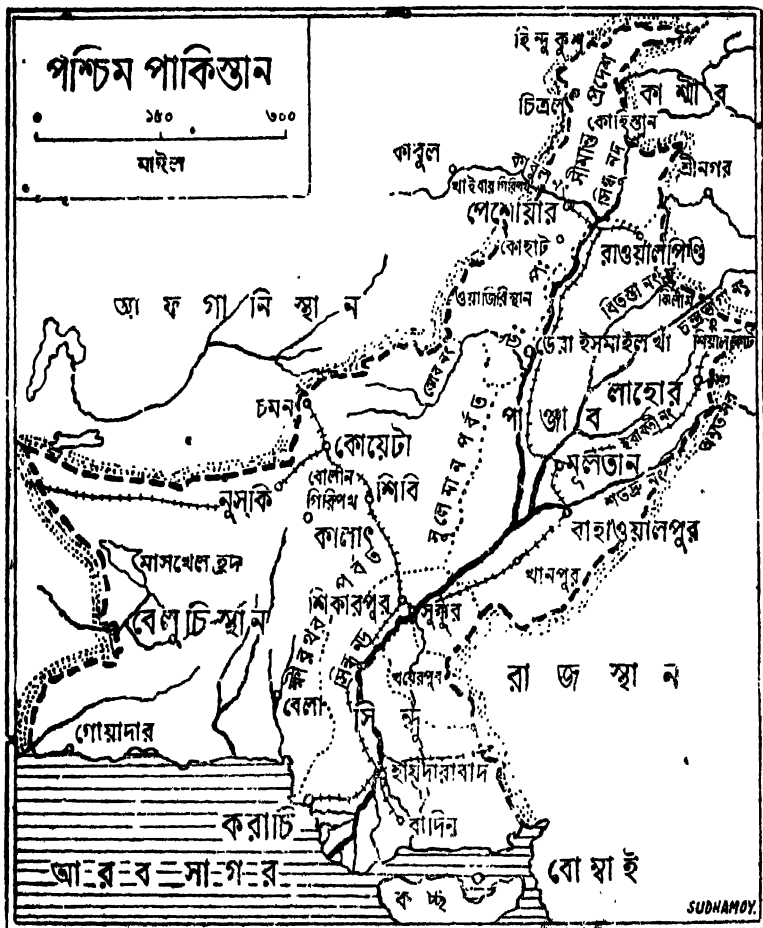
১০১নং চিত্র—পশ্চিম পাকিস্তান

(১) **পাললিক ভূমি**—পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের উপনদী ও শাখা-নদীবাহিত পলিমৃত্তিকায় এই অঞ্চল গঠিত। বহু নদী এখনও গতি পরিবর্তন করে এবং নূতন নূতন ভূমির গঠন হয়। মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ভূমি উর্বরা। প্রচুর শস্য জন্মে। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে গারো পাহাড়ের পাদদেশ—এখানে ভূমিভাগ উচ্চ।

(২) **উচ্চভূমি**—লুসাই পর্বতের নিম্ন অংশ, উত্তর-ত্রিপুরা এবং পার্বত্য-চট্টগ্রাম লইয়া এই অঞ্চল। ইহার পূর্বে লুসাই পর্বত, উত্তরে আরাকান য়োমা। এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য আছে। ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর, লোকবসতি অল্প। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি ও ময়মনসিংহের মধুপুর অঞ্চলের ঢেউ-খেলানো উচ্চভূমি প্রাচীন পললে গঠিত।

পশ্চিম পাকিস্তান

ভূপ্রকৃতি অনুসারে পশ্চিম পাকিস্তানকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) হিমালয় ও অবহিমালয় অঞ্চল; (২) পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল; (৩) মালভূমি অঞ্চল; (৪) সিন্ধু-অববাহিকার সমভূমি।

(১) **হিমালয় ও অবহিমালয় অঞ্চল**—পাঞ্জাবের উত্তর ভাগে সামান্য স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার অরণ্যে নানাজাতীয় কাঠ পাওয়া যায়। উহা হইতে খেলার সরঞ্জাম ও আসবাব ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। পাইন, দেবদারু প্রভৃতি গাছ অধিক পরিমাণে জন্মে।

(২) **পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল**—**হিন্দুকুশ-সফেদকোহ্, সুলেমান ও খিরথর** পর্বত এই অঞ্চলে অবস্থিত। হিন্দুকুশ **পামিরগ্রন্থির** পশ্চিমে। সুলেমান ও খিরথর পর্বত আরব সাগরের উপকূল অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। সুলেমানের প্রধানশৃঙ্গ **তখ্‌ৎ-ই-সুলেমান** (১১,৫০০ ফুট)।

এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অনেক গিরিপথ আছে। তাহার মধ্যে তিনটি

প্রধান—(ক) **খাইবার গিরিপথ**—হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। ইহাই কাবুল যাইবার পথ। (খ) **গোমাল গিরিপথ**—ডেরা ইসমাইল খাঁ শহর হইতে এই পথে ওয়াজিরিস্তানে যাওয়া যায়। (গ) **বোলান গিরিপথ**—খিরথর পর্বত ও সুলেমান পর্বতের এক অংশের মধ্যে অবস্থিত।

সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের ঝিলম, আটক্ ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলা এবং সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিম অংশ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে।

(৩) **মালভূমি অঞ্চল**—ইহা ইরাণের মালভূমিরই অংশবিশেষ। উচ্চতা ২০০০ হইতে ৬০০০ ফুট। বেলুচিস্তান ও কালাত এই অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত অল্প। কোন বড় নদী না থাকায় জলসেচনের ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। লোকবসতি অত্যন্ত অল্প।

(৪) **সিন্ধু-অববাহিকার সমভূমি**—পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ এবং সিন্ধু প্রদেশ এই অঞ্চলে অবস্থিত। বৃষ্টিপাত বেশী নয়; কিন্তু জলসেচনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। সেজন্য অধিকাংশ স্থানে যথেষ্ট কৃষিকার্য হইয়া থাকে।

নদ-নদী

পদ্মা—গঙ্গা-নদী পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকটে **ভাগীরথী ও পদ্মা** নামে দুই অংশে ভাগ হইয়াছে। পদ্মা রাজসাহীর (রামপুর-বোয়ালিয়া) দক্ষিণ-পূর্ব অবধি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমা নির্দেশ করিতেছে; ইহার পর পদ্মা গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা **যমুনার** সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত নদী আরও দক্ষিণে চাঁদপুরের নিকট **মেঘনার** সহিত মিশিয়াছে। অতঃপর উহা মেঘনা নামে অভিহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **রাজসাহী, গোয়ালন্দ** প্রভৃতি শহর পদ্মাতীরে অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র-নদ—ভারতের আসাম রাজ্য অতিক্রম করিয়া রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার নিকটে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর

ময়মনসিংহ শহরের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা। **তিস্তা, আত্রেয়ী, করতোয়া** প্রভৃতি প্রধান উপনদী। **জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র- ও যমুনা-তীরবর্তী প্রধান শহর।

সিন্ধু—পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নদ। ইহা তিব্বতের মালভূমিতে তিনটি জলধারা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাশ্মীরের নাঙ্গাপর্বতকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ইহা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। পাঞ্জাবের আটক শহর ছাড়াইয়া উহা সমভূমিতে নামিয়াছে। অতঃপর সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণতটে **গিলগিট, শ্যোক, কাবুল, কুরুম** ও **গোমাল** নদী এবং বামতটে **বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু** ও **বিপাশা** নদী সিন্ধুর জলধারার সঙ্গে মিশিয়াছে। শেষোক্ত পাঁচটি নদীর মিলিত প্রবাহ **পঞ্চনদ** নামে অভিহিত হয় এবং ইহা হইতেই পাঞ্জাব নামের উৎপত্তি। বিপাশা পাকিস্তানের নদী নহে—ভারতীয়. পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যেই ঐ নদী শতদ্রুর সহিত মিশিয়াছে। **আটক, ডেরাগাজি খাঁ, সক্কর, হায়দরাবাদ** (সিন্ধু) প্রভৃতি সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নগর ও বন্দর।

নারী, রাখশান, বাদো, মাসকেল প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্বাহিনী নদী। **হিঙ্গল, হাব, দস্ত** প্রভৃতি নদী বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে।

জলবায়ু—পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশ দিয়া কর্কটক্রান্তি-রেখা গিয়াছে; তবু সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্য উষ্ণতা অধিক নহে। জলবায়ু কতকটা সমভাবাপন্ন বলা যায়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রবাহে এখানে প্রচুর-বৃষ্টিপাত (৭৫ হইতে ১০০ ইঞ্চিরও বেশী) হইয়া থাকে। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে বৃষ্টিপাত সামান্যই হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ুর সংঘর্ষে চৈত্র-বৈশাখে কালবৈশাখী এবং আশ্বিন-কার্তিকে আশ্বিনে ঝড় হইয়া থাকে।

পশ্চিম পাকিস্তানের **হিমালয়** ও **অবহিমালয় অঞ্চলে** গ্রীষ্মের প্রকোপ

অপেক্ষাকৃত কম। বৃষ্টিপাত ২০ হইতে ৩০ ইঞ্চি। **পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল** মৌসুমী অঞ্চলের একবারে বাহিরে বলিলেই হয়। বৃষ্টিপাত কোথাও ৩০ ইঞ্চির বেশী নয়। গ্রীষ্মে খুব গরম—তবে উচ্চতার জন্য কোন কোন্ স্থানে উষ্ণতা কিছু কম। শীতে অনেক অঞ্চল তুষারাবৃত হয়। **মালভূমি অঞ্চলও** পূর্বোক্ত পার্বত্য অঞ্চলের মতো। শীতকালে ভয়ানক শীত, গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম। বৃষ্টিপাত কোন স্থানেই ৮ ইঞ্চির বেশি নয়। **সমভূমি অঞ্চলের** মধ্যে পাঞ্জাবের পূর্বভাগে মৌসুমীবায়ুর প্রভাব সামান্যই। লাহোরে বৃষ্টিপাত ২০ ইঞ্চি। রাওয়ালপিণ্ডির পশ্চিমে শীতকালে ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। সিন্ধুপ্রদেশের বায়ু শুষ্ক ও সর্বাধিক উষ্ণ। জেকোবাবাদ শহরের উষ্ণতা ১২৭° পর্যন্ত হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অতি সামান্য।

উৎপন্ন দ্রব্য

অরণ্যসম্পদ—পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর ভাগে শাল, গজারি এবং দক্ষিণ ভাগে গরান, গামার প্রভৃতি পর্ণমোচী গাছ জন্মে। পূর্বদিকের পার্বত্য অংশে জারুল, গর্জন, বাঁশ, বেত প্রভৃতি জন্মে। সুন্দরবনের সুন্দরীগাছ সুবিখ্যাত।

পশ্চিম পাকিস্তানের পার্বত্য অংশে দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই সকল গাছে খেলার সরঞ্জাম তৈয়ারী হয়। সিন্ধুর মরুপ্রায় অঞ্চলে কাঁটাগাছ এবং মালভূমি ও সমভূমিতে তৃণ জন্মে। পাকিস্তানের বনভূমির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি বিঘা।

কৃষিজ সম্পদ—কৃষিকার্য প্রধানত ভূমিপ্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের উপত্যকা অঞ্চল কৃষির বিশেষ উপযোগী। পূর্ব পাকিস্তানের উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ু কৃষির বিশেষ সহায়ক। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে জলসেচ ভিন্ন কৃষিকার্য প্রায় অসম্ভব।

পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। তবু কৃষিযোগ্য ভূমির অন্তত এক-পঞ্চমাংশ এখনও পতিত রহিয়াছে। দেশবাসীর ক্ষুধা

মিটাইয়াও খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকে, উহা বাহিরে রপ্তানি হয়। পাকিস্তানের প্রধান ফসলগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—
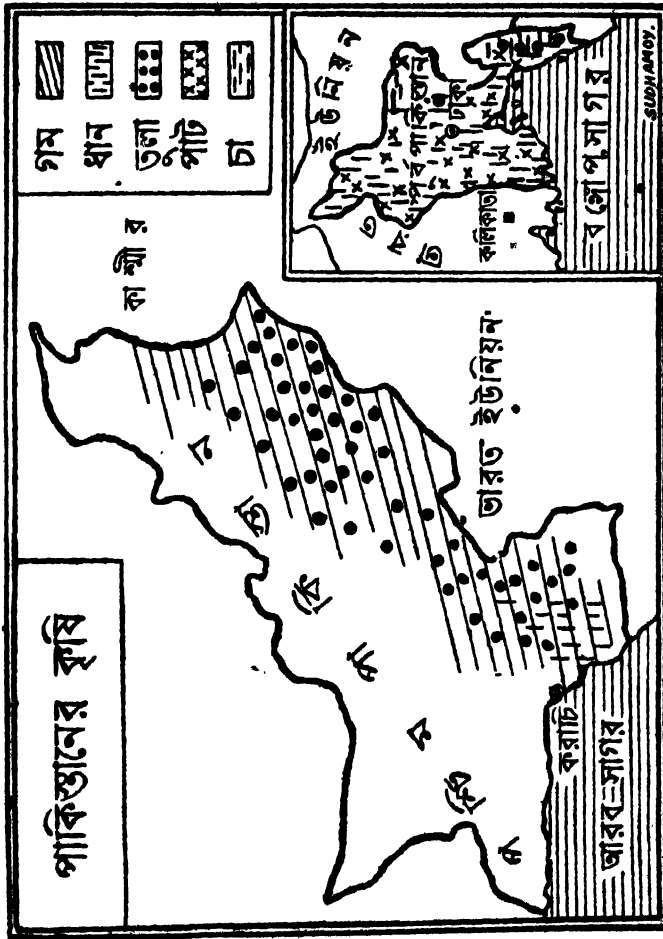
১০২নং চিত্র—পাকিস্তানের কৃষি

ধান—সর্বপ্রধান কৃষিজ দ্রব্য। পূর্ববঙ্গে ইহা সর্বাধিক উৎপন্ন হয়। বাখরগঞ্জ জেলা ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে জলসেচের সাহায্যে সামান্য পরিমাণে জন্মে।

গম—পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বপ্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। পাঁঞ্জাবে সবচেয়ে বেশী গম জন্মে। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও জন্মিয়া থাকে।

বাজরা, জোয়ার, রাগি—সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে ইহার কিছু কিছু হয়।

ভুট্টা—পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে।

যব—পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও পূর্ববঙ্গে জন্মে।

ডাল-কলাই—পূর্ব পাকিস্তানে প্রধানত মুগ, মটর, মসুর এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে ছোলা ও অড়হর উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজ—পূর্ববঙ্গে তিল, পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাবে সরিষা ও তিসি, এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে তুলাবীজ উৎপন্ন হয়। কিছু কিছু চিনাবাদামও জন্মে।

ইক্ষু—পূর্ববঙ্গে ঢাকা, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি জেলায়, পাঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মর্দান জেলায় প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। তবু পাকিস্তানে প্রয়োজনের অনুরূপ চিনি তৈয়ারী হয় না—বিদেশ হইতে বহুপরিমাণে আমদানি করিতে হয়।

পাট—পূর্ববঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পাট জন্মে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, রংপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পাটের চাষ হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে পাটকল নাই, সেজন্য প্রায় সমস্ত পাট বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে অচিরে একাধিক পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তুলা—পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে জলসেচের দ্বারা প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। ইহার অধিকাংশই উৎকৃষ্ট আঁশযুক্ত। তুলা হইতে মিহি কাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গে মধুপুরের বনাঞ্চলে (ময়মনসিংহ জেলা) ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু তুলার চাষ হইতেছে।

শণ—পাকিস্তানে সামান্য পরিমাণে শণ জন্মে।

তামাক—পূর্ববঙ্গে রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে। চট্টগ্রামেও তামাকের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মর্দান জেলায় ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ হইতেছে।

পান—পূর্ববঙ্গে প্রচুর পান জন্মে।

চা—পাকিস্তানের মধ্যে কেবল পূর্ববঙ্গেই চা জন্মে। চট্টগ্রাম, উত্তর ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে ৭½ লক্ষ একর জমিতে চা-বাগান আছে।

পাকিস্তানে প্রচুর ফল জন্মে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানে আঙুর, বেদানা, আপেল, পীচ, তরমুজ যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

সেচব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেজন্য কৃষিকার্যে জলসেচের প্রয়োজন হয় না। তাই এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সেচব্যবস্থা নাই।

কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে জলসেচ ভিন্ন কৃষিকার্য সম্ভব নয়। সেখানে অতি উন্নত রীতির জলসেচনের ব্যবস্থা আছে।

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) প্রদেশটি কৃত্রিম খালের দেশ বলা চলে। এই পরিমাণ স্থানের মধ্যে এত অধিক খালের সু-সমাবেশ পৃথিবীর কোথাও নাই। জলসেচব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর পাঞ্জাব অতুল কৃষিসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সব মরুপ্রায় অঞ্চলে পূর্বে ইতস্তত দুই-চারিটি কাঁটাঝোপ দেখা যাইত, এখন সেখানে বিখ্যাত গম-উৎপাদক অঞ্চল এবং লায়ালপুরের মত শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। লায়ালপুরে কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার কলেজ আছে।

পাঞ্জাবের নিম্নলিখিত স্থায়ী খালগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) **উচ্চ চন্দ্রভাগা খাল** (Upper Chenub Canal)—চন্দ্রভাগা হইতে জল লইয়া চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীমধ্যস্থ জমিতে জলসেচন করে। ইহা ইরাবতী পার হইয়া গিয়াছে; নিম্নভাগে গিয়া নিম্ন বড়ি-দোয়াব খাল নাম লইয়াছে।

(২) **নিম্ন চন্দ্রভাগা খাল**—(Lower Chenub Canal)—চন্দ্রভাগার জল লইয়া লায়ালপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে জলসেচন করিতেছে। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম সেচব্যবস্থার একটি। বিশাল মরুপ্রায় অঞ্চল জলসেচনের ফলে

শস্যশ্যামল ও সমৃদ্ধিবান হইয়াছে। আগে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে ১০।১২ জন বাস করিত, এখন সেখানে লোকবসতি ৩০০ জনেরও বেশী।

(৩) **নিম্ন বড়ি দোয়াব খাল**—(Lower Bari Dwab Canal)—উচ্চ চন্দ্রভাগা খাল ইরাবতী পার হইবার পর এই নামে অভিহিত হয়।

(৪) **উচ্চ বিতস্তা খাল**—(Upper Jhelum Canal) শুরু হইয়াছে কাশ্মীরের মঙ্গলা নামক স্থান হইতে বিতস্তা নদীর জল লইয়া ইহা বিতস্তা-চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সিঞ্চন করিতেছে।

(৫) **নিম্ন বিতস্তা খাল**—(Lower Jhelam Canal) বাহির হইয়াছে রসুল নদী হইতে। বিতস্তার জল লইয়া ইহা পাঞ্জাব (পাকিস্তান) প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগ সিক্ত করে।

(৬) **সেচত্রয়ী** (Triple Project)—অধিকতর জল সরবরাহের জন্য নিম্ন বড়ি-দোয়াব খালকে উচ্চ চন্দ্রভাগা খালের সহিত এবং নিম্ন চন্দ্রভাগা খালকে উচ্চ বিতস্তা খালের সহিত সুকৌশলে যুক্ত করা হইয়াছে। ইহা সেচব্যবস্থার আধুনিকতম নিদর্শন। মাত্র পনের বৎসর আগে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

পাঞ্জাবের জলসেচ-সাফল্যের কারণ—

(১) পাঞ্জাবের নদীগুলি হিমবাহপুষ্ট। এজন্য সারা বৎসরই প্রচুর জল থাকে।

(২) সমভূমি অঞ্চল নরম পলিমাটি দিয়া গড়া; অল্পব্যয়েই এখানে খাল কাটা যায়।

(৩) নদীগুলি সমভূমি অঞ্চলে হাতের আঙুলের মত ছড়াইয়া আছে। খাল কাটিয়া সহজেই উহাদের সংযুক্ত করা হইয়াছে, এবং এই উপায়ে নদী-মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে জলসিঞ্চন হইতেছে।

(৪) পলিগঠিত ভূমি অত্যন্ত উর্বর। শুধু জলের অভাবেই ফসল হইত না। এখনও প্রচুর জল পাইয়া সারা অঞ্চল শস্যসমৃদ্ধ হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশের সেচব্যবস্থা—স্কুর শহরের নিকটে সিন্ধু নদে এক সুবৃহৎ বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর কীর্তি—পৃথিবীর একটি বৃহত্তম

বাঁধ। বোম্বাইয়ের তদানীন্তন লাট স্যার জর্জ লয়েডের নাম অনুসারে ইহা **লয়েড ব্যারেজ** নামে অভিহিত হয়; ইহাকে **স্থক্কুর বাঁধ**ও বলে। এই বাঁধের জলাশয় হইতে স্থক্কুর, জামরাও, মিথরাও, নাসরাত প্রভৃতি খালের সাহায্যে প্রায় ৮০০০ বর্গমাইল জমিতে জলসেচন হয়। এই মরুপ্রায় প্রদেশে জলসেচ ভিন্ন আদৌ কৃষিকার্য হইতে পারে না। সেজন্য দেশে যত কৃষিভূমি আছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে।

বেলুচিস্তানের সেচ-ব্যবস্থা—এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের জল মাটিতে নামিতে নামিতে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য শুকাইয়া যায়। সেজন্য **ক্যারেজ** (Karez)-প্রণালী দ্বারা সেচকার্য হইয়া থাকে। ক্যারেজ হইল পাকা গাঁথুনির আবরণযুক্ত পয়ঃপ্রণালী। ক্যারেজের ভিতর দিয়া জল কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সেচ-ব্যবস্থা—পেশোয়ার উপত্যকায় কাবুল নদীর দ্বারা এবং বান্নু উপত্যকায় কুরম নদীর দ্বারা সেচকার্য হইয়া থাকে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন—পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মালাকাণ্ডে স্বাত নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। উহা হইতে মাত্র ৯০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পেশোয়ার ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সরবরাহ হইয়া থাকে।

নূতন পরিকল্পনা

ওয়ারসাক পরিকল্পনা (Warsak Project)—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই পরিকল্পনা হইতেছে। ইহা দ্বারা কাবুল নদী হইতে ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহা পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলে শিল্পোন্নতির সাহায্য করিবে। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে মুল্লাগোরিয়া ও আফ্রিদি উপজাতিদ্বয়ের এবং বামতীরে মোহমন্দ উপজাতির প্রায় ৬৫ হাজার একর জমিতে জলসেচও হইবে। পেশোয়ারের নিকটস্থ রুক্ষ পর্বতের ঢালে জল বহাইয়া অরণ্যসৃষ্টি হইবে।

থল পরিকল্পনা (Thal Project)—এই পরিকল্পনা অনুসারে কালাবাগ

নামক স্থানে সিন্ধু নদের একটা খাল খণিত হইবে। ইহাতে সিন্ধু সাগর দোয়াবের ২ লক্ষ একর জমি জলসিঞ্চিত হইবে এবং ৭৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে।

কর্ণফুলী পরিকল্পনা (Karnafuli Project)—কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম পাহাড় হইতে উদ্ভূত। ইহার অববাহিকায় অত্যধিক বৃষ্টি (প্রায় ১৫০ ইঞ্চি) হয় এইজন্য মাঝে মাঝে বন্যা হইয়া থাকে। নূতন পরিকল্পনার ফলে বন্যারোধ এবং ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন হইবে।

খনিজ সম্পদ—পাকিস্তানের খনিজ সম্পদ অধিক নহে। ইহার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমানে ভূতাত্ত্বিকেরা অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন ; আশা করা যায়, অচিরের আরও কিছু আকরিকের সন্ধান মিলিবে। বর্তমানে নিম্নোক্ত পদার্থগুলি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় :—

কয়লা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বোধনীতে (কোহাট), পাঞ্জাবের ঝিলম জেলায় ও বেলুচিস্তানে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। পেশোয়ার জেলায় একটি নূতন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চট্টগ্রামের নিকটেও একপ্রকার বাদামি রঙের নিকৃষ্ট কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

লবণ—পাঞ্জাবের লবণ পর্বত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট অঞ্চল খনিজ-লবণের (Rock Salt) প্রধান কেন্দ্র। লবণ-পর্বতের খেওড়া খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। সিন্ধু প্রদেশের মৌরিপুরে এবং চট্টগ্রামে কক্সবাজারে সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ম—পাঞ্জাবের আটক, মিনাওয়ালি, রাওয়ালপিণ্ডি, শাহ্‌পুর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে পাওয়া যায়।

ক্রোমাইট—বেলুচিস্তানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও সামান্য মিলে।

গন্ধক—বেলুচিস্তানে পাওয়া যায়।

আকরিক আর্সেনিক—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চিত্রলের নিকট মিলে। ইহা ছাড়া **জিপসাম, চুনাপাথর, চিনামাটি** প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের নানাস্থানে অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

শিল্পজ সম্পদ—কাঁচা মালের প্রাচুর্য সত্ত্বেও পাকিস্তান শিল্পে তেমন সমৃদ্ধ নয়। ইদানীং শিল্পোন্নতির প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, অতি শীঘ্র বহু অঞ্চল শিল্প-প্রধান হইয়া উঠিবে। ঢাকার মসলিন কাপড় এক সময়ে পৃথিবীবিখ্যাত ছিল। এখনও **কুটিরশিল্প** হিসাবে বিভিন্ন স্থানে তাঁতের কাপড়, পাথর, কাঠ ও মাটির জিনিস, পিতল-কাঁসার বাসন, বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈয়ারী হইয়া থাকে।

যন্ত্র-শিল্পের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

কাপড়ের কল—মোট ১৪টি আছে। অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত।

পশমশিল্প—২টি কল আছে। একটি পূর্ব পাকিস্তানে, অপরটি পাঞ্জাবে অবস্থিত।

চিনির কল—১১টি আছে। পূর্ব পাকিস্তানে ৬টি, পাঞ্জাবে ৪টি ও সীমান্ত প্রদেশের মর্দানে ১টি অবস্থিত। মর্দানের কলটি এশিয়ার মধ্যে অন্যতম প্রধান হইয়া উঠিতেছে।

সিমেণ্টের কারখানা—৪টির মধ্যে ২টি সিন্ধু প্রদেশে, ১টি পাঞ্জাবে ও ১টি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত।

সাবানের কারখানা—৪টির মধ্যে ১টি পূর্ব পাকিস্তানে, ১টি পাঞ্জাবে ও ২টি সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত।

রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা—৩টির মধ্যে ২টি পাঞ্জাবে ও ১টি সিন্ধুতে অবস্থিত।

দিয়াশলাইয়ের কল—৪টির মধ্যে ২টি ঢাকায় ও ২টি পাঞ্জাবে অবস্থিত।

পূর্ববঙ্গে অনেক **কাপড়ের কল** আছে। পেশোয়ারে একটি **চিনামাটির কারখানা** এবং নওশেরায় একটি নূতন **ট্যানিং কারখানা** স্থাপিত হইয়াছে। পেশোয়ারে এতদ্ভিন্ন একটি **সংরক্ষিত ফলের কারখানা** ও একটি **ঔষধ তৈয়ারীর কারখানা** ভাল চলিতেছে।

চট্টগ্রামে অতি শীঘ্রই ৩টি **পাটের কল** এবং চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির মধ্যবর্তী কপ্তাইমুক নামক স্থানে ৩টি **কাগজের কল** প্রতিষ্ঠিত হইবে।

লোকবসতি

১৯৫১ সালেব লোকগণনা অনুসাবে পাকিস্তানেব .লোকসংখ্যা ৭৫,৮৪২,১৬৫। পূর্ব-পাকিস্তান সুজলা, সুফলা, তাই পূর্ব পাকিস্তানেই লোক-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। পাকিস্তানে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পূর্ব-পাকিস্তান	৪২,০৬২,৬১০
পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুব	২০,৬৫১,১১০
উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫,-৯৯,২০৫
সিন্ধু ও খৈবপুব	৪,৯২৮,০৫৭
বেলুচিস্তান	১,১৭৪,০৩৬
কবাচী অঞ্চল	১,১২৬,৪১৭

যাতায়াতের উপায়

স্থলপথ—স্থলপথেব, পবিমাণ প্রায ৫০ হাজাব মাইল। পাঞ্জাবেব মধ দিয়া পেশোয়াব অবধি **গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের** যে অংশ গিয়াছে, উহাই প্রধানতম। বেলুচিস্তানেব কোয়েটা ও চমন হইতে, উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেব ডেবা ইসমাইল খাঁ ও পেশোয়াব হইতে, এবং পাঞ্জাবেব আটক হইতে ইবাণ ও আফগানিস্তানে যাইবাব জন্য কতকগুলি ভাল বাস্তা আছে

পূর্ব-পাকিস্তানে নদী-খাল-বিলেব জন্য ভাল বাস্তা বেশী নাই। কলিকাতা হইতে যশোহব হইয়া খুলনা অবধি **যশোহর রোড** গিযাছে। **নর্থ বেঙ্গল হাইওয়ে** (North Bengal Highway) উত্তববঙ্গেব মধ্য দিয়া দার্জিলিং বোডের সঙ্কীর্ণ পথ চট্টগ্রাম হইতে আবাকান পযন্ত গিযাছে।

নদীপথ—পূর্ব পাকিস্তানেব নদীগুলি নাব্য। এই অঞ্চলে নৌকা-স্টীমাবে প্রভৃত গতাযাত ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। গোয়ালন্দ, নাবায়ণগঞ্জ, সিবাজগঞ্জ, চাঁদপুব, খুলনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নদীবন্দব। পশ্চিম পাকিস্তানেব সিন্ধু নদ মোহনা হইতে প্রায় হাজাব মাইল অবধি নাব্য। কিন্তু ঐ অঞ্চলে মানুষ নদীপথে বেশী যাতায়াত করে না।

রেলপথ—পাকিস্তানে রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬৭৫০ মাইল; প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ২ মাইল মাত্র।

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলপথ (E. B. R.)—পূর্বতন আসাম-বেঙ্গল রেলপথের যে অংশ পাকিস্তানে পড়িয়াছে, তাহার এই নাম হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে ইহাই একমাত্র রেলপথ। বাণপুরের পর হইতে হলদিবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দ, আমনুরা পর্যন্ত; বেনাপোল হইতে খুলনা, বাগেরহাট পর্যন্ত; এবং চাঁদপুর, লাকসাম, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, দোহাজারি, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়া যে রেলপথ গিয়াছে, সমস্ত ইহার অন্তর্গত। পদ্মার উপরে বিখ্যাত **হার্ডিঞ্জ ব্রিজ** এই রেলপথে অবস্থিত।

সম্প্রতি দর্শনা হইতে যশোহর অবধি একটি নূতন রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দর্শনা হইতে কোটচাঁদপুর অবধি গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলপথ (N. W. R.)—পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র রেলপথ। বহু শাখা-প্রশাখা আছে। করাচী হইতে একটি শাখা পেশোয়ার ও একটি লাহোর গিয়াছে। লাহোর হইতে ওয়াজিরাবাদ ও রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া যায়। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে কোহাট যাওয়া যায়। এক শাখা লাহোর হইতে বেলুচিস্তানে—ইরাণ-সীমান্তে জহিদান অবধি বিস্তৃত। আটক, মিনাওয়ালি, মুলতান, জেকোবাবাদ, শিবি, কোয়েটা, হায়দরাবাদ (সিন্ধু) প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

বিমানপথ—করাচী আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি। বৃটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. O. A. C.), প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ (P. A. A.), এয়ার ফ্রান্স, ট্রান্স-ওয়ালর্ড এয়ারওয়েজ (T. W. A.), ইত্যাদি বহু বিদেশী কোম্পানির বিমানপোত করাচী দিয়া যাতায়াত করে। এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশন্যাল, ভারত এয়ারওয়েজ, এয়ার সার্ভিসেস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি ভারতীয় কোম্পানির বিমানপোত পাকিস্তানে যায়। পাকিস্তানের প্রধান দুইটি বিমান-প্রতিষ্ঠান—**ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ** ও **পাক এয়ার সার্ভিসেস**। ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ কোম্পানির বিমানপোত কলিকাতা,

চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, রেঙ্গুন, করাচী, পেশোয়ার, বোম্বাই, তেহ্‌রান প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। পাক এয়ার সার্ভিসেসের বিমানপোত করচী, লাহোর, দিল্লী, পেশোয়ার, কায়রো, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে যায়।

বন্দর

জলপথে বহির্বাণিজ্য করাচী ও চট্টগ্রাম এই দুই বন্দর হইতে সম্পন্ন হয়।

করাচী—সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান বন্দর। ইহা সিন্ধু-নদের মোহানা হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পোতাশ্রয় কৃত্রিম। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। গম, কার্পাস, পশম, তৈলবীজ, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি এখান হইতে রপ্তানি হয়; কার্পাস বস্ত্র, কলকব্জা, পেট্রোলিয়াম, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ি ইত্যাদি প্রধানত আমদানি হয়।

চট্টগ্রাম—কর্ণফুলী নদীর মোহানা হইতে দশ মাইল দূরে ঐ নদীর উপর অবস্থিত বন্দর। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ হইতে বহু দূরবর্তী হওয়ায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই বন্দরের বিশেষ গুরুত্ব হইয়াছে। এককোটি টাকা ব্যয়ে এখানে বিশাল মালগুদাম ও জেটি তৈয়ারী হইতেছে। এখান হইতে পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি রপ্তানি হয়। ধান, গম, কাগজ, কলকব্জা প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে।

খুলনা জেলার চালনা নামক স্থান হইতে কিছুদূরে নূতন একটি বন্দর নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে।

পাকিস্তানের প্রধান প্রধান নগর

করাচী—পাকিস্তান-রাষ্ট্রের রাজধানী, সর্বপ্রধান বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি ও রেলপথের কেন্দ্র। ইহা একটি প্রধান লবণ-উৎপাদন কেন্দ্র। এই নগরের শাসনব্যবস্থা সিন্ধু প্রদেশ হইতে পৃথক। এখানে চীফ কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **হায়দরাবাদ** শিল্পবাণিজ্য ও রেলপথের কেন্দ্র এবং প্রাচীন রাজধানী। **শিকারপুর** উত্তর অঞ্চলের বাণিজ্য ও রেলপথের কেন্দ্র।

লাহোর—পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী। ইহা কয়েকটি রেলপথের মিলনস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **লায়ালপুরে** কৃষিবিদ্যালয় ও কাপড়ের কল আছে। **রাওয়ালপিণ্ডি ও আটক** সেনানিবাস; পেট্রোলিয়মের খনি আছে। **শিয়ালকোট** সেনানিবাস; খেলার সরঞ্জাম তৈয়ারীর জন্য প্রসিদ্ধ। **মুলতান** সেনানিবাস ও বাণিজ্যকেন্দ্র। **ডেরা-গাজি খাঁ, কালাগ** প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। **মুরি** স্বাস্থ্যনিবাস।

পেশোয়ার—খাইবার গিরিপথের অদূরে অবস্থিত। এখান হইতে ঐ গিরিপথের মধ্য দিয়া কাবুল যাওয়া যায়। প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস। সম্প্রতি এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কুরুমের তীরবর্তী **বান্নু,** সিন্ধুনদের তীরবর্তী **ডেরা-ইসমাইল খাঁ,** পেশোয়ারের দক্ষিণে অবস্থিত **কোহাট** বাণিজ্যকেন্দ্র ও সেনানিবাস। চিত্রলের তীরবর্তী **চিত্রল,** পাঁজকোবার তীরবর্তী **দির,** স্বাতের তীরবর্তী **স্বাত** এই প্রদেশ-সংলগ্ন ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের প্রধান নগর। ইহারা সকলেই পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে।

কোয়েটা—বোলান গিরিপথের অদূরে অবস্থিত সেনানিবাস। এখানে একটি সামরিক বিদ্যালয় আছে। কোয়েটা হইতে আফগানিস্তান ও ইরাণ-সীমান্ত পর্যন্ত উট চলিবার রাস্তা ও রেলপথ আছে। **সিবি** নারী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত সেনানিবাস। **কালাত** কোয়েটার দক্ষিণে অবস্থিত কালাত রাজ্যের রাজধানী। **গোয়াদর** আরবসাগরের উপকূলে অবস্থিত বন্দর।

পূর্ব পাকিস্তানের নগরগুলির বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

বাণিজ্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের অনেক অসুবিধা। সেজন্য উভয় অংশে **অন্তর্বাণিজ্য** আশানুরূপ হইতেছে না। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে চাউল, গম, লবণ ইত্যাদি এবং পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রধানত চা রপ্তানি হইয়া থাকে।

স্থলপথে বহির্বাণিজ্য প্রধানত ভারতের সহিত হইয়া থাকে। ভারত হইতে কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, সরিষার তেল, লোহা ও ইস্পাতের জিনিস, রবার, ইত্যাদি পাকিস্তান খরিদ করে। পাকিস্তান হইতে ভারতে পাট, কার্পাস, খনিজ লবণ প্রভৃতি আমদানি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত ইরাণ ও আফগানিস্তানের এবং পূর্ব পাকিস্তানের সহিত ব্রহ্মদেশেরও কিছু কিছু স্থলবাণিজ্য চলে।

জলপথে বহির্বাণিজ্য প্রধানত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে চলে।

পাকিস্তানের আমদানী দ্রব্যের মধ্যে **বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, লৌহ** ও **ইস্পাত, মোটরগাড়ি কাগজ** ও **বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম** প্রধান।

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে **পাট, তুলা, পশম, চর্ম** ও **চা**-ই প্রধান।

পূর্ববঙ্গ *(পূর্ব-পাকিস্তান)*

বাংলাদেশ খণ্ডিত হইয়া যে অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে, তাহাই পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। ইহার উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার।

অবিভক্ত বাংলার সমগ্র **ঢাকা বিভাগ** ও **চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, পাবনা** ও **রাজসাহী** জেলা, **দিনাজপুর** জেলার আতাওয়ারি, বালিয়াডাঙি, ঠাকুরগাঁ, রাণীশঙ্কেল, হরিপুর, পীরগঞ্জ, খানসামা, কাহারুল, পার্বতীপুর, চিড়ির বন্দর, দিনাজপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ফুলবাড়ি, বিড়ল, বোচাগঞ্জ, ধামাইর হাট, পত্নীতলা, পোরসা ও বীরগঞ্জ থানা; **মালদহ** জেলার গোমস্তাপুর, নিচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভোলাহাট থানা; **জলপাইগুড়ি** জেলার তেঁতুলিয়া, পচাগার, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম, থানা এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ভিন্ন অবিভক্ত বাংলার প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমগ্র **খুলনা** জেলা, বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা বাদে **যশোহর** জেলা,

নদীয়া জেলার খোকসা, কুমারখালি, বীরপুর, কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, গাঙনি, জীবননগর, দামুরহুদা, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙা থানা এবং দৌলতপুর থানার মাথাভাঙা নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল (ইহাদের লইয়া নূতন **কুষ্টিয়া** জেলা হইয়াছে) পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে গিয়াছে। পূর্বতন প্রেসিডেন্সি বিভাগের এই অংশগুলি বর্তমানে রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বতন আসাম প্রদেশের **শ্রীহট্ট** জেলার পাথরকান্দি, রাতাবারি, করিমগঞ্জ, বদরপুর এই চারিটি থানা ভিন্ন বাকি অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে গিয়াছে। এই জেলাটি এখন চট্টগ্রাম বিভাগেব অন্তর্ভুক্ত।

প্রাকৃতিক বিভাগ—পূর্ববঙ্গের নিম্নোক্তরূপ প্রাকৃতিক বিভাগ হইতে পারে ঃ—

(১) **পার্বত্য অঞ্চল**—চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহের গারো পাহাড় ইহার অন্তর্গত। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় সর্বোচ্চ (৪০০০ ফুট)।

(২) **প্রাচীন পাললিক অঞ্চল**—রাজসাহী বিভাগের পদ্মার উত্তরে এই অঞ্চল অবস্থিত। বরেন্দ্রভূমি ও চলন বিল ইহার অন্তর্গত।

(৩) **প্রাচীন ব-দ্বীপ**—পদ্মার দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ এই বিভাগের মধ্যে পড়ে। মধুপুরের ঢেউখেলানো আরণ্যভূমি ও ভাওয়ালের গড় এখানে অবস্থিত।

(৪) **নূতন ব-দ্বীপ**—পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার উপকূলভাগ ভগ্ন; অনেক নদীখাল ও দ্বীপ আছে। হাতিয়া, সন্দ্বীপ, দক্ষিণ সাহাবাজপুর, কুতুবদিয়া, মহেশখালি প্রভৃতি দ্বীপ প্রসিদ্ধ। সুন্দরবন এই অঞ্চলে অবস্থিত।

নদী—পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা, আত্রেয়ী, করতোয়া, প্রভৃতি নদী প্রধান। ইহাদের বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। **মহানন্দা** ও **পূর্ণানাভ** পদ্মার উপনদী এবং **ভৈরব, জলঙ্গী, গড়ই** (গৌরী), **হরিণঘাটা, মাথাভাঙা, অড়িয়ল খাঁ** শাখানদী। পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলে **কর্ণফুলী** প্রবহমান।

জলবায়ু—পূর্ববঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র—প্রচুর বৃষ্টিপাত ও সমুদ্র-সান্নিধ্যের জন্যই কতকটা সমভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। শীত ও গ্রীষ্মে

উষ্ণতার পার্থক্য ১০।১২° ডিগ্রির বেশি হয় না। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়; শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিশেষ বৃষ্টি হয় না। কর্কটক্রান্তি-রেখা এই প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গিয়াছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—কৃষিজ ঃ পাট ও ধান সর্বাধিক উৎপন্ন হয়। সমগ্র পৃথিবীতে যত পাট জন্মে, তাহার শতকরা ৭০ ভাগ এখানে জন্মে। উচ্চ-ভূমিতে তামাক, আখ ও নানা প্রকার রবিশস্য উৎপন্ন হয়। শ্রীহট্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চা এবং শ্রীহট্টে কমলালেবু উৎপন্ন হয়। উপকূলভাগে নারিকেল, সুপারি, তাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। **খনিজ ঃ** চট্টগ্রামে সামান্য কয়লা ও শ্রীহট্টে চুনাপাথর পাওয়া যায়। **বনজ ঃ** সুন্দরবনের সুন্দরী, গরান, গেঁউয়া ও চট্টগ্রামের জঙ্গলে জারুল, বাঁশ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় গজারি গাছের জঙ্গল ও দিনাজপুর জেলায় শালবন দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র অল্পবিস্তর বেত জন্মে। **শিল্পদ্রব্য ঃ** কুটির-শিল্পের মধ্যে বাগেরহাট, ঢাকা ও ফেণীর তাঁতের কাপড়, ইসলামপুরের (ময়মনসিংহ) পিতল-কাঁসার বাসন, ঢাকার শাঁখা সুপ্রসিদ্ধ। যন্ত্রশিল্পের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল, ঢাকায় দিয়াশলাইয়ের কারখানা, যশোহরে চিরুনির কারখানা, দর্শনা, চরসিন্দুর প্রভৃতি স্থানে চিনির কল এবং বহু স্থানে চাউলের কল আছে।

নগর—ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী; মুসলমানযুগের প্রাচীন শহর; বিবিধ শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। **নারায়ণগঞ্জ** ঢাকার অনতিদূরে শীতলক্ষ্যা-তীরে অবস্থিত নদীবন্দর। পাট, শিমুলতুলা, চামড়া ও তৈলবীজের বাণিজ্যকেন্দ্র। কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। **চট্টগ্রাম** সমুদ্র হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত কর্ণফুলীর তীরবর্তী বন্দর। যমুনার তীরে **সিরাজগঞ্জ**, পদ্মার তীরে **গোয়ালন্দ** ও মেঘনার তীরে **চাঁদপুর** নদীবন্দর। **খুলনা** রেলওয়ে ও স্টীমার স্টেশন এই স্থানও নদীবন্দররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। **শ্রীহট্ট** চুন, চা ও কমলালেবুর জন্য বিখ্যাত। **কক্সবাজার** সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান।

প্রশ্নাবলী

১। ভারতকে কয়টি ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা যায় বল। প্রত্যেক বিভাগের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ বর্ণনা কর।

২। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলির নাম কর এবং উত্তর ভারতের নদীর সহিত দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির তুলনা কর। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৫)

৩। ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। এই সঙ্গে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা সম্বন্ধেও যাহা জান লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৬)

৪। কার্পাস উৎপাদনে দাক্ষিণাত্য বঙ্গদেশ হইতে, গম উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ মাদ্রাজ হইতেও ধান্য উৎপাদনে বঙ্গদেশ পাঞ্জাব হইতে অধিকতর অনুকূল কেন লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৬)

৫। ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পের নাম কর। শিল্পাঞ্চলগুলি কোন কোন স্থানে অবস্থিত বল। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৫)

৬। লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস ও পাটশিল্প ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত এবং কি কারণে সেই সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৪)

৭। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু, কৃষিজদ্রব্য, খনিজদ্রব্য ও শিল্পের সহিত পূর্ব-পাকিস্তানের জলবায়ু, কৃষিজদ্রব্য, খনিজদ্রব্য ও শিল্পের তুলনামূলক বিবরণ লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৪)

৮। বিহার অথবা আসামের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, খনিজদ্রব্য, কৃষি ও নগরসমূহ সম্বলিত একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫২)

৯। জলসেচের প্রয়োজনীয়তা পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বেশী কেন? পশ্চিম পাকিস্তানে কি কি প্রণালীতে ও কোথায় কোথায় জলসেচন করা হয় বর্ণনা কর। (স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৩)

১০। পশ্চিম বাংলার ভূপ্রকৃতি, কৃষি, শিল্প ও নগরসমূহ সম্বলিত একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (কঃ বিঃ ১৯৫০ স্কুঃ ফাঃ ১৯৫৩)

১১। ভারতে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা কেন হয়? ভারতে কি কি উপায়ে কোথায় কোথায় জলসেচ করা হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (কঃ বিঃ ১৯৫১)

১২। ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (কঃ বিঃ ১৯৫০)

১৩। ভারতের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে যাহা জান অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৪। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ? যে-কোন দুইটি পরিকল্পনার বিবরণ দিয়া তাহা বর্ণনা কর।

১৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ— ময়ূরাক্ষী-পরিকল্পনা, ভাখ্‌রা-নঙ্গল পরিকল্পনা, ভিলাইর লৌহ-ইস্পাত শিল্প কারখানা, দুর্গাপুর ব্যারেজ, মহানদী পরিকল্পনা।

১৬। কি, কোথায় ও কেন প্রসিদ্ধ বল—

শ্রীনগর, চণ্ডীগড়, কানপুর, কাশী, জামসেদপুর, বার্নপুর, ডিগবয়, ভুবনেশ্বর, পুরী, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বরোদা, সোলাপুর, বাঙ্গালোর, ভুপাল, গোয়ালিয়র, জয়পুর, ত্রিবান্দ্রম্।

পঞ্চম খণ্ড

মানচিত্র-পঠন ও অঙ্কন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, পর্বত, সাগর, নদী প্রভৃতির সীমা, আয়তন, অবস্থান, পরস্পর দূরবর্তিতা বুঝাইবার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বা উহার অংশ বিশেষের প্রতিকৃতি তৈয়ারী হয়। ছোট জায়গার প্রতিকৃতি **নক্সা** ও বহুবিস্তৃত জায়গার প্রতিকৃতি **মানচিত্র** নামে অভিহিত হয়।

মানচিত্র ও নক্সার আয়তন ছোট করিয়া আঁকিতে হয়। আয়তন যে অনুপাতে ছোট করা হয়, তাহাকে স্কেল (scale) বলে। ১ মাইল দূরত্বকে যদি ১" ইঞ্চির সমান ধরিয়া মানচিত্র আঁকা হয়, তবে মানচিত্রে 'স্কেল—১" ইঞ্চি = ১ মাইল'—এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

স্থলবন্ধুরতা, সাগরের গভীরতা, নদী-সমুদ্রের স্রোত, বায়ুর গতি প্রভৃতিও মানচিত্রে দেখানো হয়। এই সমস্ত দেখাইবার জন্য নানা সঙ্কেত আছে। কিন্তু একই মানচিত্রে সমস্ত দেখাইতে গেলে মানচিত্র দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে ; সেজন্য বিভিন্নরূপ মানচিত্র আঁকিয়া ঐ সমস্ত দেখাইতে হয়।

মানচিত্রের স্থলবন্ধুরতা দেখাইবার জন্য কতকগুলি কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সমোন্নতি রেখা, ভ্রূলেখা এবং রঙের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০৩নং চিত্র—সমোন্নতি রেখা

সমোন্নতি রেখা—সমুদ্র-সমতল হইতে সমোচ্চ স্থানগুলি সরু সরু রেখার দ্বারা সংযুক্ত হয়। উহাই সমোন্নতি রেখা (contour lines)। স্থান অল্প উঁচু হইলে
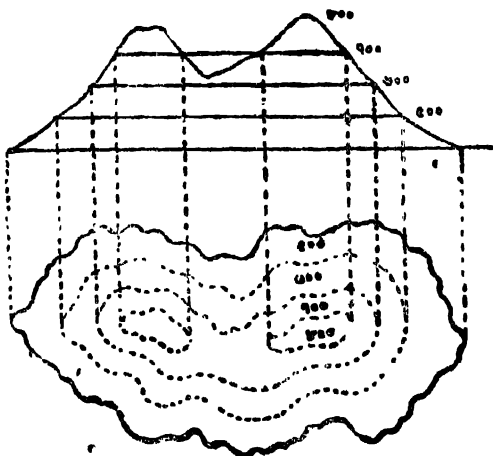
৫০′ বা ১০০′ ফুট অন্তর, বেশী উঁচু হইলে ৫০০′ বা ১০০০′ ফুট অন্তর সমোন্নতি রেখা আঁকা হয়। ভূমি খুব খাড়া হইলে রেখাগুলি অত্যন্ত কাছাকাছি, ভূমি ক্রমোচ্চ হইলে রেখাগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হইয়া থাকে।

১০৪নং চিত্র—ভ্রূলেখা
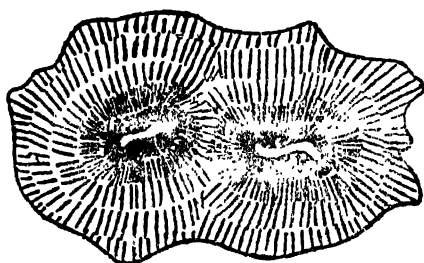
ভ্রূলেখা—হালকা ও গাঢ় ছায়াপাতের দ্বারাও স্থলবন্ধুরতা দেখানো হয়। যেখানে ভূমি অল্প উঁচু সেখানে সামান্য ছায়াপাত, যেখানে বেশি উঁচু সেখানে ঘন ছায়াপাত করিতে হয়। ইহাকে ভ্রূলেখা (Hachures) বলা হয়।

রঙের ব্যবহার—বিভিন্ন রঙের সাহায্যে স্থলবন্ধুরতা দেখানো হইয়া থাকে। কতখানি উচ্চতা বা গভীরতার জন্য কোন্ রঙ ব্যবহৃত হইল, তাহা মানচিত্রের পাশে লেখা থাকে।

জরিপ—ভূমির প্রকৃত পরিমাণ জরিপ করিয়া বাহির করিতে হয়। এক জায়গায় ১ মাইল বা ২ মাইল দীর্ঘ একটি ভূমিরেখা (base line) স্থির করিতে হয়। ভূমিরেখার দুই প্রান্ত হইতে দূরবর্তী একটা স্থান ঠিক করিয়া লওয়া হয় (১০৫নং ছবিটা দেখ) **কপ** ভূমিরেখা। **ক** ও **প** বিন্দু হইতে দূরবর্তী পাহাড়ের চূড়া **গ**-কে
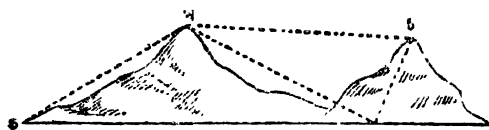
১০৫নং চিত্র

মনোনীত করা হইয়াছে। থিয়োডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে **কপগ** ও **পগক** কোণ দুইটির পরিমাণ পাওয়া যাইবে। তারপর ত্রিকোণমিতির সাহায্যে **পগ** রেখার দৈর্ঘ্য এবং **কপগ** ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কষিয়া বাহির করা যাইবে। এবার **পগ** রেখাকে ভূমিরেখা করা হইল; এবং অপর একটি পাহাড়ের চূড়া **চ**-কে মনোনীত করা হইল। পূর্বোক্ত রীতিতে **পগচ**

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জানা যাইবে। এইরূপ বহু ত্রিভুজে ভাগ করিয়া সমস্ত দেশ জরিপ করা যায় ; ইহাকে **ত্রিভুজকরণ পদ্ধতি** (Triangulation) বলা হয়।

মানচিত্র অঙ্কন—একটি দেশের মানচিত্র উপরোক্ত উপায়ে আঁকা যায়, কিন্তু বর্তুলাকার পৃথিবীর মানচিত্র সমতল কাগজের উপর একেবারে নির্ভুলভাবে আঁকা অসম্ভব। ভূ-গোলকের উপর সমাক্ষরেখা ও মধ্যরেখাসমূহ নির্ভুলভাবে আঁকা থাকে। ঐ রেখাগুলি সমতল কাগজে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করিয়া আঁকিবার জন্য নানা প্রকার **অভিক্ষেপের** (Projection) সাহায্য লওয়া হয়। এই অভিক্ষেপ বা (Map projection) সম্বন্ধে তোমরা পরে আরও বিশদভাবে জানিতে পারিবে। এখানে মানচিত্র অঙ্কনের একটি সহজ উপায় বলিতেছি। মনে কর, ভারতের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে।

একটি ভূচিত্রাবলী বা অ্যাটলাস (Atlae) হইতে ভারতের একটি মানচিত্র বাহির করিয়া উহার উপর লম্বালম্বিভাবে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম কতকগুলি রেখা টানিয়া ইহাকে অনেকগুলি বর্গক্ষেত্রে ভাগ কর। একটি সাদা কাগজের উপর অনুরূপ কতকগুলি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন কর। বিভিন্ন বর্গক্ষেত্রের উপর দিয়া ভারতের সীমারেখা কিরূপভাবে গিয়াছে তাহা মানচিত্রে ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া সাদা কাগজের বর্গক্ষেত্রের উপর অনুরূপ সীমারেখা অঙ্কন করিতে থাক। এইরূপ আঁকিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে ভারতের সম্পূর্ণ সীমরেখা অঙ্কিত হইবে। অন্যান্য দেশের সীমারেখাও এইভাবে আঁকা যায়। এই সহজ উপায়ে তোমরা বিভিন্ন দেশের মানচিত্র অঙ্কন করিতে পার।

প্রশ্নাবলী

১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও—

নক্সা, সমোন্নতিরেখা, মানচিত্রের স্কেল, জলেখা।

২। পঞ্চম খণ্ডে বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী ভারতের একখানা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিতগুলি বসাও—

কলিকাতা, দিল্লী, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, গঙ্গানদী, পশ্চিমঘাট পর্বত, বিশাখাপত্তনম্, কাণ্ডলাবন্দর।

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতের পুনর্গঠিত রাজ্যগুলির বিবরণ

রাজ্যপুনর্গঠন আইন এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইন অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ভারতীয় রাজ্যসমূহের সীমানা পুনর্নির্ধারিত হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই ১৪টি রাজ্য লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও আছে। সেগুলি হইল—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষা দ্বীপ ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা।

'ক' 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির পার্থক্য লোপ পাইল এবং রাজপ্রমুখের পদ তুলিয়া দেওয়া হইল।

রাজ্য		আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	....	৩৩,২৭৯ (প্রায়)	২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার
অন্ধ্র প্রদেশ	...	১,১০,২৫০	৩ কোটি ২২ লক্ষ
আসাম	...	৮৪,৯২৪	৯০ লক্ষ
বিহার	...	৬৭,৮৩০ (প্রায়)	৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩০ হাজার
বোম্বাই	..	১,৮৮,২৪০	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ
জম্মু ও কাশ্মীর	...	৯২,৭৮০	৪৪ লক্ষ
কেরালা	...	১৪,৯৮১	১ কোটি ৩৬ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ	....	১,৭১,২০০	২ কোটি ৩৬ লক্ষ
মাদ্রাজ	....	৫০,১১০	৩ কোটি
মহীশূর	...	৭২,৭৩০	১ কোটি ৯০ লক্ষ
উড়িষ্যা	....	৬০,১৪০	১ কোটি ৪৬ লক্ষ
পাঞ্জাব	...	৪৬,৬১৬	১ কোটি ৪৬ লক্ষ
রাজস্থান	....	১,৩২,৩০০	১ কোটি ৬০ লক্ষ
উত্তরপ্রদেশ	...	১,১৩,৪১০	৬ কোটি ৩২ লক্ষ